বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ

অমিয় কুমার সেন

শঙ্কর প্রকাশন ॥ ১৫/১এ যুগলকিশোর দাস লেন ॥ কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : জন্মাষ্টমী ১৩৮২

শঙ্কর প্রকাশন, ১৫/১এ যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে
নিতাই মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও রঘুনাথ প্রেস, ৮৩/বি, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬ হইতে নিরঞ্জন চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : ইন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মূল্য : কুড়ি টাকা

অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী

এবং

অধ্যাপক ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

BANGLA KABYE PRAKRITIR RUP

By : Dr. Amiya Kumar Sen

প্রকৃতি প্রেমের রূপ-বৈচিত্র্য

'মানুষ প্রকৃতির সন্তান, তাই প্রকৃতির প্রতি তার চিরন্তন সহজাত ভালোবাসা। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানুষ যেদিন চোখ মেলে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিল, সেদিনই প্রকৃতিকে সে পেয়েছিল চিরপথের সঙ্গীরূপে।' সে যতদিন প্রকৃতির অঙ্কে বাস করেছে, ততদিন দৈনন্দিন জীবনের সুখে-দুঃখে প্রকৃতি ছিল তার নিবিড় পরিপার্শ্বে। মানুষের জীবন-ধারায় লেগেছিল প্রকৃতির সহানুভূতি স্পর্শ। প্রকৃতির এত নিকটে এত অন্তরঙ্গ হয়েছিল বলেই হয়তো সে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার সুযোগ পায়নি, একটি শিশুসুলভ আকর্ষণেই সে মুগ্ধ হয়ে থেকেছে। কিন্তু 'প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্য থেকে মানুষ ক্রমে ক্রমে যতই দূরে যেতে আরম্ভ করেছে প্রকৃতির সহিত অচ্ছেদ্য, গভীর সম্বন্ধের প্রতি ততই সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।' একদিন প্রকৃতি তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়েই তার দৃষ্টির সামনে ছিল, তাই প্রকৃতির প্রকৃত রূপটির প্রতি অনুসন্ধিৎসা মানুষের মনে জাগে নাই, সে রূপের মধ্যে কোনো ফাঁককে কল্পনার সাহায্যে পূর্ণ করিয়া লইবার প্রয়োজনও ঘটেনি। 'প্রকৃতির নিকট থেকে যতই সে দূরে সরে এসেছে, ততই প্রকৃতিকে চিনবার, উপলব্ধি করবার আকাঙ্ক্ষা তার মনে প্রবল হয়ে উঠেছে।' অন্তরাল থেকে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির পরিপূর্ণ রূপ হয়তো তার চোখে পড়েনি।—যেটুকু চোখে পড়েনি, সেটুকু সে কল্পনায় পূর্ণ করে নিয়েছে। কাছে পায়নি বলেই প্রকৃতি তার কাছে আভাসে ইঙ্গিতে কথা বলেছে, প্রকৃতির মধ্যে সে আবিষ্কার করেছে অসীম রহস্য, অনন্ত সম্ভাবনা। এমনি করেই ধীরে ধীরে প্রকৃতির প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে।

আদিম মানুষের নিকট প্রকৃতি উন্মুক্ত রূপেই প্রতিভাত হয়েছে, দুপক্ষের মাঝে কোনো আবরণ ছিল না। কাজেই প্রকৃতির প্রতি সব মানুষের দৃষ্টিই অল্পবিস্তর একই ধারাকে অনুসরণ করেছে, কিন্তু দূরে

সরে যাবার ফলে মানুষ যখন প্রকৃতিকে রহস্যমণ্ডিত করে দেখেছে, তখন বিভিন্ন মানুষের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছে বিভিন্নতা। প্রকৃতি প্রেমের অগণিত বৈচিত্র্য তাই আধুনিক। প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন যুগে যুগে মানুষের কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। এই অভিব্যক্তির স্বরূপ নানা আধারে নানা ভাষায় নানা ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। এই অভিব্যক্তির শ্রেণীবিভাগ করা সহজসাধ্য নয়, তাছাড়া এ বিভাগগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি অভিব্যক্তির রূপ অন্যতর রূপের সঙ্গে মিশে থাকে যে, তাদের একক স্বরূপ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবু একটি বিশেষ রূপের প্রাধান্যকে অবলম্বন করে একটি শ্রেণী বিভাগের প্রয়াস করা হয়েছে। সে প্রয়াসের ফলশ্রুতি মোটামুটি এরূপ :

প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপ (Personification of Nature).

প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপই সম্ভবতঃ প্রকৃতির প্রতি মানুষের আদিতম দৃষ্টির পরিচায়ক। ভারতীয় সাহিত্যের আদিকাব্য ঋগ্বেদেই এই মানবত্ব আরোপের চরম নিদর্শন। মানুষ যতদিন প্রকৃতির সহচর, ততদিন প্রকৃতিকে সে মানবরূপে কল্পনা করেই তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছে। প্রভাতে সূর্য যখন পূবাচলের অন্ধকার বিদীর্ণ করে দীপ্ত আলোকে আকাশ ভরে দিয়েছে, তখন মানুষ তাকে স্বর্ণকিরীট-শোভিত নরপতিরূপে কল্পনা করেছে, সূর্যরশ্মির সপ্তবর্ণ, সাতটি অশ্বের রূপে সে নরপতির রথে যুক্ত হয়েছে। সূর্যোদয়ের পূর্বে ঊষার অস্পষ্ট আলোক, সূর্য ঊষাকেই অনুসরণ করে। তাই ঊষাকে সূর্যের প্রেমিকা-রূপে কল্পনা করে নানা কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। আকাশ যখন মেঘে মেঘে অন্ধকার, তখন আকাশরূপী ইন্দ্রকে মেঘ-দৈত্যর কবলিত ভেবে মানুষ আশঙ্কা অনুভব করেছে। প্রাকৃতিক উপাদানে এই মানবত্ব আরোপের দ্বারা প্রকৃতি মানুষের সহিত নূতনতর আত্মীয়তা লাভ করেছে। পরবর্তী সাহিত্যে এই মানবত্ব আরোপ তেমন প্রকট রূপ গ্রহণ করেনি। কিন্তু তবু আপনার অস্তিত্ব সর্বাংশে খর্ব করেনি। কালিদাসের কাব্যে এবং প্রাচীন বাংলায় বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রভৃতির

পদে বিভিন্ন ঋতুকে ঋতুপুরুষ বা নারীরূপে আঁকা হয়েছে। বিদ্যাপতি এবং জ্ঞানদাসের পদে বসন্ত ঋতু এসেছে ত্রিভুবন বিজয়ী সম্রাটের রূপে। মৈমনসিংহ গীতিকায় একটি প্রভাত বর্ণনায় উষা ও সূর্য ঋগ্বেদের মতোই প্রেমিক-প্রেমিকার সাদৃশ্য পেয়েছে কিন্তু লৌকিক রীতির স্পর্শে সে সাদৃশ্য কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র। আধুনিক কালে ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যেই মানবত্ব আরোপের প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়। ঋতু বর্ণনার ক্ষেত্রেই কবি সে মানবত্ব আরোপের বহুল ব্যবহার করেছেন। গ্রীষ্মের সহিত সংগ্রামে বর্ষার জয়লাভ এবং গগনের সিংহাসনে তিমিরের মুকুট মাথায় উপবেশন বহুলাংশে প্রাচীন রীতিতে মানবত্ব আরোপের নিদর্শন। বিহারীলালের কাব্যে প্রকৃতির রূপে মানবত্ব আরোপ অপেক্ষা প্রকৃতির অনুভূতিতে মানব সুলভ অনুভূতি আবোপই মুখ্য। কবি যখন বলেন—

'প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি রমণী সনে'

তখন যদিও পুষ্পস্তবকে প্রকৃতির পীনস্তন এবং ভ্রমরকণ্ঠে প্রকৃতির কণ্ঠগুঞ্জন কবির চিত্ত আকৃষ্ট করে, তবু এই সমস্ত রূপের শরীরী মাধুর্য ছাপিয়ে একটা অনুভূতির একাত্মাই বেশি করে পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতিতে মানবসুলভ অনুভূতির চরমতম রূপ। প্রকৃতিতে মানবিক অনুভূতি আরোপ ইংরেজি অলংকার শাস্ত্রের Personification of Nature অংশে আলোচ্য নয়। পরে এ রীতিকে নূতন শ্রেণীতে ধরা হয়েছে। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানে মানবত্ব আরোপের নিদর্শন অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও প্রচুর।

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।

অথবা

হায় হেমন্ত লক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা!

ইত্যাদি কবিতাতে বৈশাখকে রুদ্ররূপে এবং হেমন্তের কুয়াশা ঢাকা

সৌন্দর্যকে অবগুণ্ঠিতা নারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এগুলি অবশ্য অতি উচ্চাঙ্গের মানবত্ব আরোপের নিদর্শন। 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় একটি মানবত্ব আরোপ অনুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

মেটো স্বরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশী
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে। শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী।

এ উদ্ধৃতিতে প্রিয়জন বিয়োগ-ব্যথিতা বসুন্ধরা শুধু স্নেহময়ী মাতার রূপই লাভ করেননি, তাঁর হৃদয়ের মাতৃসুলভ অনুভূতিও অবলীলাক্রমে এ বর্ণনার মধ্যে ধরা পড়েছে।

প্রকৃতির প্রতি ব্যবহারিক দৃষ্টি (Pragmatic Natune) :

প্রকৃতির প্রতি মানুষের আদিম দৃষ্টি ব্যবহারিকতা মণ্ডিত। এমনকি ঋগ্বেদের কবিগণ যেসব প্রাকৃতিক উপাদানকে মানবত্ব আরোপে সুন্দর করে তুলেছিলেন, সেসব উপাদান মানবের ব্যবহারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই সূর্য, অগ্নি এবং মরুৎগণ ঋগ্বেদের কবিগণের পক্ষপাতিত্ব লাভ করেছে। অপরপক্ষে, অন্ধকার রাত্রি ও মেঘময় আকাশকে দৈত্য এবং দানবের রূপে কল্পনা করার মধ্যে প্রকট ব্যবহারিকতা ফুটে উঠেছে।

আদিম মানুষ হয়তো প্রাকৃতিক উপাদানের দাসত্ব থেকে মানসিক মুক্তির জন্যই ধীরে ধীরে সে উপাদানগুলির সঙ্গে শুধু ব্যবহারিক নয়, ভালোবাসার সম্পর্কও স্থাপন করতে আরম্ভ করেছিল। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে গ্রীষ্মের দাবদাহের থেকে মুক্তি দেয় বলে, বা পৃথিবীর শস্যভাণ্ডারকে পূর্ণ করে বলেই মেঘকে মানুষ মনে মনে যাচ্ঞা করেছে। সে দৃষ্টি ব্যবহারিক কিন্তু শুধু ব্যবহারিকতার অপমানজনক শর্তে মেঘের সঙ্গে তার বন্ধুত্বকে সে ধীরে ধীরে অতিক্রম করেছে। মেঘ-

মেঘের আকাশ বা শ্যামল তরুশ্রেণী দেখে বিরহিণীর হৃদয়-বেদনা সে ব্যবহারিকতার স্পর্শ থেকে মুক্ত। তারপর একদিন তার চিন্তা এবং সাহিত্যে মহাজাগতিক অনুরণনও ধ্বনিত হতে আরম্ভ করেছে। প্রকৃতি আধিভৌতিক রূপ থেকে আধ্যাত্মিক রূপে উন্নীত হয়েছে।

শুধু জীবিকা বা জীবন ধারণের প্রয়োজনে পশুরও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক আছে। মানুষেরও একদিন সেটাই প্রধান ছিল, আজও সে সম্পর্কের প্রয়োজন লুপ্ত হয়নি কিন্তু মানুষ তাকে অবলম্বন করেই তার থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে। সাহিত্যে বাস্তবতার দোহাই দিয়ে অনেক সময় আজও প্রকৃতির ব্যবহারিকতাকে আমরা নগদ মূল্য দিয়ে থাকি। একসময়ে এই নিয়ে একটি তর্কে যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের তাৎপর্য নামক প্রবন্ধে বলেছিলেন।—

"মানুষের নানা চাওয়া আছে, সেই চাওয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে খাবারের জন্য মাছকে চাওয়া। কিন্তু তার থেকে তার বড়ো চাওয়া, বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন চাওয়া—নদীতীরে সেই সূর্যাস্ত আলোকে মহিমান্বিত দিবা অবসানকে সমস্ত মনের সঙ্গে মিলিত করতে চাওয়া। এই চাওয়া আপনার অবরোধের মধ্য থেকে আপনাকে বাইরে আনতে চাওয়া। বক দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনের প্রান্তে সরোবরের তটে। সূর্য উঠছে আকাশে, আরও রশ্মির স্পর্শপাতে জল উঠছে ঝলমল করে— এই দৃশ্যের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্মিলিত আপনার মনটিকে ওই বক কি চাইতে জানে। এই আশ্চর্য চাওয়ার প্রকাশ মানুষের সাহিত্যে। তাই ভর্তৃহরি বলেছেন, যে মানুষ সাহিত্য-সংগীত-কলাবিহীন সে পশু, কেবল তার পুচ্ছবিষাণ নেই এই মাত্র প্রভেদ। পশুপক্ষীর চৈতন্য প্রধানত আপন জীবিকার মধ্যেই বদ্ধ—মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে, সাহিত্য তারই একটি বড়ো পথ।"

শুধু সাহিত্যে নয় অন্যত্রও মানুষ এই ব্যবহারিকতা থেকে মুক্তি পাবার নানা উপায় উদ্ভাবন করেছে। আমরা যে গৃহভৃত্যকে দাদা বা কাকা বলে সম্বোধন করি, যার কাছে মূল্য নিয়ে জিনিস দেব তাকে

"মা" বলি, সেও এই মুক্তির আর একটি দিক। "পঞ্চভূত" গ্রন্থের "সৌন্দর্যের সম্বন্ধ" প্রবন্ধের একটি অংশে রবীন্দ্রনাথ মানুষের দেনা-পাওনার ব্যবহারিকতা থেকে অনুরূপ মুক্তির সৌন্দর্যের কথা বলেছেন।—"তাহারাই প্রমাণ এই পুণ্যাহের বাঁশি। একজনের ভূমি, আর একজন তাহারই মূল্য দিতেছে, এই শুষ্ক চুক্তির মধ্যে লজ্জিত মানবাত্মা একটি ভাবের সৌন্দর্য প্রয়োগ করিতে চাহে। উভয়ের মধ্যে একটি আত্মীয়-সম্পর্ক বাঁধিয়া দিতে ইচ্ছা করে। বুঝাইতে চাহে, ইহা চুক্তি নহে, ইহার মধ্যে একটি প্রেমের স্বাধীনতা আছে।" প্রকৃতির সহিতও মানুষের যতটুকু আবশ্যকের সম্বন্ধ সেটুকু চিরদিন আছে। অনন্তকাল থাকবেও। কিন্তু মানুষ সেই আবশ্যকের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সৌন্দর্যের সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। এই মুক্তির বিভিন্ন স্তর মানুষের সাহিত্যকে মহিমান্বিত করেছে। ইলিয়াড ও ওডিসি কাব্যে এই উত্তরণের একটি সুন্দর পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে। ট্রয় থেকে প্রত্যাগত যোদ্ধাদলের হয়তো পানীয় জলের প্রয়োজন। সমুদ্রের তীরে জাহাজ নোঙর করে ঝরণার খোঁজে তাঁরা বনপথ ধরে অনুসন্ধান করে চলেছে। এমন সময় কলতানে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা একটি ঝরনার পাশে এসে দাঁড়াল। তখন তাঁদের তৃষ্ণার তাগাদা নেই। কবি সেই ঝরনার সৌন্দর্য বর্ণনায় প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনের একটি নূতন ধারার সূচনা করলেন। তৃষ্ণার্ত পথিকের জল খোঁজার মধ্যে যে দৈন্য আছে ঝরনার সৌন্দর্য বর্ণনার মধ্যে তার অবসান ঘটেছে।"

প্রাচীন বাংলাকাব্যে নায়কনায়িকার বিরহ অথবা মিলনের পট-ভূমিতে যে সকল ঋতু-বর্ণনা স্থান পেয়েছে সে সকল বর্ণনায় প্রায়ই উৎকট ব্যবহারিকতার নিদর্শন আছে। "বারমাস্যা" প্রভৃতি ঋতু-বর্ণনা উপস্থাপনের রীতিও চিরাচরিত। অনন্য প্রতিভাশালী কবিগণ সে ব্যবহারিকতাকে অবশ্য রসোত্তীর্ণ করবার নানা প্রয়াস করেছেন। যথাস্থানে তার আলোচনা করা হবে। আধুনিককালে বাংলাসাহিত্যে ব্যবহারিকতার চরম নিদর্শন ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে। তবে ঈশ্বরগুপ্ত রসোত্তীর্ণ কাব্য রচনা করতে না পারলেও প্রকৃতির অতি সাধারণ

উপাদানগুলিকে সাধু-সাহিত্যের আসরে এনে উপস্থিত করেছিলেন। এজন্য যথোচিত সম্মান তাঁর প্রাপ্য।

রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনা (**Metaphorical Nature**) :

প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানে মানুষ যেমন মানবত্ব আরোপের চেষ্টা করেছে তেমনি আবার নিজেদের জীবনের ঘটনা, নিজেদের দৈহিক রূপ ইত্যাদির তুলনা খুঁজেছে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে। রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনার দিক থেকে প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের বিপরীত রীতি। তবে মানবত্ব আরোপের মধ্যে উপমার ভাবটি রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনার মতো প্রবল থাকে না। এর নিদর্শন মানুষের আদিকাব্যেও রহিয়াছে। আমাদের দেশে ঋগ্বেদের রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনাগুলি সুন্দর, তবে সংখ্যায় অপ্রচুর। মূল রামায়ণ এবং মহাভারতেও রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনার স্থান নিতান্ত অল্প নয়। তবে কালিদাসের কাব্যেই রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনা চরম উৎকর্ষ। তাঁর নৈসর্গিক উপমাগুলি যেমন গভীর দৃষ্টির পরিচায়ক, তেমনি স্থিতিস্থাপক। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সে উপমাগুলির গৌরব আরও বৃদ্ধি পায়। নারী-সৌন্দর্য বর্ণনায় প্রাকৃতিক উপাদানের তুলনা পূর্ববর্তী কাব্যেও অল্পবিস্তর ছিল কিন্তু কালিদাসের কাব্যে নারী-সৌন্দর্য প্রকৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে অপরূপ হয়ে উঠেছে। কালিদাসের রূপকাত্মর প্রকৃতি বিশেষত্ব এই যে, উপমান ও উপমেয়ের আপাত সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই তাদের কাজ শেষ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে একটি সুন্দর চিত্রের উদয় হয়। তাতে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য একটি বৃহত্তর সার্থকতায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের উদাহরণ শুধু রূপ বর্ণনায়ই পর্যবসিত হয়েছিল। বহুল ব্যবহারে সুন্দর সুন্দর প্রকৃতিচিত্রগুলি প্রাচীন দীপ্তি হারিয়ে ফেলেছিল। রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনায় ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাসের পরই বোধ হয় বিদ্যাপতির স্থান। রূপবর্ণনার অতি প্রাচীন প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে বিদ্যাপতি চিত্ররূপের সাহায্যে নূতনত্ব দান করেছেন। বাংলার দুই

শ্রেষ্ঠ প্রাচীনকার মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে অলংকারের নিপুণ ও আকস্মিক প্রয়োগে অনেক প্রকৃতি চিত্রের প্রাচীনত্ব ঢেকে দেবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই প্রয়াসের ফলে ভারতচন্দ্রের রূপবর্ণনা অনেক স্থলেই অবশ্য অতিশয়োক্ত দোষে দুষ্ট। আধুনিক পূর্ব বাংলা সাহিত্যে একমাত্র লৌকিক সাহিত্য রূপবর্ণনা কিছু পরিমাণে চিরাচরিত রীতি বর্জন করেছে। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র রূপ বর্ণনাগুলি অনেক স্থলে সরস নিসর্গ-চিত্র ব্যবহারে সমুজ্জ্বল। আধুনিক বাংলা কাব্যে মধুসূদন এবং হেমচন্দ্রের রূপকাত্ম প্রকৃতি-চিত্রগুলি মাঝে মাঝে কবি দৃষ্টির পরিচায়ক সন্দেহ নেই। তবে উভয়েই প্রাচীন চিত্রের অনুসারী। নবীনচন্দ্রের রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্র স্থানে স্থানে খুব সজীব, প্রাচীনত্বের শৈবাললগ্ন নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রগুলি অগণিত এবং সরস। 'বিজয়িনী' কবিতায়—

স্বর্ণপাত্রে সুসজ্জিত
চন্দনকুঙ্কুমপঙ্ক, লুণ্ঠিত লজ্জিত
দুটি রক্ত শতদল, অম্লানসুন্দর-
শ্বেতকরবীর মালা, ধৌত শুক্লাম্বর
লঘু স্বচ্ছ পূর্ণিমার আকাশের মতো।

'সাজাহান' কবিতায় মানবের চিরচলমান পরিবর্তনশীল অবস্থাকে কবি একটি প্রাকৃতিক উপমায় রূপ দিয়েছে—

দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবীমঞ্জরি
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল
বিদায়গোধূলি আসে ধূলায় ছাড়ায়ে ছিন্ন দল।
সময় যে নাই,
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল নব কুন্দরাজি,
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।

'কচ ও দেবযানী' নাট্যকাব্যে প্রত্যাখ্যাত দেবযানীর উক্তি—

হাসি? হায় সখা, এ তো স্বর্গপুরী নয়।
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্ম-মাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে।

এই উপমাগুলির কবি সুলভ অন্তর্দৃষ্টি, সরসতা এবং ভাষামাধুর্যের তুলনা বাংলা সাহিত্যে অল্পই আছে কিন্তু চিত্রগুলি ব্যাপ্তি এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে কালিদাসের রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের মতো স্থিতিস্থাপক কিনা সন্দেহ। যথাস্থানে এর বিশদ আলোচনা করা যাবে।

অনুভূতিশীল প্রকৃতি (Nature with Human Feelings) :

মানুষ প্রকৃতিকে যেমন মানবের রূপ দিয়েছে, তেমনি আবার তার মধ্যে মানবসুলভ অনুভূতিরও আবোপ করেছে। ইংরেজি অলংকারের Pathetic Fallacyর থেকে অনুভূতিশীল প্রকৃতির গুরুত্ব আরও ব্যাপক এবং গভীর। Pathetic Fallacyর কাজ পটভূমিরূপে মানব মনের সঙ্গে সহানুভূতি অথবা মানব হৃদয়ের প্রতি নির্বিকার দৃষ্টিদান করেই যেন শেষ হয়ে যায়। কিন্তু অনুভূতিশীল নিসর্গ বর্ণনায় প্রকৃতি শুধু পটভূমি নয় এবং মানবের সম্পর্ক ছাড়াও স্বয়ম্প্রকাশিত প্রাকৃতিক প্রপঞ্চগুলি অনেক সময় শুধু আপনাদের সম্পর্কেই অনুভূতিশীল। বামায়ণের সহানুভূতি প্রকৃতিচিত্রের অবতারণাই বোধ হয় ভারতীয় সাহিত্যে অনুরূপ প্রয়োগের প্রথম নিদর্শন। কালিদাসের কাব্যে অনুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্র প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের সঙ্গে মিলেমিশে আছে। মেঘ-দয়িতের দর্শনে দশার্ণদেশের উদ্যানরানীর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হবার বর্ণনায়, মেঘ এবং উদ্যান শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার রূপই পায়নি, তাদের মধ্যে নায়ক-নায়িকাসুলভ অনুভূতির সংস্থান করে কবি প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপকে অনুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্রের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। আধুনিক-পূর্ব বাংলার কোনো অনুভূতিশীল নিসর্গ বর্ণনা ইংরেজী Pathetic Fallacyর ব্যবহারকে অতিক্রম করতে পারেনি। নায়িকার বিরহরজনীতে সমস্ত নিসর্গ ব্যথাতুর

হয়ে উঠেছে, মিলন রজনীতে আনন্দোচ্ছল হাসি হেসেছে। শুধু মানুষের সম্পর্কেই প্রকৃতি সেস্থানে সজীব। নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যে অনুভূতিশীল প্রকৃতির একটি সুন্দর রূপ আছে। কালিদাসের কাব্যে যেমন দশার্গদেশের উদ্যানরানীর অনুভূতি কোনো মানুষের সম্পর্কে অভিব্যক্ত হয়নি, নৈসর্গিক উপাদানগুলি পরস্পরের সম্পর্কে অনুভূতিশীল হয়ে উঠেছে, নবীন সেনের কাব্যে একস্থানে ঠিক তেমনি অরণ্যের বৃক্ষকুল পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে শূন্যে মস্তক উত্তোলন করেছে। বিহারীলাল প্রধানত আত্মলীন (Subjective) কবি, তাঁর কাব্যের প্রকৃতি তাই কবির সম্পর্কে পুবোমাত্রায় অনুভূতিশীল। তিনি প্রকৃতিব মধ্যে প্রণয় করবার মতো অনুভূতি খুঁজে পেয়েছেন, তাবকাদের মনের অজানা কথার আভাস লাভ করেছেন, তাঁর বিষাদময় মনের সঙ্গে সহানুভূতি জানিয়ে তারকাগণও অশ্রু বিসর্জন কবেছে। ববীন্দ্রনাথেব কাব্যের প্রাকৃতিক উপাদানগুলি কালিদাস এবং নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যের ন্যায় পরস্পরের সম্পর্কেই অনুভূতিশীল। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়—

··ঘুমন্ত পৃথ্বীবে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর-অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধবি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।

এস্থানে সিন্ধুকে আদি-জননী এবং বসুন্ধরাকে সন্তানরূপে কল্পনার মধ্যে যদিও মানবত্ব আরোপের আভাস আছে তবু বসুন্ধরার প্রতি ভালোবাসায় আদি জননী সিন্ধু অনুভূতিশীল হয়ে উঠেছে। এ অংশটির তাৎপর্য মানবত্ব আরোপের আলোচনায় শেষ হবার নয়। 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় নদীর জলোচ্ছ্বাস আকাশের প্রতি বিদ্রোহ করে সজীব হয়ে উঠেছে—

'······লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে।'

বিহারীলালের কাব্যের মত রবীন্দ্র-কাব্যের প্রকৃতি কবির সম্পর্কে সর্বদাই অনুভূতিশীল। প্রকৃতি আশৈশব কবির লীলাসঙ্গিনী। কবির সহিত আভাসে ইঙ্গিতে তাঁর কত কথা, কত হাসি গান,—

'ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ডেকে ডেকে যেত মোর বাতায়নে এসে।'

সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে কবি অনুভূতির সন্ধান পেয়েছেন, তাই সমস্ত প্রকৃতি কবি মনের সহিত একাত্ম হয়ে গিয়েছে— প্রকৃতির হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আপনার হৃদয়টি স্থাপিত করে তাই কবি গভীর অনুভবের নূতন জগৎ সৃষ্টি করেছেন,

'রোদন ভরা এ বসন্ত সখি, কখনো
আসেনি বুঝি আগে!
মোর বিরহ বেদনা রাঙালো
কিংশুক রক্তিম রাগে।'

বসন্ত-বেদনায় কবিদের ব্যাকুলতার ভাষা বসন্তদৃশ্য হইতে আবিষ্কার করা নূতন নয়। কিন্তু অনুভূতির গভীরতায় কেহ বসন্তকে রোদনভরা করে তোলেননি কিংবা আপনার হৃদয়ের রক্তিম ক্ষতকে কেহ কিংশুকের বর্ণে সঞ্চারিত করে দিতে পারেননি। এস্থানেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব। অন্যত্র,

'নব তৃণদলে ঘনবন ছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপ নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।'

বর্ষার আনন্দের মূর্ছনা অনেক কবিই খুঁজে পেয়েছেন বর্ষা প্রকৃতিতে; কিন্তু নিজের হরষকে নব তৃণদলে এবং ঘন বনছায়ে বিছিয়ে দেবার মধ্যে যে গভীরত্বটি আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। প্রকৃতির সঙ্গে এই গভীর একাত্মতায় প্রকৃতি সজীব হয়ে উঠেছে।

ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি (Nature of Association) :

প্রকৃতির কোনো বিশেষ উপাদানের দিকে দৃষ্টিপাত করে পূর্ববর্তী কোনো বস্তু ঘটনাকে স্মরণ করাই ভাবানুষঙ্গী নিসর্গের মূলকথা। এক

হিসাবে ভাবানুষঙ্গী নিসর্গ, নিসর্গের প্রতি আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গীর (Subjective treatement of Nature) সূচনা করে, কারণ আত্মলীন দৃষ্টিসম্পন্ন কবি বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্যপট অবলম্বন করেই মানসলোকের রহস্যময় রাজ্যে প্রবেশ করেন। তবে গভীরতার তারতম্যের জন্য ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি আর প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করাও আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গীর বিশিষ্ট mood বা মেজাজ নিয়ে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করাও আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গীর একটি প্রকার ভেদ। এই দিক থেকে অনুভূতিশীন প্রকৃতি বর্ণনা আত্মলীন দৃষ্টির সূচনা করতে পারে কারণ অনুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনায় কবি আপনার মনের অনুভূতিকে অবলম্বন করেই প্রকৃতির দিকে তাকান। ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি বর্ণনা প্রায় প্রত্যেক কবির কাব্যেই অল্পবিস্তর স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি এই প্রকার দৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গের কবিত্বের পরিচয় খুবই বিরল। গভীরতর রূপে যখন ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতির প্রতি আত্মলীন দৃষ্টিতে পরিণত হয় তখনই তাতে কবিত্বের স্পর্শ লাগে।

নীতিময় প্রকৃতিচিত্র (Moralising Nature) :

সংস্কৃত অথবা প্রাচীন এবং আধুনিক-পূর্ব বাঙলা সাহিত্য প্রকৃতি-চিত্র থেকে মানুষের প্রতি উপদেশমূলক কোনো বিশেষ নীতি সন্ধানের চেষ্টা প্রায় নেই। ঈশ্বরগুপ্ত এবং হেমচন্দ্র বোধ হয় এক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যে প্রায় একক স্থান অধিকার করে আছেন। প্রকৃতি থেকে নীতি সংগ্রহের প্রয়াস হয়তো ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে বাঙলা কাব্যে প্রবেশ করেছিল। ইংরেজী সাহিত্যে Wordsworth, Arnoeld, Longfellow প্রভৃতি বহু কবি প্রকৃতির এই নীতিময় রূপের প্রতি সচেতন ছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র Wordsworthই বোধ হয় এই প্রকার নীতিমূলক কবিতাগুলিকে সরল কবিত্বের স্পর্শে সঞ্জীবিত করে তুলতে পেরেছেন। অন্য কবিরা শুধু প্রকৃতির বহিরাঙ্গন থেকে দর্শকের মতো প্রকৃতির এই নীতিময় রূপকে লক্ষ্য করেছিলেন অথবা সমাজ

জীবনের কোনো একটি অবিচারের সঙ্গে তার তুলনা করেছিলেন কিন্তু Wordsworth প্রকৃতির মর্মস্থলে প্রবেশ করে শ্রদ্ধাবান ভক্তের মতো এই নীতিগুলি উপলব্ধি করেছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত বাঙলার কবিযুগল নীতি সংগ্রহে Wordsworth-এর অনুগমন করতে পারেননি। নীতিগুলি তাঁদের কাছে উপলব্ধি-লব্ধ সত্য নয়, তত্ত্বান্বেষী দর্শকের সংগৃহীত শুষ্ক সংবাদ মাত্র।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বিরচিত সদ্ভাব-শতক প্রভৃতি কাব্যগুলি নীতি-মূলক কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। প্রকৃতির দৃশ্যের কোনো উল্লেখ যদি সে সব কবিতায় থাকে তবে তা নিতান্তই আকস্মিক। প্রকৃতি বর্ণনা তাদের গণ্ডীর বাইরে। সংস্কৃত কাব্যে বা প্রাকৃত গাথায় কোনো কোনো উদ্ভট শ্লোকে মাঝে মাঝে এসব নীতি-প্রচার দেখা গিয়েছে। কিন্তু মহৎ সাহিত্যের উন্নীত হবার মতো লক্ষণ তাদের মধ্যে অনুপস্থিত।

মধ্যযুগের সন্তদেব মধ্যে অনেকেই ভক্ত কবি। তাঁদের উপদেশাত্মক অনেক কণিকা-কবিতায় তাঁরা নিসর্গচিত্রেব অবতারণা করেছেন। রজ্জবজী, দাদূ, নানক, কবীর প্রভৃতির দোঁহাতে প্রকৃতিচিত্রকে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দিয়ে ভক্তদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সেগুলি প্রকৃতির নীতিময়তার পরিচয় নয় সেগুলি আধ্যাত্মিকতা অনুরঞ্জিত। ইংরেজ কবিদের মধ্যে Wordsworth বোধ হয় এঁদের সবচেয়ে কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। মধ্যযুগের সন্তদের একটি ধারা বাউল-মতবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বাউল গানে অনেক সময় আধ্যাত্মিক চেতনাকে কোনো একটি প্রকৃতিচিত্রের সঙ্গে তুলনা করে সহজবোধ্য করা হয়েছে। বাউল গান থেকে একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে। গানটি হাল-আমলের কিন্তু তাঁর প্রেরণা মধ্যযুগের সন্তদের অনুরূপ। বাউল ধর্মমতে যে সহজ পন্থা নির্দিষ্ট হয়েছিল নিষ্ঠাবান্ ঐতিহ্যবাহী ধর্ম যাজকরা তাকে সর্বদাই সন্দেহের চোখে দেখেছেন। বাউল-পন্থায় প্রাচীন ধর্মের বিভাগকে অস্বীকার করে সব ধর্মের লোককে আহ্বান করা হয়েছিল।

এ আহ্বানে আমাদের বাংলাদেশে পুরোহিত এবং মোল্লারা একই সঙ্গে শঙ্কিত বোধ করেছিলেন। মুসলমান-নামাঙ্কিত একটি বাউল গান করতেন বলে তাঁকে মোল্লারা ভর্ৎসিত করেছিলেন। তিনি তারও উত্তর দিয়েছিলেন একটি গানে।—

'যদি করস মানা মানি এমন সাধ্য নাই।…
কোনো ফুলের নমাজ রঙ-বাহারে,
কারও গন্ধে নমাজ অন্ধকারে,
বীণার নমাজ তারের তারে,
আমার নমাজ কণ্ঠে গাই।
যদি করস্ মানা মানি এমন সাধ্য নাই।'

নীতিবাগীশ কবির হাতে পড়লে "ফুলের নমাজ" রঙবাহারে এবং গন্ধে এত সুন্দর করে নিবেদিত হত কিনা সন্দেহ। নীতিকে যদি বা অবলম্বন করা হয়ে থাকে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় এই গানটিতে প্রকৃতি গভীরতমরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের "কণিকা", "লেখন", "স্ফুলিঙ্গ" প্রভৃতি কাব্যের কোনো কোনো কাব্য কণিকা প্রকৃতি থেকে নীতি সন্ধানের সুদূর প্রচেষ্টা হয়তো লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেগুলি প্রকৃতির সজীব বর্ণনায় এমনি সমৃদ্ধ যে সেগুলিকে নিছক নীতিমূলক বলা অর্বাচীনতা। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কবিতাটির নাম "দানরিক্ত"—

'জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে
পড়ে আছে গগনের এক কোণ ঘেঁষে।
বর্ষাপূর্ণ সরোবর তারি দশা দেখে
সারাদিন ঝিকিমিকি হাসে থেকে থেকে।
কহে ওটা লক্ষ্মীছাড়া, চালচুলাহীন,
নিজেরে নিঃশেষ করি কোথায় বিলীন।
আমি দেখো চিরকাল থাকি জলভরা,
সারবান সুগম্ভীর নাই নড়াচড়া।
মেঘ কহে, ওহে বাপু, কোরো না গরব,
তোমার পূর্ণতা সে তো আমারি গৌরব।'

"দানরিক্ত" মহত্ত্বকে দানলব্ধ ক্ষুদ্রতায় আমরা অনেক সময় উপহাস করি এই নীতিবাক্যটি এই ক্ষুদ্র কবিতায় এমন সুন্দরভাবে প্রকৃতি-চিত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে যে নিছক প্রকৃতিবর্ণনায়ও এর জুড়ি মেলা ভার। কবিতার প্রথম চারটি পংক্তির প্রকৃতিবর্ণনা অনিন্দ্যসুন্দর।

প্রকৃতি দৃশ্যে নীতি সংগ্রহের পথে কবিরা অনেক সময় মানুষের অস্থিরতাকে প্রকৃতির নির্বিকারত্বের তুলনা করেন, কোথাও বা প্রকৃতির চিরস্থায়িত্বের সঙ্গে মানবজীবনের অনিত্যতাকে উপমিত করে মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত করতে সাহায্য করেন। কিন্তু এই প্রয়াসকে প্রকট না করেও কি উপায়ে প্রকৃতির শান্ত নির্বিকার দৃশ্যকে পশ্চাৎপটে রেখে মানুষের স্বার্থের হানাহানিকে বিবৃত করা যায় তার একটি অপরূপ নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের একটি কবিতায় আছে। কবিতাটির নাম 'আঘাত' "সানাই" কাব্যের অন্তর্গত।

'সূর্যাস্তের পথ হতে বিকালের রৌদ্র এল নেমে।
বাতাস ঝিমিয়ে গেছে থেমে।
বিচালি-বোঝাই গাড়ি চলে দূরে নদিয়ার হাটে
জনশূন্য মাঠে।· ·
আশে-পাশে ভাটিফুল ফুটিয়া রয়েছে দলে দলে
বাঁকাচোরা গলির জঙ্গলে,
মৃদুগন্ধে দেয় আনি
চৈত্রের ছড়ানো নেশাখানি।
জারুলে শাখায় অদূরে
কোকিলের ভাঙিছে গলা একঘেয়ে প্রলাপের সুরে।

টেলিগ্রাম এল সেইক্ষণে
ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।'

এর মধ্যে নীতিকথা যদিও বা কিছু থাকে প্রসন্ন শান্ত প্রকৃতি চিত্রের মাধুর্যে তা প্রকট তো নয়ই অথচ আমাদের মনে একটি দার্শনিক চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে দিতে সাহায্য করে। নীতি থেকে দর্শনে কিংবা

নীতি উপলব্ধি থেকে আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণই মহৎ কবিতার লক্ষণ। বাংলা সাহিত্যে তার নিদর্শন খুব বেশি নেই। হয়তো অন্য সাহিত্যেও বিরল।

প্রকৃতির প্রতি বস্তুলীন দৃষ্টি (Objective treatment of Nature) :

প্রকৃতি দৃশ্য বর্ণনায় কবির আপাত চিন্তাধারা এবং অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিই প্রকৃতির প্রতি বস্তুলীন দৃষ্টিভঙ্গীব মূলকথা। অনেক সমালোচক বস্তুলীন দৃষ্টিভঙ্গীর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না কারণ প্রকৃতি বর্ণনায় কবির নির্বাচন ক্ষমতা অজ্ঞাতেই কাজ করতে থাকে এবং চোখে দেখা প্রকৃতির দৃশ্য-সম্ভার থেকে কবি সবগুলি দৃশ্যকেই তাঁর কাব্যে স্থান দেবার উপযুক্ত করেন না। এই নির্বাচনের সূত্রে কবির মানসরাজ্যের সংবাদ পাঠকের চোখে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং বস্তুলীন দৃষ্টিভঙ্গীর অস্তিত্ব অবাস্তব হয়ে পড়ে। এই যুক্তির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের আলোচনার গণ্ডীভুক্ত নয়। তবে যেসব বর্ণনায় পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অত্যন্ত অল্প এবং যেসব বর্ণনায় কবিমনের সঙ্গে আমাদের নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ থাকে না, যেসব বর্ণনাকে আমরা নিসর্গের প্রতি বস্তুলীন দৃষ্টির পরিচয় রূপেই আলোচনা করেছি। এরকম প্রকৃতি বর্ণনা আমাদেব সাহিত্যে অবশ্য অতি বিরল। ঋগ্-বেদের কোনো কোনো সূক্তে প্রকৃতির প্রতি কবিদের সরল আনন্দময় দৃষ্টির (Simple delight in Nature) পরিচয় আছে কিন্তু সেগুলি ঠিক প্রকৃতি বর্ণনা নয়, এমনকি কবির মানসিক-জগৎ-নিরপেক্ষ কোনো দৃষ্টিও সেগুলিকে উদ্বুদ্ধ করেনি। রামায়ণে অরণ্য এবং পর্বত বর্ণনাই মুখ্য। বস্তুলীন দৃষ্টির অভিব্যক্তি সেগুলিতে অনুপস্থিত। বর্ণনাগুলি হয় কবির কল্পনায় বর্ণবহুল বা decorative হয়ে উঠেছে, না হয় কবিমনে অরণ্য এবং পর্বতের সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণাকেই মুখ্যত প্রকাশ করেছে। ঋতু বর্ণনায় কিন্তু রামায়ণের কবি বস্তুলীন দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। রামের বিরহী হৃদয়ের পটভূমিতে ঋতুবর্ণনাগুলির অবতারণা হলেও সেই বিরহী মনুষ্য হৃদয়ের প্রভাব বর্ণনাগুলিতে

অত্যন্ত ক্ষীণ। কাজল মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমক রামকে একবার শুধু রাবণের অঙ্কে সীতার সাদৃশ্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, আর একবার মেঘময় আকাশকে তিনি বেদনাতুর করে দেখেছিলেন। স্বল্প দু একটি স্থানের কথা ছেড়েদিলে রামায়ণের ঋতুবর্ণনাগুলি বস্তুলীন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়ে সমুজ্জ্বল, বাস্তবচিত্র হিসাবে সেগুলি অনবদ্য। কালিদাসের কাব্যে বস্তুলীন দৃষ্টির পরিচয় প্রায় নেই। যেসব স্থানে তাঁহার বর্ণিত প্রকৃতি নিছক পটভূমিরূপে উপস্থাপিত হয়েছে, সেসব স্থানেও কবি আপনার কল্পনার সাহায্যে বর্ণনাগুলিকে বর্ণবহুল করে তুলেছেন। 'কুমারসম্ভবে'র প্রথমাংশের হিমালয় বর্ণনাটি কাব্যের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত নয়, কিন্তু বস্তুলীন দৃষ্টির পরিচয়ও তাতে নেই। হিমালয়ের নানাবর্ণের ধাতুর আভায় রঞ্জিত লঘু মেঘখণ্ডের দিকে চকিত দৃষ্টির ফলে সন্ধ্যাভ্রমে ক্ষিপ্রহস্তে প্রসাধন করতে গিয়ে অপ্সর-বধূদের নানাপ্রকার হাস্যাস্পদ ভুলকেও কবি কল্পনা নয়নে প্রত্যক্ষ করেছেন। কালিদাসের ঋতুবর্ণনাগুলিও অনেক স্থলে ব্যবহারিকতামণ্ডিত, যদিও ব্যবহারিকতাকে কি করে কাব্যরসে রূপান্তরিত করতে হয় তা তিনি ভালো করেই জানতেন। প্রাচীন বাঙলা কাব্যের নিসর্গচিত্র প্রধানত পটভূমিরূপেই অঙ্কিত, নায়ক নায়িকার প্রেম-কাহিনী থেকে সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নেই। তাছাড়া মানবত্ব আরোপ, ব্যবহারিকতা ইত্যাদি বহুপ্রকার উপসর্গ প্রকৃতি বর্ণনাকে ভারাক্রান্ত করেছে। 'বস্তুলীন দৃষ্টির পরিচয় প্রাচীন বাংলাকাব্যে একপ্রকার অনুপস্থিত।' আধুনিক যুগের সূচনায় ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে Nature for Nature's Sake বা উদ্দেশ্যবিহীন প্রকৃতিবর্ণনার আভাস ছিল; প্রকৃতিবর্ণনাকে কাব্যবস্তুরূপে বোধ হয় তিনিই প্রথম উপস্থাপিত করেছেন। সে সব স্থানে বস্তুলীন দৃষ্টি প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ ছিল কিন্তু কবির ব্যবহারিক দৃষ্টি কবিকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। নবীন সেনের কাব্যের প্রকৃতি বর্ণনায় একপ্রকার সরসতা এবং বাস্তব চিত্রের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ ছিল। অনেকক্ষেত্রে এই সরসতা ও বাস্তবমুখী দৃষ্টি কবির নির্বাচন রুচির সঙ্গে মিশে প্রকৃতি চিত্রগুলির

মধ্যে আত্মলীনতার (Subjectivity) আভাস এনে দিয়েছে। অন্যত্র নির্বাচন রুচিকে কবি যে সকল বর্ণনার মধ্যে পুরোপুরি অবলম্বন করেননি এবং কোনো উদ্দেশ্য যে বর্ণনাগুলোকে ভারাক্রান্ত করেনি সেগুলি বস্তুলীন দৃষ্টির পরিচায়ক। বিহারীলাল এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ আত্মলীন (Subjective) কবি। তাঁদের বর্ণিত প্রকৃতি চিত্রগুলি যেখানে পুরোপুরি বাস্তবধর্মী সেখানেও সে চিত্রগুলির মধ্যে কবি মানসের সহিত নিবিড় পরিচয় প্রতিফলিত। বর্ণিত চিত্রগুলির মধ্যে তাঁরা আপনার হৃদয়কে এমন করে উন্মুক্ত করে ঢেলে দিয়েছেন যে, কবি-মনের সহিত পাঠক-মনের গভীর অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। কাজেই নিসর্গের প্রতি নিছক বস্তুলীন দৃষ্টির পরিচয়ের নিদর্শনরূপে সেগুলি কদাচিৎ উল্লিখিত হতে পারে।

প্রকৃতির প্রতি আত্মলীন দৃষ্টি **(Snbjective treatment of Nature) :**

কোন বিশিষ্ট mood বা মেজাজ নিয়ে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা অথবা প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করে আপনার অন্তর্লোকের কোনো নিভৃত নিলয়ে ফিরে যাওয়া, আত্মলীন দৃষ্টির মূলকথা। আত্মলীন দৃষ্টিসম্পন্ন কবি তাঁর কাব্যের আখ্যান বা বক্তব্যের অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকতে পারেন না। কাব্যের মধ্য দিয়ে বারবার কবি-মানসের পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। প্রকৃতি চিত্রবহুল কাব্যে আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গী মানুষ অনেক পরবর্তীকালে আয়ত্ত করেছে। প্রাচীন সাহিত্যসেবীদের কাব্যে মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে কিন্তু অতি আধুনিক কালেই এই আত্মলীন দৃষ্টির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যে আত্মলীন দৃষ্টির কিছু পরিচয় আছে। যথাস্থানে তার আলোচনা করা হবে। বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত একটি বর্ষার পদে রাধাকৃষ্ণ এবং বৈষ্ণবকাব্য জগতের পরিবেশ উত্তীর্ণ হয়ে কবির বিরহ-বিধুর মনের আকুল ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে। এরকম দু-একটি ছাড়া আত্মলীন দৃষ্টির পরিচয় প্রাচীন বাঙলার কাব্যে বিশেষ নেই। নবীনচন্দ্রের কাব্যে প্রকৃতির প্রতি আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম আভাস সূচিত হয়েছিল। বিহারীলালের

রচনায় সে আভাসের স্পষ্টতা এবং রবীন্দ্রনাথেব কাব্যে তার পরিপূর্ণতা। কাব্যে প্রকাশিত কবির এই আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গী, পরিদৃশ্যমান জগৎ থেকে কল্পনার জগতে এই অভিসার প্রধানত দুটি উপায়ে প্রকাশিত হয়। একটি রোমান্টিক (Romantic) এবং আব একটি মিস্টিক (Mystic) পন্থা। বোমান্টিক কবি প্রকৃতির মধ্যে একটা অজানা বহস্যেব আস্বাদ কবেন ; জাগতিক সৌন্দর্য একটা অপবিচয়েব আনন্দেব সহিত যুক্ত হয়ে গভীবতর সার্থকতায় মুক্ত হয়। প্রকৃতি আভাসে ইঙ্গিতে কবিব নিকট অনেক কথা বলে, কিছু কবিব অনুভবে ধরা পড়ে, কিছু যেন অনুভবেরও অতীত। কিছু উপলব্ধি এবং অনেকটা অনুপলব্ধিব আনন্দেই কবি মগ্ন হয়ে সমগ্র বিশ্ব সৌন্দর্যের অন্তঃস্থলে অধিষ্ঠিতা সৌন্দর্যলক্ষ্মীব মূর্তি যেন দূরদূবান্তব থেকে অস্পষ্ট প্রকাশে কবিকে মুগ্ধ করে। কিন্তু কবি তাকে স্পষ্ট কবে বুঝতে পারেন না, হয়তো বা চানও না। জানা এবং না-জানার বহস্যময়তাই কবি-মনকে একটি গভীর আনন্দময়তায় নিবিষ্ট করে বাখে। বাঙলা সাহিত্যে রোমান্টিক দৃষ্টির প্রথম পরিচয় বিহারীলালেব কাব্যে এবং ববীন্দ্রনাথের বচনায় তারই পরিপূর্ণরূপ একথা বলা হয়েছে। শরতেব প্রভাতের পীত রৌদ্রে যে একটু উদাসীনতাব আভাস আছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে রবীন্দ্রনাথেব রোমান্টিক মনেব বহস্যময়তা উচ্ছল আবেগে আত্মপ্রকাশ করেছে।—

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পবাণ কী যে চায়।
ওই শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে
বিহগ-বিহগী কী যে গায়।

কবির কানে কানে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর দূতীদের কত অস্ফুট গুঞ্জন ; কবি সমস্ত কথা যেন ধবা ছোঁয়ার মধ্যে পান না, কিন্তু মুগ্ধ উৎসুক হৃদয়ে তাদের রহস্যময় উপস্থিতি উপলব্ধি করেন,—

‘তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন
তার কোনো কোনো দূতীকে

পলাশ বনের রং-মাতাল ছায়াপথে
কাজ-ভোলানো সকাল বিকালে।
তখন কানে কানে মৃদু গলায় তাদের কথা শুনেছি,
কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝিনি।
দেখেছি কালো চোখের পক্ষরেখায়
জলের আভাস ;
দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর বেদনা ,
শুনেছি ক্বণিত কঙ্কণে
চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার।'

মনের আনন্দময় রহস্যময়তা যখন কবি-হৃদয়ের একটি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখনই কবি রোমান্টিক জগত থেকে মিস্টিক জগতে প্রবেশ করেন। রোমান্টিক কবির চোখে প্রাকৃতিক উপাদানের যে ইঙ্গিতগুলি অস্পষ্ট এবং 'কুহেলিবিলীন', মিস্টিক কবির দৃষ্টিতে সে-সকল ইঙ্গিতই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের কেন্দ্রস্থলে একটি বিরাট্‌ অনধিগম্য সত্তার সন্ধান দেয়। মিস্টিক কবিতায়ও একপ্রকার রহস্যময়তা আছে কিন্তু সে রহস্যময়তা অজানার আনন্দ থেকে উদ্ভূত নয়, সে রহস্যময়তা একটি অসীম সত্তার সম্বন্ধে সচেতনতা এবং তাকে সম্যক উপলব্ধির চেষ্টায় প্রতিফলিত। শুধু সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রূপের সুদূর আভাসেই মিস্টিক কবি মুগ্ধ হন না, জগতের সমস্ত সৌন্দর্য অভিব্যক্তির মধ্যে ক্ষণে ক্ষণেই সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর স্পর্শের সন্ধান পান। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' আধুনিক বাঙলা কাব্যে মিস্টিক দৃষ্টির প্রথম পরিচয়। রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতির প্রতি এই মিস্টিক দৃষ্টিরও স্পষ্টরূপ,

'সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ বরুণ পারিজাত লয়ে হাতে।'

'নৈবেদ্যে'র 'স্তব্ধতা' কবিতায়, —

আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে। -
জনশূন্য ক্ষেত্র মাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার

রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্ত প্রসার
স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি।'

সমস্ত প্রকৃতির এই স্তব্ধতার মধ্যে কবি সেই অনাদি অসীম সত্তার সন্ধান পেয়েছেন,—

'এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে
অণুপরমাণুদের নৃত্য কলরোলে,
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।'

আত্মলীন কবিদের প্রকৃতি বর্ণনায় একটি বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায়। সে বিশেষত্ব অভিব্যক্ত হয় প্রকৃতির ভাবরূপ অঙ্কনে। অনেক স্থলে প্রকৃতির দৃশ্য বর্ণনার কোনো স্পষ্ট উপাদান ছাড়াই কবি সে দৃশ্যটি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন। চণ্ডীদাসের দু একটি পদে এইরূপ বর্ণনার আভাস আছে। বর্ষার বর্ণনার উপযুক্ত উপাদানের সাহায্য না নিয়েই কবি একটি বর্ষারাত্রির অভিসারের বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ধরণের বর্ণনারও শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে।—

'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো গেলরে দিন বয়ে,
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা ঝরছে র'য়ে র য়ে।
একলা বসে ঘরের কোণে
কি ভাবি যে আপন মনে
সজল হাওয়া যূথীর বনে কী কথা যে যায় কয়ে।'

এই বর্ণনায় বর্ষার প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপস্থাপন অত্যন্ত ক্ষীণ সূত্রে বাঁধা। কিন্তু আষাঢ় সন্ধ্যার নিরালা অবসাদময় ক্ষণটি এ কবিতাব মধ্যে কি সুন্দর স্পষ্টতায় ধরা পড়েছে। বর্ষাকে যেন এখানে তাহাব চিত্ররূপে উপস্থাপিত করা হয়নি; বর্ষার মধ্যে যে একটি ভাবময় রূপ আছে, এখানে সেটিই কবির অবলম্বন। ববীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় প্রকৃতি এ ধরণের ভাবমূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতির রূপ

শুধু ভাষায়ই নয় সাহিত্যেও সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার মাতা-কন্যা সম্পর্ক। বাঙলার প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিক প্রচেষ্টার পশ্চাতেই এই মাতৃঋণের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে একমাত্র সংস্কৃত ছাড়া আর কোনো সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার নিবিড় পরিচয়ও ছিল না। মুসলমান যুগে বাঙলা ভাষার উপর আরবী এবং পারসীক ভাষার প্রভাব অনুভূত হয়েছিল সত্য, কিন্তু, সাহিত্যের দিক থেকে সে প্রভাবের মূল্য নগণ্য। সংস্কৃত সাহিত্য চিরদিন বাঙলার সাহিত্যিকদের প্রেরণার উৎস। যে বিভিন্ন রূপের মধ্য দিয়ে বাঙলা সাহিত্য বিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছে হয়তো এ যুগে সে অনেক নূতনত্বের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের রসের ধারা সে গ্রহণ করেছে মূলতঃ সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই। বাঙলা তথা উত্তর ভারতের নানা ভাষার সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পরিচয় বহন করছে। এই বিকাশ কোনো ক্ষেত্রে পথভ্রান্ত হলেও সবভাষারই সাহিত্য রচয়িতাদের জগৎ এবং জীবনকে দেখবার পদ্ধতি একই ধারাকে অনুসরণ করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যসেবীরা যে দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন, যে অনুসন্ধিৎসার সাহায্যে মানব মনের গভীর রহস্যভেদের চেষ্টা করেছিলেন, বাঙালী সাহিত্যিকদের সে দৃষ্টি এবং সে অনুসন্ধিৎসা স্বভাবত একই প্রকারের। বাঙলা সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সাহিত্য নয়, সাহিত্য রীতির দিক থেকে একই সাহিত্যের শাখায়িত অনুবৃত্তি। কাজেই কোনো রস সৃষ্টির দিক থেকে বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা করতে গেলে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বাঙলা সাহিত্যের রসধারার সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে গেলে মূল উৎস সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। প্রকৃতি প্রেমের ক্ষেত্রেও সংস্কৃতের এই অনুগমন অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রকৃতি প্রেমের আদিম ধারাগুলি

বাঙলার সাহিত্যিকদের আবিষ্কার করতে হয়নি, উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁরা সংস্কৃত থেকে অধিগত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে প্রকৃতি প্রেমের রূপে যে বৈচিত্র্য বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তার মধ্যে কোনো বৈচিত্র্যের গৌরব অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাপ্য নয়। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবের মূল্য তাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বাঙলা সাহিত্য নিসর্গ প্রীতিতে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের উপর সংস্কৃতের প্রভাবও বড়ো অল্প নয়, তাঁর অনেক প্রকৃতি বর্ণনা কালিদাস-গন্ধী, অন্যান্য ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের নানা প্রভাব তো রবীন্দ্রসাহিত্যে আছেই। কালিদাস এবং পরবর্তী বৈষ্ণবকাব্যের প্রাকৃতিক পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ মানসিক বিচরণ করেছেন তাঁর বহু কাব্যে। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ প্রভাব তো আছেই উপরন্তু সাহিত্যের নিসর্গ প্রীতির ধারাগুলিকে প্রাচীন বাংলার সাহিত্য-সেবীগণ প্রয়োজন মতো শুধু আত্মসাৎই করেন নি বিনা প্রয়োজনেও রামায়ণ, মহাভারত এবং কালিদাসের কাব্য থেকে নিসর্গ-চিত্রগুলি ধার করতেও তাঁদের দ্বিধা ছিল না। সংস্কৃত কাব্যের নিকট বিভিন্ন বাঙালী কবির ঋণ যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু তার আগে সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির মধ্যে নিসর্গ প্রীতির যে ধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং বাঙলা কাব্যে যে ধারার পুনঃপ্রকাশ সে ধারার অনুধাবন করা প্রয়োজন। তার ফলে বাঙলা কাব্যের মাতৃঋণের পরিচয় পাওয়া সহজ হবে, প্রকৃতি প্রেমের আদিতম রূপগুলির প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে।

সংস্কৃত কাব্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগবেদ। ঋগবেদের মধ্যে নিসর্গপ্রীতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা প্রকৃতির প্রতি মানুষের আদিতম দৃষ্টিভঙ্গী। দৃশ্যপট অঙ্কনের (Landscape painting) প্রথম আবির্ভাব নাকি হয় চীনদেশে কারণ চীনদেশের অধিবাসীরাই সর্ব-প্রথম প্রকৃতির কোল ছেড়ে শহরের পত্তন করেছিলেন। প্রকৃতির মধ্যে যতদিন বাস করেছেন ততদিন প্রকৃতির বস্তুলীন (Objective)

রূপটি তুলির টানে ফুটিয়ে তোলা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আদিম গুহা-মানবের চিত্রশিল্পের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে সেগুলি মানুষ, পশুপাখী এবং জীবজন্তুর। চিত্রশিল্পের এই উদাহরণ কাব্যের নিসর্গ প্রীতির মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। উদ্দেশ্যবিহীন নিসর্গ উপভোগ (Nature for Nature's Sake) মানুষের কাব্যকে অধিকার করেছে অনেক পরবর্তীকালে। প্রকৃতির মধ্যে মানুষ যতদিন বাস করেছে ততদিন প্রকৃতির সাদারূপটি দেখবার অবসর বা সুযোগ যেন তার ছিল না। প্রকৃতিকে ব্যবহারিক জৈব জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না করে উপায় ছিল না। প্রকৃতির অঙ্কনিবাসী আদিম মানুষের প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় ঋগবেদেব মধ্যে বেঁচে আছে।

ঋগ্বেদের নিসর্গপ্রীতির প্রধানতম পরিচয় প্রকৃতিতে জীবত্ব আরোপে (Personification of Nature)। নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নৈসর্গিক প্রপঞ্চ (Phenomenon)-গুলিকে ঋগ্বেদে প্রাণবান বলে কল্পনা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রাণী সুলভ গুণাবলী আরোপ করা হয়েছে। আর তাদের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে নানাপ্রকার আখ্যায়িকা। সূর্যকে সম্রাট, অগ্নিকে জরাহীন যুবক, উষাকে সুন্দর নর্তকী ইত্যাদি পরিকল্পনার মধ্যে ঋগবেদের কবিগণের নিসর্গকে মানবিক রূপদানের চেষ্টা অভিব্যক্ত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হবে।

> *'হে দীপ্তিমান সর্বপ্রকাশক সূর্য! হরিৎনামক সপ্তঅশ্ব-রথে তোমাকে বহন করে, জ্যোতিই তোমার কেশ।'
>
> 'অগ্নি মহৎ, পরিমাণরহিত, ধূমরূপকেতুবিশিষ্ট ও বহুদীপ্তিসম্পন্ন'।
>
> 'উষা নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ কারতেছেন···'
>
> 'আমরা প্রভাসম্পন্না সুনৃত বাক্যের নেত্রী (পশুপক্ষীমৃগাদি উষাকালে শব্দ করে) বিচিত্রা উষাকে জানি,···। ঐ নিত্যযৌবনসম্পন্না, শুভ্রবসনা আকাশ দুহিতা অন্ধকার দূর করতঃ দর্শনগোচর হইয়াছেন।'

*অনুবাদগুলি রমেশচন্দ্র দত্তের 'ঋগবেদ সংহিতা' থেকে গৃহীত।

শুধু সূর্য, অগ্নি এবং উষাই নয়, মরুৎগণ, দাব্যাপৃথিবী এবং বায়ুও শক্তিশালী মানবের রূপে পরিকল্পিত হয়েছে।

'হে মরুৎগণ! তোমাদিগের যে অশ্বগণ (মেঘ) নিজ বলে সমস্ত লোক ভ্রমণ করে, তাহারা নিজেই রথে যুক্ত হইয়া গমন করে। তোমাদের গমন অতীব আশ্চর্য।...লোকে আয়ুধ উত্তোলিত করিলে যেরূপ ভীত হয়, সমস্ত ভুবন ও অট্টালিকা তোমাদের গমনকালে সেইরূপ ভীত হয়।'

'রশ্মিগণ তাঁহাদিগের (দাব্যাপৃথিবী) পরিচ্ছদ করিতেছে। স্বব্যাপারনিরত রশ্মিগণ অন্তরীক্ষের মধ্যে নূতন তন্তু বিস্তার করিতেছে।'

'দীপ্তিযুক্ত-উষাগণ দূরদেশে তোমারই (বায়ু) কল্যাণকর বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন, নূতন রশ্মিতে বিচিত্র বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন ......তুমি বৃষ্টি নদনদীয় উৎপাদনার্থ অন্তরীক্ষ হইতে মরুৎগণকে উৎপাদন করিয়াছ।'

আকাশ বহু নক্ষত্র বিভূষিত বলে আকাশরূপী ইন্দ্রকে সহস্রাক্ষ বলে কল্পনা করা হয়েছে এবং এ কল্পনা থেকেই পরবর্তীকালে অহল্যা এবং গৌতমের উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। মরুৎগণকে পৃশ্নি অর্থাৎ আকাশের সন্তান আখ্যা দেওয়া হয়েছে, মেঘ এবং অন্ধকারকে দেওয়া হয়েছে অসুরের রূপ। সূর্যরূপী ইন্দ্র অন্ধকাররূপী বৃত্রাসুরকে বধ করেন—এই নৈসর্গিক প্রপঞ্চ (Phenomenon)-এর অণুপূরক হিসেবে বৃত্রের স্বর্গ অবরোধ এবং ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু, এই আখ্যায়িকার পরিকল্পনা। উষাকে অনুসরণ করে সূর্যের উদয় তাই কোনো কোনো সূক্তে উষাকে সূর্যের মাতা বলে অভিহিত করা হয়েছে, রাত্রিকে উষার ভগ্নীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সূর্য উষার পশ্চাতে ধাবমান হন বলে কোনো কোনো সূক্তে আবার সূর্যকে উষার প্রণয়ী-রূপে আঁকা হয়েছে; উর্বশী ও পুরুরবার কাহিনীর পশ্চাৎপটে এই পরিকল্পনার পরিচয় আছে। সূর্যরশ্মি থেকে উষার উৎপত্তি বলে একটি জায়গায় আবার উষাকে সূর্যের কন্যা বলেও অভিহিত করা হয়েছে। নীচের উদাহরণটি কৌতূহলদ্দীপক।—

'দেবি! কন্যার ন্যায় শরীরায়ব বিকাশ করিয়া তুমি দানশীল ও দীপ্তিমান (সূর্যের) নিকট গমন কর। পরে যুবতীর ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্টা হইয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর।'

এস্থানে একই সঙ্গে ঊষাকে কন্যা এবং প্রণয়িনী করিয়া তোলা হয়েছে। এই সূক্তটির সহিত রবীন্দ্রনাথের একটি প্রভাত বর্ণনার প্রচুর চিত্রগত সাদৃশ্য আছে। মানবত্ব আরোপের দ্বারাই কবি প্রভাতের রূপবর্ণনা করেছেন :

'বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতরাণী।'

নৈসর্গিক প্রপঞ্চ (Phenomenon) গুলির পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে আখ্যায়িকা গড়ে তোলার এই প্রচেষ্টার উদাহরণ ঋগবেদে অজস্র। নিসর্গে জীবত্ব আরোপের প্রথমতম এই বৈদিক প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে অন্যান্য সংস্কৃত কাব্যকাহিনীতে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতিতে জীবত্ব আরোপই ঋগবেদের ঋষি-কবিদের দৃষ্টিকে প্রায় পুরোপুরি অধিকার করে ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে একথাও বোঝা যাবে যে, ঋগবেদের ঋষিকবিরা যে চোখ দিয়ে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তার মধ্যে ব্যবহারিকতার (Pragmatism) অংশও কিছু কম নয়। প্রাকৃতিক যে প্রপঞ্চগুলিকে ঋগবেদের কবিগণ দেবতারূপে কল্পনা করেছেন, তাদের ব্যবহারিক মূল্যই তাদের কাব্যের রূপ নিরূপণ করেছে। পরিকল্পিত দেবতাদের বা কোনো কোনো সময় দেবশত্রু অসুরদের বন্দনা বা বর্ণনার মধ্যে আদি মানবের ব্যবহারিক দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। সূর্য, বায়ু, মরুৎ প্রভৃতি শুধু আমাদের চক্ষু বা সৌন্দর্যানুভূতিকে পরিতৃপ্ত করে বলেই দেবতার সম্মান লাভ করেনি, মানবের জীবন ধারণের পক্ষে তাদের মূল্য মানুষকে কৃতজ্ঞ করেছে। অন্ধকার, মেঘ ও অনাবৃষ্টিকে অসুররূপে পরিকল্পনার মধ্যেও এই ব্যবহারিকতার অন্য দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। রুদ্রকে দেবতার রূপদানে আদিম

মানবের শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের (awe) প্রকাশ। উষা এবং রাকা-রজনীকে বন্দনার মধ্যে অবশ্য সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় আছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে এই সব বর্ণনার পশ্চাতেও সেই ব্যবহারিকতার আদর্শ ই সূচিত হয়েছিল। অন্ধকার দূর করে সূর্যের আগমনী ধ্বনিত করেন বলেই ঋগবেদের ঋষি-কবিরা প্রথমে উষার কল্পনা করেছিলেন নিছক সৌন্দর্যানুভূতির খাতিরে নয়। রাকারজনী বা পূর্ণিমারাত্রি এবং সিনীবালী বা অমাবস্যার বর্ণনায়ও ব্যবহারিকতাই শুরুতে প্রধানতম আকর্ষণ ছিল। কিন্তু প্রকট ব্যবহারিকতার কারাপ্রাচীর থেকে উত্তরণের কিছু কিছু পরিচয় ঋগ্বেদে আছে। সেগুলি শুধু যে কবিত্ব-রস সমন্বিত তাই নয় ভাষা সম্বন্ধে এবং রূপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেগুলি ভারতীয় সাহিত্যের অগ্রদূত।

ঋগবেদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিলিত করে প্রকৃতি বর্ণনার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে কারণ ঋগবেদই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু নিছক প্রকৃতি-পূজার আদিতম ধর্মানুষ্ঠানের গ্রন্থ বলে এর পরিচয় দিলে ভুল করা হবে। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্ অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসাম (A. L. Basham) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Wonder that was India" নামক গ্রন্থে লিখেছেন।—

In their literary aspect much of this literature is of high merit, especially some hymns of the Ṛg Veda and some parts of earlier Upanishads,···

The 1028 hymns of the the Ṛg Veda are the work of many authors and show great variation of style and marit. Though their composition may have covered severrl ceturies (1500 to 900 B.C.), even the earliest of the poem is the product of a iong tradition, composed according to strict metrical scheme and settled literary convention."

"সাহিত্য বিচারে এই সাহিত্যের (প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্য) বৃহত্তম অংশই উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিক নিদর্শন। ঋগ্বেদের কিছু সূক্ত এবং প্রাচীনতম উপনিষদকে এই পর্যায়ের মধ্যে গণ্য করা যায় ;···

*ঋগবেদের ১০২৮টি সূক্ত অবশ্য বিভিন্ন কবির রচনা এবং রচনা-*শৈলী এবং রচনার দক্ষতাও বহুতর বিভিন্ন আদর্শকে অবলম্বন করেছে। এগুলির রচনাকাল কয়েক শতাব্দী ধরে (খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রীস্টপূর্ব ৯০০)। প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির পশ্চাতে বহু কালের ঐতিহ্যও বিধৃত হয়ে আছে। এগুলি বিধিবদ্ধ ছন্দ রীতি এবং পরিণত সাহিত্যিক নীতিকে অবলম্বন করেছে।"

ঋগবেদের বা উপনিষদের সাহিত্যিক মূল্য আমাদের আলোচনার গণ্ডীর বাইরে তবুও প্রাচীনতম অন্যান্য দেশের বা সাহিত্যের সঙ্গে এর রচনাকালের তুলনা প্রাসঙ্গিক বলেই একজন বিদেশী প্রাচ্যবিদের রচনা থেকে উক্তি উদ্ধৃত করা হল। উক্ত গ্রন্থের অন্যস্থানে আছে।—

"A number of hymns show deep feeling for nature the most famous of these being the hymns to Usas, the goddess of Dawn but the hymns to Usas are perhaps less beautiful than the single hymn to Ratri the pesonified night.

"The Goddess Night has looked abroad
with her eyes, everywhere drawing near.
she has put all her glories on.

The immortal goddess now ha filled
wide space, its depths and heights
her radiance drives out the dark.

Approaching, the goddess has expelled
her sister Dawn.
Now darkness also disappears.

And so you have drawn near to us,
who at your coming have come home,
as birds to their nest upon tree.

The Clans have now gone home to rest
home the beasts and home the birds
home even the hawks who lust for prey.

Guard us from the she-wolf and the wolf
and guard us from the thief, O night,
and so be good for us to pass.

For darkness, blotting out, has come
near me, black and palpable
o dawn, dispel it like my debts.

I have offered my hymn as a cow
is offered, Daughter of Heaven, O Night
accept it as victor praise.'

Similarly sentive to the moods of nature is the little hymn to Araṇyani, the elusive spirit of the forest.

Lady of the Forest ! Lady of the Forest,
who seem to van from sight in distance
why do you never come to th village ?
surely you are not afraid of men !

When the grasshopper replies
to the distant lowing cattle,
as through to the sound of ticking bells
the Lady of the Forest makes merry

Sometimes you catch a glimpse of her, and think
it is cattle grazing
or a house far away,
and at evening you hear the Lady of the Forest
like the distant sound of moving wagons.

Her voice is as the sound of a man calling his cattle
or as the crash of a felled tree
If you stay in the forest in the evening.
you will hear her like far voice crying

But the Lady of the forest will not slay
 unless an enemy draws near.
she eats the sweet wild fruits,
 and then she rests wherever she will.

Now I have praised the Lady of the forest
who is perfumed with balm and fragrant,
who is well fed although she tills not,
the mothe of all all things of the wild'

"কয়েকটি সূক্তে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় প্রীতির পরিচয় আছে। তার মধ্যে ঊষাকালের দেবী উষস-এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত সূক্তগুলিই প্রধান। তবুও মনে হয় উষস প্রতি নিবেদিত সূক্তগুলির থেকেও রাত্রিরূপিণীর উদ্দেশ্যে রচিত রাত্রিব মাত্র একটি বর্ণনা এদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

'রাত্রিদেবী আগমন পূর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নক্ষত্র সমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন ॥

দেবরূপিণী রাত্রিদেবী অতি বিস্তার লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা নীচে থাকেন, কি যাহারা ঊর্ধে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন ॥

রাত্রিদেবী আসিয়া উষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ করিলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করিলেন ॥

পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে বাস করে, তদ্রূপ যাঁহার আগমনে আমরা শয়ন করিয়াছি, সেই রাত্রি আমাদের শুভকরী হউন ॥"

গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হইয়াছে; পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ, সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া শয়ন করিয়াছে।

হে রাত্রি, বৃকী ও বৃককে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও, চোরকে দূরে লইয়া যাও। আমাদিগের পক্ষে বিশিষ্টরূপে শুভকরী হও ॥

কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট লক্ষ্য হইয়া দেখা দিয়াছে, আমার

নিকট পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। হে উষাদেবি, আধার ঋণকে যেমন পরিশোধপূর্বক নষ্ট কর, তদ্রূপ অন্ধকারকে নষ্ট কব ॥

হে আকাশের কন্যা রাত্রি, তুমি যাইতেছ, তোমাকে গাভীর ন্যায় এই সমস্ত স্তব অর্পণ করিলাম তুমি গ্রহণ কব ॥"

অরণ্যানী বা অথবা অরণ্যরূপিণীর উদ্দেশ্যে বচিত একটি ক্ষুদ্র সূক্তে প্রকৃতির বিভিন্ন মেজাজের প্রতি অনুরূপ সচেতন অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে।

'হে অরণ্যানী, তুমি যেন দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া যাও (অর্থাৎ কতদূর চলিয়াছ, স্থিব করা যায় না)। তুমি গ্রামে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা কর না? তোমার কি একাকী থাকিতে ভয় হয় না?"

এক জন্তু বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছে, আর এক জন্তু চী চী ইত্যাকার শব্দ করিয়া যেন তাহার উত্তর দিতেছে, যেন ইহারা বীণার ঘটায় ঘটায় (পর্দায় পর্দায়) শব্দ নির্গত করিয়া অরণ্যানীকে বর্ণনা করিতেছে ॥

অবণ্যানীর মধ্যে কোথাও যেন গাভী চরিতেছে, এইরূপ ভ্রম হয়, কোথাও যেন একটি অট্টালিকার মতো স্পষ্ট হয়, সন্ধ্যা বেলা যেন উহার মধ্য হইতে কত শত শকট নিগত হইয়া আসিতেছে ॥

তবে কি সেই এক ব্যক্তি গাভীকে আহ্বান করিতেছে? তবে কি এই আর একব্যক্তি কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে? অরণ্যানীর মধ্যে যে ব্যক্তি থাকে, সে জ্ঞান করে যেন সন্ধ্যাবেলা কেহ চীৎকার করিয়া উঠিল ॥

বাস্তবিক অরণ্যানী কাহারও প্রাণ বধ করে না। অন্য অন্য পশু না আসিলে তথায় কোনো আশঙ্কা নাই, তথায় সুস্বাদু ফল আহার করিয়া অতি সুখে কালক্ষেপ হয় ॥

মৃগনাভির ন্যায় অরণ্যানীর সৌরভ কত, আহার তথায় বিদ্যমান

আছে, তথায় বৃক্ষলোকি আদৌ নাই। অরণ্যানী, হরিণদিগের
জননী-স্বরূপা। এইরূপে আমি অরণ্যানীর বর্ণনা করিলাম॥'[১]

যদিও এই বর্ণনাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে তবু প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রীতির পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হয়েছে। রাত্রি এবং অরণ্যানীর ভয়াবহতা এই প্রীতিকে নষ্ট করতে পারে নি। রাত্রির প্রতি নিবেদিত এই সূক্তের প্রথম অংশটি পৃথিবীতে বিস্তৃত রাত্রির মধ্যেই মনকে আচ্ছন্ন করে। জন্তুদের শব্দকে বীণার পর্দায় পর্দায় অরণ্যানীর স্তবগান বলে বর্ণনা করার মধ্যেও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় প্রকৃতিচিত্রকে অর্থের ঝংকারে পূর্ণ করেছে।

রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনা বা প্রকৃতি চিত্র থেকে উপমা সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঋগবেদের ঋষিকবিগণ বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। কয়েকটি উপমা সুন্দর, কালিদাসের পূর্ববর্তী হিসেবে তাদের যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্য। তবে কোনো কোনো স্থানে সেগুলির দেহে যেন জীবত্ব আরোপ এবং বিশেষভাবে ব্যবহারিকতার গন্ধ নিষিক্ত হয়ে আছে। উপরে যে দুটি দীর্ঘ রাত্রি এবং অরণ্যানীর বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে এই ব্যবহারিকতা কিছু পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। উপমা প্রয়োগের কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

সে বাক্য ফলপূর্ণ শাখায় ন্যায়।'

ইহার মধ্যে ব্যবহারিকতার আভাস আছে।

'পক্ষিগণ যেরূপ নিবাস স্থানের দিকে ধাবমান হয়, আমার ক্রোধ চিন্তাসমূহ সেইরূপ ধনপ্রাপ্তির জন্য ধাবিত হইতেছে।'

'ইন্দ্র তৃষিত মৃগের ন্যায় দ্রুতবেগে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইবেন।' এই উপমা দুটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে এবং ভাষায় বার কয়েক ব্যবহৃত হয়েছে।

১। ঋগবেদের বাংলা অনুবাদগুলি রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদ সংহিতা থেকে আহৃত। প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক এ. এল. বাসমের ইংরেজি অনুবাদ অংশের সঙ্গে এর কিছু প্রভেদ আছে। তবু ইংরেজি অনুবাদের বাংলা অনুবাদের চেষ্টা থেকে বিরত থাকাই সমীচীন বলে মনে হয়েছে।

'...পৃথিবীও বৃদ্ধ এবং জীর্ণ নরপতির ন্যায় ভয়ে কম্পিত হয়।' এই উপমাটিতে মানবত্ব আরোপের চেষ্টাই বিশেষভাবে অভিব্যক্ত। 'উর্মিসমূহ যেরূপ হ্রদ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যে স্তোত্রসমূহ তোমাকে বর্ধন করে, সে সমস্ত তোমাকে প্রাপ্ত হয়।'

'যেরূপ মহতী সপ্তনদী সমুদ্র অভিমুখে প্রধাবিত হয়, সেইরূপ হব্যের অন্ন অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়।'

যেমন মেঘ গর্জন (আসন্ন) বৃষ্টি প্রকটিত করে, আমি ধন লাভার্থ-তোমাদের সেই উগ্রকর্ম সেইরূপ প্রকটিত করিতেছি।'

'জল যেরূপ দ্বীপকে ধারণ করে, সেইরূপ অগ্নিহব্য ধারণ করিতেছে।'

'রৌদ্রতপ্ত ব্যক্তি যেরূপ ছায়ালাভ করে, আমিও সেরূপ পাপশূন্য হইয়া রুদ্রদত্ত সুখলাভ করিব।'

এই উপমাগুলির মধ্যে কবিত্ব এবং দৃষ্টিশক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে তবে প্রকট বা ক্ষীণ ব্যবহারিকতা সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়।

'চক্রবাকদ্বয় যেরূপ দিবসে আইসে...তোমরা আমাদের অভিমুখে আগমণ কর।'

যে চক্রবাক দম্পতির যুগল প্রেম নিয়ে পরবর্তী সংস্কৃত এবং বাঙলা সাহিত্যে রাশি রাশি কবিতা রচিত হয়েছে, সেই চক্রবাকের বোধ হয় সর্বপ্রথম উল্লেখ এই উপমাটিতে। একটি সূক্তে মরুৎগণের শব্দের সঙ্গে বীণার সুরের তুলনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী রাত্রির বর্ণনায় বীণার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। এ অংশটিতেও বীণাবাদনের আলঙ্কারিক প্রয়োগ কবিত্ব মণ্ডিত।

'শোভন-দানশীল মরুৎগণ বীণা বাজাইয়া সোমপানে হৃষ্ট হইয়া রমণীয় ধন দিয়াছিলেন।'

পরবর্তী সংস্কৃতসাহিত্যে বিভিন্ন ঋতুর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অগণিত কবিমনের সৌন্দর্য স্থষ্টির পরিচয় এবং অগণিত পাঠকের সৌন্দয তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি দান করেছে। ঋগবেদে কিন্তু ঋতু বর্ণনার কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। ষড় ঋতুর দেশ ভারতবর্ষে ঋতুগুলির

বিচিত্ররূপ তখনও হয়তো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সূর্য বিভিন্ন ঋতুর বিভাগকর্তা—কেবলমাত্র এই সংবাদটি জানিয়েই ঋগবেদের ঋষিকবিগণ সন্তুষ্ট। শুধু একস্থানে বর্ষা ও অন্যস্থানে শরৎ ঋতুর উল্লেখমাত্র আছে।

প্রকৃতি বর্ণনায় যে অনাবিল আনন্দের (Simple delight in Nature) আভাস রসসৃষ্টি করতে পারে, ঋগবেদের ঋষিকবিগণ সে সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তবে আগেই বলা হয়েছে সে রসদৃষ্টিতে মানবত্ব আরোপ এবং ব্যবহারিকতা অনধিকার প্রবেশ করেছে। তবুও স্থানে স্থানে সুন্দর বর্ণনার পরিচয় আছে। পূর্বে উল্লেখিত রাত্রি এবং অরণ্যানীর বর্ণনার মতো দীর্ঘ না হলেও এগুলিতে চরিত সৌন্দর্য সৃষ্টির পরিচয় আছে।

'কৃষ্ণবষণশীল (মেঘ) ও গর্জন করিয়াছে এবং সুখকর ও হাস্যযুক্ত (বৃষ্টি) বিন্দুর বহিত আগমন করিতেছে। বৃষ্টি পতিত হইতেছে এবং মেঘ গর্জন করিতেছে।'

'সমতল পৃথিবী (মেঘ গর্জন শ্রবণে) প্রীত হইল ; মেঘও ইতঃস্তত গমন করিয়া শোভা পাইল।'

এই বর্ণনাগুলিতে অনাবিল আনন্দের পরিচয় আছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ঋগ্‌বেদের ঊষার বর্ণনাগুলি বিখ্যাত, বিদেশী পাঠককেও সেগুলি মুগ্ধ করেছে। কবিত্ব এবং অর্ন্তদৃষ্টির পরিচয় সে বর্ণনাগুলির প্রতিছত্রেই প্রকাশিত তবে মাঝে মাঝে ব্যবহারিকতা অবতারণায় রস সৃষ্টি কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে একথা বলতেও বাধা নেই। প্রকৃতি বর্ণনার আদিম পরিচয় ব্যবহারিকতা মণ্ডিত হবে সেও স্বাভাবিক। ঋগবেদের কয়েকটি স্থানে প্রকৃতির কোনো কোনো রূপকে সুন্দর বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। আমাদের বর্তমান আলোচনায় এদের স্থান আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু কবিত্ব ও প্রকাশ ভঙ্গির সুষ্ঠুতা সে বিশেষণগুলিকে অনবদ্য করেছে বলেই সে জাতীয় দু একটি বিশেষিত প্রকৃতিচিত্রের উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

'ধূলি প্রেরক মরুৎগণ' এবং 'তীরলঙ্ঘিনী নদী' এই কথাগুলির মধ্যে কবি-চক্ষু-সম্পন্ন ব্যক্তির প্রকৃতিপ্রেম অভিব্যক্ত।

নিসর্গ প্রীতির আর নূতন কোনো রূপের সন্ধান ঋগবেদে নেই, থাকা হয়তো সম্ভবও ছিলনা। সমসময়ে রচিত অন্যদেশ বা জাতির সাহিত্যে ঋগ্‌বেদের মতো প্রকৃতি সচেতনতা ছিল কিনা সেও স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। পরবর্তী বেদগুলিতে প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় এমন কিছু নেই সেগুলিতে অনুষ্ঠানের কিংবা কোনো পরাবিদ্যার কথাই মুখ্য। দু একটি অপূর্ব কাব্যাংশ থাকলেও এই বেদগুলিতে নিসর্গ প্রীতি কোনো নূতনতর দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেনি। সেগুলি আমাদের আলোচনার গণ্ডীর বাইরে। উপনিষদের সাহিত্যিক মূল্য প্রচুর কিন্তু ঋগবেদের ঋষিদের আদিম দৃষ্টিভঙ্গির প্রচুর রূপান্তরও ঘটেছে। কিন্তু উপনিষদ্‌গুলির মূল্য প্রধানত দার্শনিক এবং তাদের সাহিত্যিক মূল্য ধর্মানুগ। The wonder that was India গ্রন্থে Prof. A. L. Basham লিখেছেন,

"The upanisads rank high as literature, but their chief importance is religious and they have sufficiently treated and quoted in that setting."

--উপনিষদগুলির সাহিত্যিক মূল্য অপবিসীম কিন্তু তাদের মুখ্য পরিচয় ধর্মীয় এবং যথাস্থানে এগুলি থেকে বহুতব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু একটা কথা মনে বাখতে হবে যে উপনিষদ্‌গুলি বচিত হয়েছিল অরণ্য পরিবেশের মধ্যে। ঋগ্‌বেদ যখন গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয়েছিল, পণ্ডিতেরা মনে করেন, তার অনেক আগেই তার সূক্তগুলি রচিত হয়েছিল। সুতরাং ঋগ্‌বেদের পরিবেশ যেমন আছে, অরণ্য বহির্ভূত পরিবেশের কিছু কিছু পরিচয়ও আছে। একস্থানে অট্টালিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্‌বেদের সমাজ প্রায় সর্বতোভাবে যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করেনি, যদিও বা করে থাকে তবুও যাযাবর বৃত্তির স্মৃতি সূক্তগুলির মধ্যে মিশে আছে। মনে হয় উপনিষদের সমাজ-বিভাগ একদিক থেকে সম্পূর্ণ হয়েছে। অবণ্য পরিবেশের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত ছিলেন, তাদের বাইরেও

গ্রামীণ বা অংশত নাগরিক সমাজও ছিল। অত্যন্ত সংগত কারণেই উপনিষদের ঋষিরা অরণ্য প্রকৃতিকেও তাঁদের ধর্ম জীবনের সঙ্গী করেই পেয়েছিলেন। প্রকৃতির এই অনুষঙ্গ পরবর্তী ভারতীয় দৃষ্টিকে চিরকালের জন্য প্রভাবিত করেছে। ভারতীয় মনে প্রকৃতি একটি আলংকারিক সত্তা নয়, মানুষের জীবন নাট্যে তার যেন একটি সজীব ভূমিকা আছে। রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে (প্রাচীন সাহিত্য, শকুন্তলা) এই বিশেষত্বটিকে অনুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

"অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে অনুসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত, যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান এমন অত্যাবশক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব এমন প্রত্যক্ষ এমন ব্যাপক এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া এ তো অন্যত্র দেখি নাই। বহিঃপ্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়া পর করিয়া ভাবে, সেখানে মানুষ আপনার চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সর্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে থাকে সেখানকার সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না।"

এই যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কথা "অভিজ্ঞান শকুন্তল" নাটকের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সে দৃষ্টিভঙ্গি উপনিষদের কাছ থেকেও পাওয়া। উপনিষদের ঋষিদের দার্শনিক চিন্তা একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে, জগতের জড় উদ্ভিদ ও চেতনের মধ্যে একটি বিশ্বপ্রাণ নিরন্তর স্পন্দিত হচ্ছে।

"যদিদং কিঞ্চিত জগৎ সর্বং প্রাণ এজাতি নিঃসৃতম।"

—কঠোপনিষদ্ ২।৩।২

পরমপ্রাণের লীলা থেকে নিঃসৃত হয়ে এরা সমস্ত প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। ঋতুতে ঋতুতে ওষধিতে বনস্পতিতে যে বৈচিত্র্যপরম প্রাণের লীলা থেকে নিঃসৃত হয়ে কম্পিত হচ্ছে ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-জীবনের নমস্কার সর্বদাই সেই বিচিত্রের পদপ্রান্তে পৌঁছেছে।

যৌ দেবোহগ্নৌ যো হপ্‌সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশঃ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥
—শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদ্ ২।১৭

এই যে জড় এবং চেতনের সঙ্গে ভারতীয় মনের আত্মীয়তা এটি উপনিষদেরই উত্তরাধিকার। পরবর্তী সব কাব্যেই এই উত্তরাধিকার বহন করছে। বিশেষ করে কালিদাসের কাব্য এবং এ-যুগে রবীন্দ্রনাথের কাব্য এই উত্তরাধিকার বিশেষ বিশেষ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। ঋগ্‌বেদে যে ব্যবহারিকতা প্রকৃতি চেতনাকে ক্ষণে ক্ষণে আচ্ছন্ন করেছে উপনিষদের দার্শনিকতা তা থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল এটাই আমাদের এ-আলোচনায় উপনিষদের সর্বাধিক গুরুত্ব।

এর পর যে-কাব্য দুটির আলোচনা করব. ভারতীয় লোকজীবনে সে দুটির গুরুত্ব সর্বাধিক। এগুলি একাধারে কাব্য ধর্মগ্রন্থ এবং ইতিহাস, রচনার সময় নিয়ে মতভেদ আমাদের আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য নয়। রামায়ণ এবং মহাভারতের মধ্যে রামায়ণের মধ্যেই প্রকৃতির বর্ণনার প্রাধান্য বেশি। সেজন্য "রামায়ণকেই" প্রথম বিচার করা হবে। উপনিষদ-বর্ণিত প্রকৃতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক-আত্মীয়তা রামায়ণে পুরোপুরি লক্ষ্য করা যায় না কিন্তু রামায়ণে আলংকারিক প্রকৃতি বর্ণনা ক্ষণে ক্ষণেই প্রকৃতিকে মানুষের সুখ দুঃখের সাথী করে তুলেছে। প্রকৃতির প্রতি আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গির সুদূর আভাসও মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

রামায়ণকে ভারতীয়রা যদিও ধর্মগ্রন্থ রূপেই চিরকাল পূজা করেছে, রামায়ণে সুখদুঃখময় মানব জীবনের চিত্র প্রধান। কাজেই রামায়ণে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ সুখদুঃখের সম্পর্ক স্থাপন করেছে। রামায়ণের নিসর্গপ্রীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব সহানুভূতিশীল প্রকৃতি-

চিত্রের (sympathetic Nature) অবতারণা। প্রকৃতির সৌন্দর্য বা মাধুরী অনেকাংশে মানবমনেরই দান। সুতরাং, মনের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রকৃতির রূপের পরিবর্তন স্বভাবতই সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করেছে। মনের ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রকৃতির রূপের এই যে পরিবর্তন তাই সহানুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্রের মূলকথা। সীতাহরণের সময় রাবণের রূপ দেখে,—'জনস্থানস্থিত বৃক্ষ সমস্ত কম্পবিহীন হইল এবং বায়ুও প্রচণ্ড বেগে বহিল না। অপিচ দ্রুত-বাহিনী গোদাবরী নদীও রাবণ দর্শন করিতেছে বলিয়া মন্দ বেগে গমন করিতে লাগিল।'

সহানুভূতিশীল প্রকৃতি চিত্রের এটি চমৎকার উদাহরণ, সীতার মনের গভীর আশঙ্কাটি যেন সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে। আর একটু পরেই আছে—

'পক্ষি সমূহে পরিব্যাপ্ত পাদপ সকল ঊর্ধ্বগামী বায়ুদ্বারা সমাদৃত ও কম্পিতাগ্র হইয়া যেন তাহাকে ভয় করিবেন না ইহা বলিতে লাগিল। পদ্মসকল বিধ্বস্ত এবং মীন প্রভৃতি জলচারী জন্তু সমূহ ত্রস্ত হওয়ায়, পদ্মাকর সরোবর সকল উৎসাহবিহীনা সখীর ন্যায় যেন মিথিলারাজ দুহিতা সীতার নিমিত্ত শোক করিতে লাগিল…। সীতা হ্রিয়মানা হইলে, পর্ব্বতেরা শৃঙ্গ স্বরূপ সমুচ্ছ্রিত বাহুসম্পন্ন ও নির্ঝর হইতে বহির্গত জলস্বরূপ অশ্রুদ্বারা প্লাবিত বদন হইয়া যেন ক্রন্দন করিতে লাগিল শ্রীমান সূর্য্যও বিদেহ রাজদুহিতা সীতাকে হ্রিয়মানা দর্শন করিয়া দীন ও প্রভাববিহীন হইলেন এবং তদীয় পরিবেশও পাণ্ডুরবর্ণ হইল।

'…'মৃগশাবকেরা ত্রাসন্বিত ও দীনমুখ হইয়া ভয় সহকারে শোভাবিহীন, ঊর্ধ্বনয়নে তাহাকে অবলোকন করতঃ যেন রোদন করিতে লাগিল।' সীতার বিলাপের করুণ প্রতিধ্বনিও যেন এই বর্ণনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। সীতা হরণের সময় সীতার পশু-

* অনুবাদগুলি বর্ধমান মহারাজের ব্যয়ে মুদ্রিত মূল রামায়ণের অনুবাদ গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

পক্ষী, তৃণলতাদিকে লক্ষ্য করে বিলাপের পিছনেও এই সহানুভূতিশীল প্রকৃতি চিত্রের পরিচয় আছে। পশুপক্ষী এবং বৃক্ষলতাদিকে মানবের ন্যায় সহানুভূতি মনে না করলে তাদের উদ্দেশ্যে বিলাপ নিরর্থক হয়ে যেত। প্রকৃতির প্রতি সখীর ন্যায় আচরণ পরবর্তীকালে কালিদাসের কাব্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, সীতার পশুপক্ষী বৃক্ষ-লতাদিকে লক্ষ্য করে বিলাপের মধ্যে তাহারাও যেন আভাস সূচিত হয়েছে। রামের বিরহদশায়ও দু একটি সহানুভূতিশীল নিসর্গ চিত্রের অবতারণা করা হয়েছে কিন্তু কবিত্ব সৃষ্টিতে তাহারা উপরে উদ্ধৃত উদাহরণগুলি থেকে হীন। নির্বিকার প্রকৃতি বর্ণনা (Indifferent Nature) রামায়ণে প্রায় নেই।

পূর্ব আলোচনায় একথা বলা হয়েছে যে. ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে প্রকৃতির প্রতি আত্মলীন দৃষ্টির প্রভেদ শুধু পরিমাণের (degree) তারতম্যের জন্য। কোনো কোনো স্থানে এ দুপ্রকার প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যেকার সীমারেখা এত ক্ষীণ যে ইহাদের প্রভেদ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সীতাহরণের পর রামের বিরহ দশায় বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ বর্ণনার সমাবেশ করা হয়েছে। ঋতুবর্ণনা হিসেবে তাদের মূল্য নিরূপণ স্থানান্তরে আছে, কিন্তু ভাবানুষঙ্গী কাব্য হিসাবে এদের মূল্যও বড়ো কম নয়।

‘পম্পার নির্মল জল মধ্যে পদ্ম সমস্ত পবনাঘাতে বেগ বিশিষ্ট তরঙ্গ সমূহ দ্বারা আন্দোলিত হইয়া অতিশয় বিরাজিত হইতেছে। পদ্ম সমস্ত যাহার অত্যন্ত প্রিয়, সেই বিদেহ রাজনন্দিনী পদ্মসদৃশ বিশাল নয়না সীতাকে না দেখিয়া আমি জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ করি না।’

‘সূর্য্য-কিরণ সন্তপ্তা সেই বসুন্ধরা সম্প্রতি নববারি ধারায় পরিপ্লুতা হইয়া যেন শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায় বাষ্পবারি বিমোচন করিতেছে।’

‘নবীন নীল মেঘাশ্রিত বিদ্যুৎ স্ফুরিত হওত, রাবণাঙ্কে কম্পিতা তপস্বিনী বিদেহ রাজনন্দিনী সীতার ন্যায় আমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে।’

রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র এবং প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের সন্ধান থাকলেও ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি চিত্রই এদের প্রাণ। কোনো কোনো স্থানে এই প্রকৃতিবর্ণনা প্রাসঙ্গিক আত্মলীনতা (subjectivity) গভীরতর রূপ ধারণ করেছে।

'অশোকস্তবক সকল যাহার প্রদীপ্ত অঙ্গার স্বরূপ, তাম্রবর্ণ কোমল পল্লব সমস্ত যাহার শিখা স্বরূপ ও ভ্রমর শব্দ যাহার ধ্বনিস্বরূপ সেই বসন্তরূপ অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিবে।'

আমি সীতার অদর্শন জন্য শোকে সন্তপ্ত হওয়ায় বর্ষার চারি মাস শতবর্ষ পরিমাণে গত হইয়াছে।'

প্রকৃতির প্রতি আত্মলীন যে দৃষ্টিভঙ্গী কালিদাসের কাব্যকে উর্বব করে আধুনিক কালে রবীন্দ্র-কাব্যে এসে সোনার ফসল ফলিয়েছে তার সুদূর আভাসের সন্ধান যেন এ বর্ণনাগুলিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় উদাহরণটি স্বতই বাঙলার বৈষ্ণবকাব্যের বিরহিণী রাধিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রথম উদ্ধৃতিতে কোমল পল্লবের সঙ্গে অগ্নিশিখার তুলনাটি রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার করিয়াছেন,

'চির তপস্বিনী ধরণীর
ওরা শ্যাম-শিখা হোমানল।'

রামায়ণে রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনাগুলিও সুন্দর, স্থানে স্থানে কালিদাস-সুলভ গভীরত্বের ইঙ্গিতও আছে। রাম এবং লক্ষ্মণের কাছ থেকে প্রত্যাগত অপমানিত শূর্পণখাকে উদ্দেশ্য করে তার ভাই খর বলেছিলেন,

'যেরূপ লবণসমুদ্র স্বীয় উচ্ছলতি জল ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও তোমার অপমানে সমুৎপন্ন এই তুলনাবিহীন ক্রোধ ধারণ করিতে পারিতেছি না'।

আরও কয়েকটি রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রও অনুরূপ সৌন্দর্যে অভিষিক্ত।

'সীতার চন্দ্রসদৃশ দীপ্তিবিশিষ্ট হার তদীয় স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতন সময়ে গগন হইতে ভূতলে পতনোন্মুখ গঙ্গার সাদৃশ্য ধারণ করিল।'

'যেরূপ শারদী-শশি-লেখা নীল মেঘ সকল অপসারিত করিয়া উদিত হয়, তদ্রূপ জানকী অচিরাৎ দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণকে বিধূনিত করিয়া সমুদিত হইবেন।'

'সেই রণ মহীরুধির রাশি দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া মধুমাসে পলাশ কুসুমসংচ্ছনার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।'

'ক্রোধে অধিকতর শোণিত উদ্‌গিরণ করত সন্ধ্যাকালীন মেঘের শোভাধারণ করিয়া পুনর্বার যুদ্ধযাত্রা করিবার অভিলাষ করিলেন।'

'কুমারগণ কর্ত্তৃক প্রগৃহীত শরদসদৃশ শুভ অস্ত্র সকলকে গগন মধ্যস্থ হংসাবলীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।'

এই উপমাগুলির কবিত্ব এবং অন্তর্দৃষ্টি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয় উপমাটি বিভিন্ন ভাষায় এবং ঈষৎ পরিবর্ত্তিতরূপে প্রাচীন বাঙলার বহু কবি ব্যবহার করেছেন। 'রুধির রাশি দ্বারা প্রচ্ছন্ন' রণক্ষেত্র এবং শোণিত মণ্ডিত যোদ্ধার রূপ প্রকাশ করতে গিয়ে কবি যে প্রাকৃতিক উপাদানগুলি ব্যবহার করেছেন, সেগুলি হয়তো অনেক পরিমাণে বর্ণিত দৃশ্যের ভীষণতাকে কমনীয় করে তুলেছে। কাব্যের মধ্যে প্রকৃতির রুদ্ররূপ বা কোনো নৈসর্গিক দৃশ্যের ভীষণতা প্রকাশে অনুরূপ মনোভাব বাঙালী কবিগণের সনাতন কোমলতার পরিচয় দিয়েছেন।

রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র এক হিসাবে নিসর্গে মানবত্ব আরোপের বিপরীত রীতি এ আলোচনা আগেই করা হয়েছে। কিন্তু মানবত্ব আরোপের মধ্যে উপমার ভাবটি তেমন প্রবল থাকে না। রামায়ণের কয়েকটি স্থানে নিসর্গ চিত্রের বর্ণনায় উপমার ভাব প্রবল হয়ে উঠেছে কিন্তু নিসর্গপ্রীতির এই উদাহরণগুলিতে মানবত্ব আরোপেরই নিদর্শন।

'যেমন কোন যুবতী-কামিনী স্বীয় কান্তকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ চিত্র চন্দন বন দ্বারা প্রচ্ছন্ন দ্বীপধারিণী সেই তরঙ্গিণী সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিতেছে।'

'ঐ শৈল-শিখর হইতে এক নদী প্রবাহিত হইতেছে। বোধহয় যেন প্রণয়িণী ক্রোধভরে প্রিয়তমের অঙ্ক পরিত্যাগ পূর্বক ভূতলে

শয়ন করিয়াছে। মানিনী কামিনী কোপ সহকারে স্বামীর নিকট হইতে অন্যত্র গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে যেমন প্রিয়সখীগণ তাহাকে নিবারণ করে, তৎতীরস্থ তরুগণের শাখা সকল জলে পতিত হওয়ায় সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। প্রিয়পত্নী কান্ত প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুনরায় যেমন ফিরিয়া আসে, তদ্রূপ ঐ নদী-বৃক্ষশাখার অভিঘাত লাগায় আবর্তচ্ছলে ঘুরিয়া আসিতেছে।'

রাম বিরহে অযোধ্যার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি একস্থানে অযোধ্যাকে একাধিক নৈসর্গিক উপমানের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যে Milton এর Sucession of Similes বা উপমাগুচ্ছের মতো রামায়ণের এই বর্ণনাটিও কৌলীন্য দাবী করতে পারে। অযোধ্যাকে 'তিমিরাবৃতা, প্রকাশরহিতা, কৃষ্ণবর্ণা নিশা', 'চন্দ্র রাহু গ্রস্থ হইলে রোহিণী নক্ষত্র, 'গ্রীষ্মকালের কৃশ-কলেবরা গিরিনদী' এবং প্রবল বায়ুবেগের পর প্রশান্ত পবন দ্বারা স্থিরীভূত ঊর্মির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

রামায়ণের কোনো কোনো স্থানে নারী-সৌন্দর্যের উপমানরূপে প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হইয়াছে। 'বদন চন্দ্র সদৃশ ও নয়ন পদ্মপত্রতুল্য' এবং উরু হস্তি-হস্ত-সদৃশ, স্তন স্নিগ্ধ তালফল সদৃশ'— নারীর রূপ বর্ণনায় প্রকৃতির সাহায্য গ্রহণের এই আদিম চেষ্টাই বাঙলার বৈষ্ণব-সাহিত্যে আসিয়া কবিত্বের চরমত্ব এবং পরবর্তীকালে একঘেয়েমির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে।

উদ্দেশ্যবিহীন প্রকৃতি বর্ণনা (Nature for Nature's sake) মানুষের কাব্যে অনেক পরবর্তীকালে এসেছে। কাজেই রামায়ণে তার উদাহরণ না থাকাই স্বাভাবিক। তবে মানবমনের পটভূমিতে উপস্থাপিত করে প্রকৃতি বর্ণনায় কবির ক্লান্তি ছিল না। বন, নদী এবং পর্বতের সংখ্যাহীন বর্ণনা রামায়ণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। কাব্যবিচারে বর্ণনাগুলি অবশ্য উচ্চ শ্রেণীর নয়। মনে হয়, কবির মানসপটে বন, নদী এবং পর্বতের একটি করে বিশিষ্ট রূপ বিধৃত ছিল, ভাষা এবং অলংকারের সাহায্যে তাকে ভাঙ্গিয়ে কবিপ্রকৃতির

এ-উপাদানগুলির বর্ণনা করিয়াছেন বহুস্থানে। রামায়ণের সরোবর সর্বদাই হংস ও কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণ, নদীগুলি মনোহর পদ্মপুষ্প সমূহে শোভিত, পর্বত পক্ষিসমূহ দ্বারা সমাকুল এবং ধাতুরাগে রঞ্জিত, বন মনোরম তরুনিকর দ্বারা সমাকীর্ণ এবং নানাপ্রকার পক্ষীর নিবাসস্থল। একই দৃশ্য সম্ভার পুনরুক্তির দ্বারা মাঝে মাঝে একঘেয়ে বলে বোধ হয়। কিন্তু ভারতীয় মন এতে অতৃপ্ত হয়নি। তাছাড়া চিরাচরিত বর্ণনার কুয়াশা ভেদ করে মাঝে মাঝে একটি দুর্লভ কবিমন চকিত দ্যুতিতে আমাদিগকে মুগ্ধ কবে দেয়। সাগরবন্ধনের পূর্বে সমুদ্রের বর্ণনাটি যে কোনো দেশ বা কালের কবির পক্ষে শ্লাঘাজনক।

'...মহাসাগর যেন তবঙ্গ সকলের অগ্রভাগ দ্বারা ফেনরূপ চন্দন পেষণ করিতেছিলেন এবং শশধব নিজ কব সমূহের দ্বাবা তাহা গ্রহণ করতঃ দিগাঙ্গণার অঙ্গলেপন করিতেছিলেন।...সাগব অম্বব-সদৃশ এবং অম্বর সাগর-সদৃশ হওয়ায় সাগব এবং অম্বর নির্বিশেষরূপে এক বলিয়া বোধ হইতেছিল। সাগবে অম্বর প্রতিমা ও অম্বরে সাগর বারি সম্পৃক্ত হওয়ায় এবং উভয়েই তুল্যরূপ ক্ষেত্র ও রত্নদীপ্তি থাকাতেও উভয়কেই তুল্য বলিয়া বোধ হইতেছিল।...মহাসাগবেব ভীমরব ও নিরন্তর সেই উর্মিদাম পবস্পব তাড়িত হওয়ায় বণভেরীব ন্যায় সুমহান শব্দ হইতে লাগিল।'

কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যবর্ণনায় রামায়ণেব কবি প্রায়ই চিরাচরিত পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে পারেন নি, আমাদের কাছে সে বর্ণনায় একঘেয়েমির প্রশ্রয় অবারিত। কিন্তু ঋতু বর্ণনায় তাঁহার কবিত্ব অভিনব। এক্ষেত্রে তিনি তাঁহার যুগের অগ্রগামী। ঘটনার পটভূমি থেকে রামায়ণের ঋতুবর্ণনাগুলিকে তুলে আনলে মনে হবে কবিত্বে সমুজ্জ্বল এই বর্ণনাগুলি অতি আধুনিক। বস্তুলীন দৃষ্টিভঙ্গির (objective treatment of Nature) কবি হিসেবে রামায়ণের রচয়িতার বা রচয়িতাগণের পথপ্রদর্শকের সম্মান প্রাপ্য। শুধু কয়েকটি ঋতুবর্ণনার জোরেই তিনি বা তাঁরা এ প্রাপ্য আদায় করতে পারেন।

চিত্র এবং সংগীত এই কাব্যে যে ঋতুবৈচিত্র্যকে ধরে রাখা হয়েছিল, তাদের সৌরভ আজও ম্লান হয়নি।

রামায়ণে বর্ষা বর্ণনারই প্রাধান্য। পরবর্তী সংস্কৃত এবং বিশেষভাবে বাংলা কাব্যেও তাই। দশরথকর্তৃক সিন্ধুবধের পটভূমিতে একটি বর্ষাদৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। সেটিতে কেবল চাতক, ময়ূর এবং ভেক সকলের আনন্দের কথাই আছে। তবু অংশ বিশেষ সুন্দর।

'···স্থানে স্থানে বিমল সলিল সমস্ত গৈরিকাদি বিবিধ ধাতু সংযোগে ধূসর, পাণ্ডুর ও অরুণ বর্ণ হইয়া, সর্পের ন্যায় বক্রভাবে পর্বত হইতে ক্ষরিত হইতে লাগিল।'

রামের বিরহদশায় যে বর্ষাদৃশ্যেব বর্ণনা আছে, তাতে ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি, প্রকৃতির প্রতি আত্মলীন দৃষ্টির সুদূর আভাস এবং প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের পরিচয়ে পূর্ণ কিন্তু শেষের দিকে বস্তুলীন দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখবার প্রয়াস এই বর্ণনাটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

'বিদ্যুৎপতাকা বিশিষ্ট বকপংক্তি সমন্বিত, শৈলেন্দ্রশিখরাকার উৎকট শব্দকারী মেঘসকল যুদ্ধস্থিত মহামাতঙ্গের ন্যায় গর্জন করিতেছে। ··এদিকে নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে, মেঘসমূহ বর্ষণ করিতেছে, মত্তমাতঙ্গগণ নিনাদ করিতেছে, বনান্তভাগ সুশোভিত হইতেছে, প্রিয়াবিহীন পুরুষেরা চিন্তান্বিত হইতেছে, শিখিকুল আনন্দভরে নৃত্য করিতেছে···। অরণ্যস্থিত নির্ঝরে কেতক পুষ্পগন্ধের আঘ্রাণ হর্ষিত এবং মদমত্তমাতঙ্গসকল প্রপাতশব্দে আকুলিত হইয়া ময়ূরগণের সহিত নিনাদ করিতেছে। কদম্বশাখাবলম্বিত ভ্রমর সকল ধারা নিপাতে অভিহিত হইয়া উৎসব সহকারে অর্জিত পুষ্পসমূহের রসাস্বাদহেতু প্রবুদ্ধমদমন্দ মন্দ বিসর্জন করিতেছে···।'

এই বর্ণনার কোনো কোনো স্থানে ব্যবহারিকতার ক্ষীণ আভাস থাকিলেও, সে-ব্যবহারিকতা কোথাও প্রকট হয়ে ওঠেনি। একটি অংশে রামের মনের বিরহ-ব্যথাকে কবি আকাশে সঞ্চারিত করে

দিয়েছেন।' আত্মলীন দৃষ্টির সুদূর পরিচয় হিসাবে সেই অংশটি স্মরণীয়।

'সুবর্ণময়ী কণার ন্যায় বিদ্যুতের দ্বারা তাড়িত গগনমণ্ডল-অন্তর্গত স্তনিতরূপ নির্ঘোষদ্বারা যেন বেদনাযুক্তের ন্যায় বোধ হইতেছে।'

রামচন্দ্র এখানে নিজের বিরহব্যথায় হাহাকার করেন নি, মেঘময় আকাশের মধ্যে নিজের বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের তুলনা খুঁজিতেও চেষ্টা করেন নি। কিন্তু আকাশকে বেদনাযুক্ত করে দেখার মধ্যেই তাঁহাব সমস্ত কথা বলা হয়ে গিয়েছে, কবির উদ্দেশ্যও সার্থক হয়েছে।

হেমন্ত বর্ণনায়ও প্রকৃতির নিছক রূপটি দেখবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

'অধুনা কমলাকর সরোবর সমস্ত জরা-ঝর্ঝবিত পত্রযুক্ত এবং শীর্ণকেশব ও কণিকা সমন্বিত নাসমাত্রাবশিষ্ট নলিনীসমূহে সমাকুল ও হিমবিকৃত হইয়া শোভিত হইতেছে না।'

বসন্তবর্ণনার অধিকাংশই ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি পবিচয়ে পূর্ণ। সূচনায় একটু বর্ণনা আছে। মধুলোভী ভ্রমব, বসন্তের বাতাসে বৃক্ষশাখার মৃদু হিল্লোল, কোকিলের অশ্রান্ত কুঞ্জন, কিছুবই অভাব নেই। এই ধরণের বর্ণনায় আমবা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি বলে হয়তো আমাদের মনে এ বর্ণনা আজ আব কোনো ঠেকিবে না। কিন্তু রামায়ণের কবি এই ধর্ণের বণনার একজন আদি কবি। ঐতিহাসিক পববর্তী রচনায় এর কৃত্রিম অনুকরণ আদিকবির কবিত্ব গৌববকে ক্ষুন্ন করতে পারবে না। রামের বিরহদশায় একটি শরৎ-বর্ণনাও আছে। বর্ণনাটি সুন্দর। সূচনায় চক্রবাক ও হংস সমাকুলিত সরোবর, তারপর ক্ষীণ প্রবাহ নদী এবং কহ্লারগন্ধী সমীরণ ইত্যাদি বর্ণনাটিকে উপাদেয় কবে তুলেছে। শেষের দিকে কয়েকটি সুন্দর রূপকাত্মক চিত্র এবং মানবত্ব আরোপের সাহায্যে শরতের দৃশ্যবৈচিত্র্য অপূর্বতা লাভ করেছে। কবিত্ব এবং সংযমের সংমিশ্রণে তারা সমুজ্জ্বল,—

'যেমন অনুরাগনী কোন নায়িকা নায়কের সুন্দর করস্পর্শে হর্ষিত হইয়া নয়নতারা ঈষৎ নিমীলিত করতঃ স্বয়ংই বসনগ্রন্থি বিমোচন

করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই লোহিতবর্ণা সন্ধ্যা সুন্দর চন্দ্রকিরণস্পর্শে হর্ষিত হইয়া নয়নতারা রূপ তারকাসমস্ত ঈষৎ প্রকাশিত করিয়া স্বয়ং অম্বরতল পরিত্যাগ করিতেছে… ।'

'প্রাতঃকালীন কান্তোপভোগে অলসগামিনী কামিনীগণের মন্থর গতির ন্যায় সমীপে লক্ষিত মীনরূপ মেখলাধারিণী নদী সকলের অত্য মন্দগতি হইয়াছে এবং সমস্ত নদীমুখ চক্রবাক, শৈবল ও কাশদ্বারা পরিবৃত হওয়াতে গোরচনাচর্চিত, পত্রলেখার দ্বারা চিত্রিত, দুকূলসংবৃত বধূমুখের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।'

'শরৎ সময়ে সরিৎ সকল নবসঙ্গমলজ্জিতা যোষিৎগণের জঘন দেশের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পুলিন সমস্ত প্রদর্শন করিতেছে।'

উপমা হিসেবে এদের যে গভীরত্ব আছে কালিদাসের কাব্যে তারই পরিণতি। সংযমের অভাবে এই বর্ণনাগুলি নির্লজ্জ অশ্লীলতায় পরিণত হয়ে যেত।

রামায়ণ আলোচনার পর মহাভারতের নিসর্গপ্রীতিতে কোনো বৈশিষ্ট্যের সন্ধান লাভ করা কঠিন। মহাভারতেও কয়েকটি স্থানে সহানুভূতিশীল নিসর্গ বর্ণনা আছে। দময়ন্তীব গিরিরাজের নিকট বিলাপ এবং স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা তাদের মধ্যে একটি ; রামায়ণের অনুরূপ বর্ণনা থেকে মহাভারতের কবির বর্ণনার হীনতা স্বীকার করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডবদিগের সাহায্যে যাবার সময় সমস্ত প্রকৃতি মঙ্গলসূচক ইঙ্গিতে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিল।

'আকাশ মেঘশূণ্য হইল! শুভসূচক অনুকূল বায়ু বহণ করিতে লাগিল, ধূলি সমস্ত উপশান্ত হইয়া পড়িল।…সারস, শতপত্র ও হংস সমস্ত মঙ্গলাবহ ধ্বনি করিতে করিতে সর্ব দিকেই তাহার অনুবর্তন করিতে থাকিল।'

মহাভারতের রূপকাত্মক নিসর্গ চিত্রগুলি প্রাচুর্যে রামায়ণের নিকট হীন সন্দেহ নেই, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাহাদের মূল্য বড়ো কম নয়। কবিত্ব এবং অন্তর্দৃষ্টির যথেষ্ট পরিচয় বর্ণনাগুলির ছত্রে ছত্রে ধরা পড়ছে।

'যেমন মেঘ অতিশয় বর্ষণ করিলে গৈরিক ধাতুবিশিষ্ট ভূধর হইতে

শোণিত বর্ণ নিঝর সকল পতিত হয়, সেইরূপ তাহার ক্ষতস্থান হইতে উৎকট শোণিতধারা নির্গত হইতেছে।'

এই উপমাটি যুদ্ধমান কুম্ভকর্ণের প্রতি রামায়ণেও একবার প্রযুক্ত হয়েছিল কিন্তু বর্ণনা বিস্তারে মহাভারতের উপমাটি শ্রেষ্ঠ।

'ইহার ভ্রূযুগলের মধ্যে যে স্বাভাবিক জটুল আছে, তাহা মলাচ্ছাদিত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় অপ্রকাশিত থাকাতেও আমি তাহা লক্ষ্য করিয়াছি।'

'বেগশালী হংসকুল যেমন মানস সরোবর হইতে আসিয়া গঙ্গাকে সমাকুলিতা করে, সেইরূপ পাঞ্চালগণ দুর্যোধনের ঐ মহতী সেনাকে সর্বতোভাবে ব্যাকুলিতা করিয়াছে।'

এই উপমাগুলি রসসৃষ্টিতে সার্থক। নারী-সৌন্দর্যকে প্রকৃতির নানা বস্তুর সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা^ণ মহাভারতে অনেক আছে—কমললোচনা, পূর্ণচন্দ্রসদৃশী, চারুপদ্মবিশালনয়না ইত্যাদি বিশেষণ সেই চেষ্টা-প্রসূত। একস্থানে উপমাগুচ্ছ (succession of similities) বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপমানের সহিত একই উপমেয়ের তুলনার দৃষ্টান্তও আছে। স্বামী পরিত্যক্তা দময়ন্তীকে মলপঙ্ক অনুলিপ্ত মৃণাল, রাহু গ্রাস পতিত পৌর্ণমাসীর চন্দ্র, শুষ্কশ্রোতা নদী, করিকুলপরিমর্দিত শ্রীহীন পদ্ম সরোবর, অর্ককিরণদগ্ধ মৃণাল এবং নীলজলদাবৃত শশীলেখার সহিত তুলনা করা হয়েছে।

মহাভারতেও অনেক নদী পর্বত এবং অরণ্যের বর্ণনা আছে কিন্তু বর্ণনাগুলি মোটামুটি গতানুগতিক ও বিশেষত্ব বর্জিত। মহাভারতের নদীর তীর, ময়ুর, পুংস্কোকিল ও বককুলের কলঘোষে মুখরিত, পর্বত ধাতুবর্ণ বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল এবং অরণ্য নানাপ্রকার বৃক্ষ ও পক্ষীর তালিকায় সমাকীর্ণ। সমুদ্রের একটি বর্ণনা গতানুগতিকতার সীমা লঙ্ঘন করে কবিত্বের রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

'সরিৎপতি পবনদ্বারা তরঙ্গ সহকারে ভীষণ নিস্বন করিতে করিতে যেন নৃত্য করিতেছে, প্রবাহিত ফেন সমূহ দ্বারা যেন হাস্য করিতেছে।'

বর্ষা এবং শরতের দুটি বর্ণনা মহাভারতে স্থান লাভ করেছে। বর্ষার বর্ণনাটি সংবাদবাহী এবং ব্যবহারিকতার মৃদু গন্ধে পূর্ণ।

'ধরণীতে অকপ্রভাজাল তিরোহিত হইল; সৌদমিনীর বিমলদ্যুতি বিদ্যোতিত হইতে লাগিল, শস্যাঙ্কুর সকল সমারূঢ় হইল; দংশ ও সরীসৃপের প্রাদুর্ভাব হইল, ভূমণ্ডল সলিলসিক্ত, শান্ত ও সর্বপ্রাণীর মনোরম হইয়া উঠিল ;···

শরৎ বর্ণনাটি অবশ্য সরল কবিত্বের ক্ষীণ স্পর্শলাভ করেছে কিন্তু মোটের উপর কোনো বিশেষত্ব বর্জিত এবং কবিত্ব সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু মহাভারতের কবি নূতনত্ব দেখিয়েছেন দুটি ঝড়ের বর্ণনায়। প্রথমটি পাণ্ডবদের গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হবার সময়, দ্বিতীয়টি ভীমের পদ্ম সংগ্রহের সময়। বর্ণনাগুলির মধ্যে বাস্তবচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা লক্ষ্যণীয়।

'সহসা ধূলি ও পত্রপুঞ্জ সমুদ্ধত হইয়া পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ; রেণুদ্বারা নভোমণ্ডল আবৃত হওয়াতে দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল, ··বৃক্ষ সকল পবন বেগে ভগ্ন হইয়া নিরন্তর পতিত হইতে লাগিল, · কিয়ৎকালান্তর পবন মন্দীভূত ও ধূলি সমুদ্ধতি উপশান্ত হইলে সাতিশয় স্থূলধারায় জল বর্ষণ হইতে লাগিল। নিক্ষিপ্যমান বজ্রসংঘাতের সাতিশয় চটচটা শব্দে কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মেঘমণ্ডলীতে চঞ্চলপ্রভা চপলা সঞ্চলন করিতে লাগিল। দ্রুতগতি বাতবেগে সমীম্বিত জলধারা সকল করকাসমূহ সহকারে চতুর্দিক সমাবৃত করত নিরন্তর প্রপতিত হইতে লাগিল। পর্বতোপরি সেই বর্ষার জল চতুর্দিকে বিকীর্যমান হইয়া আবিলা ও ফেনবতী বহু নদীরূপে প্রাদুর্ভূত হইল।'

ঝড়ের বর্ণনায় যদিও প্রকৃতির রুদ্ররূপের আরও প্রাধান্য থাকা উচিত ছিল কিন্তু সে প্রাধান্য বর্জিত হওয়া সত্ত্বেও বর্ণনাটি কবিত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। মহাভারতের একস্থানে কবি একটি অতিশয়োক্তিকে কাবিত্বপূর্ণ নিসর্গপ্রীতিতে রূপায়িত করে তুলেছেন।

'প্রাসাদস্থিত শিখিগণ ও শীলাস্থিত হস্তী ও হরগণ···মেঘ

নিনাদের ন্যায় সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া উৎসুকচিত্তে তন্ময় হইয়া শব্দ করিতে লাগিল।'

কবিত্বের স্রোতে এই বর্ণনার অতিশয়োক্তি যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিসর্গপ্রতির পরিচয় কালিদাসের কাব্যে। শুধু তাই নয় সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যেও কালিদাসের সমতুল্য কবি খুব বেশি নেই। বিশেষ করে, প্রকৃতি চিত্র অঙ্কনে কালিদাস বহুতর নূতনত্বের সুচনা করেছিলেন। তাঁকে একজন কবি বলে উল্লেখ করাও ভুল। তিনি একটি যুগ। তাঁর সমস্ত কাব্যগুলি থেকে কালিদাসের যুগটি একটি বিশিষ্ট মূর্তি নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়।' সে-কালের নদী-পর্বত-বৃক্ষ-পুষ্পলতা, সেদিনের বর্ষা-বসন্ত আমাদের চোখে সজীব হয়ে ওঠে। শুধু একজন কবির কাব্যকে অবলম্বন করে একটি যুগের এমনি সম্পূর্ণ চিত্র কালিদাসের পরে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ উপস্থাপন করতে পারেন নি। অন্য দেশের সাহিত্যেও অনুরূপ উদাহরণ খুবই বিরল। রবীন্দ্রনাথের "প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের" "মেঘদূত" প্রবন্ধে সে-যুগটির একটি সুন্দর আছে। কিন্তু "হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল" এই বেদনাও সে-বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।—

"রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ একখণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবন স্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সেখান হইতে, কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরাও নির্বাসিত হইয়াছি। সেই যেখানকার উপবনে কেতকীর বেড়া ছিল, এবং বর্ষার প্রাক্কালে, গ্রামচৈত্যে গৃহবলিভুক্ পাখিরা নীড় আরম্ভ করিতে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং গ্রামের প্রান্তে, জম্বুবনে ফল পাকিয়া মেঘের মতো কালো হইয়াছিল, সেই দশার্ণ কোথায় গেল? আর সেই-যে অবন্তীতে গ্রাম বৃদ্ধেরা উদয়ন এবং বাসবদত্তার গল্প বলিত তাহারাই বা কোথায়? আর সেই সিপ্রাতট-বর্তিনী উজ্জয়িনী।...আমরা কেবল সেই-যে হর্ম্যবাতায়ন হইতে পুর-

বধূদিগের কেশসংস্কারধূপ উড়িয়া আসিতেছিল তাহারাই একটু গন্ধ পাইতেছি এবং অন্ধকার রাত্রে যখন ভবনশিখরের উপর পারাবতগুলি ঘুমাইয়া থাকিত তখন বিশাল জনপূর্ণ নগরীর পরিত্যক্ত পথ এবং প্রকাণ্ড সুষুপ্তি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছি, এবং সেই রুদ্ধদ্বার সুপ্তসৌধ রাধানীর নির্জন পথের অন্ধকার দিয়া কম্পিত চরণে ব্যাকুল চরণক্ষেপে যে অভিসারিণী চলিয়াছে তাহারই একটুখানি ছায়ার মতো দেখিতেছি, এবং ইচ্ছা করিতেছে তাহার পায়ের কাছে নিক্কনে কনকরেখার মতো যদি অমনি একটুখানি আলো করিতে পারা যায়।"

কালিদাসের যুগে কবির এই মানস ভ্রমণ শুধু চিন্তাতেই আবদ্ধ থাকেনি। নিজের যুগ যেমন রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র বর্ণসম্ভারে, কোথাও বা আভাসে ইঙ্গিতে চিরকালীন করে তুলেছেন, কালিদাসের যুগকেও নূতন করে সৃষ্টি করেছেন। সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

কালিদাস প্রধানত সৌন্দর্যের কবি। সৃষ্টির সমস্ত সুন্দর উপাদান—চন্দ্র সূর্য, তরুলতা, ফুলফল তাহাদের রূপের সকল সুষমা, সকল রঙীন বৈচিত্র্য নিয়ে কালিদাসের অনুভূতির মধ্যে যেন নিবিড়ভাবে মিশে আছে। তাই তাঁর কাব্যে নিসর্গপ্রীতির একটা স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি। কালিদাসের প্রকৃতিপ্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁহার রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রে। প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত নানাপ্রকার উপমার সাহায্যে কালিদাস তাঁর কাব্যগুলিতে অপরূপ সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। কেবলমাত্র উপমান এবং উপমেয়ের আপাত সাদৃশ্য দেখিয়েই তাঁর উপমাগুলির ব্যঞ্জনা সমাপ্ত হয়ে যায়নি, কালিদাসের কবিমনে প্রকৃতির প্রতি যতো বৈচিত্র্যময় প্রীতি জেগে উঠেছিল তার প্রত্যেকটিই মূর্তি পরিগ্রহ করে এই উপমাগুলিকে সার্থক করেছে। কালিদাসের কবিপ্রতিভার বাতায়ন এই উপমাগুলির

* কালিদাসের কাব্য আলোচনায়, বিশেষ করে কালিদাসের উপমাগুলির বিশ্লেষণে অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'উপমা কালিদাসস্য' গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি। যেখানে এই সাহায্য আক্ষরিক উদ্ধৃতিতে পরিণত হয়েছে, সেখানে উদ্ধৃতি চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

গবাক্ষ-পথে আমরা কালিদাসের কবিমনের উন্মুক্ত বর্ণগন্ধময় পুষ্পক্ষেত্রে এবং তাঁর কল্পনার সীমাহীন আকাশে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারি।

উপমার সাহায্যে কবিমনের প্রেরণার প্রকাশ করা একপ্রকার অলংকার। অলংকারকে অনেকে কটক-কুণ্ডলাদির মতো কাব্যে আরোপিত একটি গুণ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অলংকার কাব্যের স্বাভাবিক ধর্ম। অলংকারের সুষ্ঠু এবং সংযত প্রয়োগ কাব্যাংশ রূপেই প্রতিভাত হয়, কাব্যের দেহ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কালিদাসের উপমাগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উপমার চমৎকারিত্ব কালিদাসের আয়াসলভ্য নয়—তাঁর স্বাভাবিক বাচনভঙ্গি। কয়েকটি উপমা নিয়ে আলোচনা করলে বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট হবে।

'মেঘদূত' কাব্যে বিরহী যক্ষ মেঘকে আহ্বান করে বলেছেন,

'তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেক পত্নী—
মধ্যাপন্নামবিহত গতিদ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম।
আশবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রযোগে রুণদ্ধি॥'

—হে মেঘ, অবাধ গতিতে চলে অলকায় গিয়ে নিশ্চয়ই তোমার ভ্রাতৃবধূকে দেখতে পাবে। বিরহ শেষের দিনটির দিকে তাকিয়ে সে এখন পর্যন্ত জীবন ধারণ করে আছে। তার হৃদয়বৃন্ত মিলন দিনের আশাপুষ্পটিকে ঝরে পড়তে দিতে চায় না।—

বিরহী-হৃদয়ের আশা হয়তো বা দুরাশার সঙ্গে পতনোন্মুখ পুষ্পের এই যে তুলনা, তা অন্য কোনো প্রকাশ করা যেতনা।

'কুমারসম্ভব' কাব্যে মদনের বাণে ধ্যানমগ্ন শিবের ধ্যানভগ্ন হৃদয়ে ঈষৎ চঞ্চলতা দেখা দিয়েছিল। কবির ভাষায় তার প্রকাশ,—

'হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য
শচন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥'

উমার বিম্বফলতুল্য অধরের দিকে শংকরের প্রথম দৃষ্টিপাতকে এর চেয়ে সুন্দর করে বলা যেত না। চন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভে ঈষৎ চঞ্চল সমুদ্র-বক্ষকে শংকরের চিত্তবিক্ষোভেব সঙ্গে তুলনা করায় কটককুণ্ডলের মতো কোনো বাহ্যিক আভরণের দ্যুতি প্রকাশিত হয়নি। পাঠকমনে একটি স্বাভাবিক চিত্রের উজ্জ্বলতর রূপ এঁকে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে গভার ব্যবহারিক জ্ঞান ও কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়েও এই উপমাটি মধুর। 'রঘুবংশ'এর সপ্তমসর্গে ইন্দুমতী রাজকুমার অজের গলায় মালা দিয়েছেন, ঈর্ষা প্রণোদিত অন্যান্য রাজন্যবর্গ অজকে আক্রমণ কবেছেন। অজ পৌরুষবীর্যে সকলকে পরাজিত করে ফিবে এসেছেন। নবলব্ধ প্রিয়তমেব গর্বে গর্বিতা ইন্দুমতী তাহার মনের হৃষ্টতাকে কুমারী-সুলভ সংকোচে প্রকাশ করতে দ্বিধা করছেন। সখীগণের উচ্চারিত বাক্যদ্বারা তিনি রাজকুমারকে অভিনন্দন জানালেন,

'বাগভিঃ সখীনাং প্রিয়মভ্যনন্দৎ ॥'

কিন্তু কুমারী হৃদয়ের গর্ব মিশ্রিত প্রথম হষকে লজ্জা সংকোচের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করায় যে ভাষাতীত মাধুর্য আছে তা তো এতে সম্পূর্ণ হয়ে উঠল না। তাই কালিদাস একটি প্রকৃতিচিত্রের সাহায্য গ্রহণ করলেন।

'স্থলী নবাম্ভঃপৃষতাভিবৃষ্টা
ময়ুর কেকাভিরিবাভ্রবৃন্দম ॥'

নব বারিধারাপাতেসিক্ত বনভূমি নিজে যেমন মেঘপ্রিয়কে তাহার সাদর আহ্বান পাঠাতে পারেনা, ময়ুরের কেকাধ্বনির মধ্যস্থতায় সে তার প্রথম প্রেমের সলজ্জ অভিনন্দন জানিয়ে দেয়। এই উপমাটি কাব্যের অলংকার স্বরূপ হয়ে কাব্যের ভূষণ বৃদ্ধি করেনি—এর মধ্যদিয়ে কাব্যের রসবস্তুই প্রাণলাভ করছে। কালিদাসের উপমাগুলির আবও একটা প্রধানগুণ তাদের "স্থিতিস্থাপকতা"। উপমেয়ের সহিত প্রকৃতি চিত্রগুলির সাদৃশ্য এবং আপাত মাধুর্যের অন্তরালে রহস্যময় গভীরতার আভাস নিরন্তর তাকে বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করতে থাকে। অধিকতর সন্ধানী দৃষ্টিকে সে প্রতারিত করে না—জিজ্ঞাসু

হৃদয়ের সামনে তার মণিভাণ্ডারের আরও অনেক সম্পদ্ আত্মপ্রকাশ করে। উপমাগুলির আনাচে কানাচে অর্থ ভরে দিয়ে নিপুণভাবে তাকে সমন্বিত করে দেবার ক্ষেত্রে কালিদাসের প্রতিভা স্বাভাবিক অথচ অসাধারণ। মহাদেবের বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে চন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভে ঈষৎ বিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষের সঙ্গে তুলনা করায় কালিদাসের উপমার স্থিতি-স্থাপকতার সন্ধান পাওয়া যাবে। সমুদ্রের সঙ্গে মহাদেবের চিত্তের তুলনার মধ্যে অনেক কথা অকথিত রয়ে গিয়েছে। মহাদেবের চরিত্র এমনই বিরাট্ যে সমুদ্রবক্ষের মতো তা যেমন ঈষৎ উদ্বেলও হতে পারে, আবার সমুদ্রের মতোই ভীষণ রুদ্রমূর্তিও ধারণ করতে পারে। মহাদেবের বিক্ষুব্ধ চিত্তের সেই সমুদ্রসম প্রচণ্ডাঘাতেও মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি ত্রস্ত হয়ে উঠবে এই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে পশ্চাতে রেখেই মহাদেবের চিত্তের ঈষৎ উদ্বেলতা এতখানি সার্থক হয়ে উঠেছে।

'রঘুবংশে' গর্ভিনী নারী সুদক্ষিণার প্রাকৃতিক উপমা,

'শরীর সাদাদসমগ্রভূষণা
মুখেন সালক্ষ্যতে লোধ্রপাণ্ডুনা।
তনু প্রকাশেন বিচেয় তারকা
প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্বরী ॥'

কিঞ্চিৎ কৃশা রাণী আব সমস্ত অলংকার দেহে ধারণ করতে পারছেন না। তাঁর মুখ লোধ্রকুসুমের ন্যায় পাণ্ডুর। মনে হচ্ছে যেন ক্ষীণ-চন্দ্রসহ তারকা-লীন প্রভাতকল্পা রাত্রিরূপিনী এই রাণী।—"উপমাটির প্রত্যেক পদ সার্থক। প্রথমতঃ রাণী সুদক্ষিণা এমন একটি পুত্র প্রসব করিতে যাইতেছেন, যাহার নামে একটি রাজবংশ চিরকালের জন্য পরিচিত হইয়া থাকিবে ; সেই গর্ভিণী মাতা যেন প্রভাতকল্পা শর্বরী। সূর্যরূপ পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া আসন্ন প্রসবা বিরাট রজনীর যে মহিমাময় মূর্ত্তি, সুদক্ষিণার মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই আসন্ন মাতৃত্বের গৌরব···। সেই আসন্ন প্রসবা সুদক্ষিণা যখন তাঁহার বিবিধ হীরকখচিত অলংকাররাশি ত্যাগ করিয়াছেন, তখন মনে হইল যেন প্রভাতকম্পা শর্বরীর দেহ হইতে তাহার অসংখ্য নক্ষত্রের অলংকার

খসিয়া পড়িয়াছে ; আর সুদক্ষিণার লোধ্রপাণ্ডুর মুখখানি যেন ঈষৎ দীপ্ত শেষ রজনীর চন্দ্রমা।" সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আপাতমধুর এই চিত্রটি আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। অনুরূপ স্থিতিস্থাপক উপমার সন্ধান কালিদাসের কাব্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। এগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে এক্ষেত্রে কালিদাসের যে স্বকীয় গৌরব আছে, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই নিজস্ব বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল উপমাগুলির সঙ্গে তুলনা করবার মতো উপমা ভারতবর্ষের কোনো কবির কাব্যে নেই এজন্য 'উপমা কালিদাসস্য' ভারতীয় সাহিত্যে একটি প্রবাদের মতো। কালিদাসের উপমাগুলির সমগ্র রস উপলব্ধি ব্যাখ্যার সাহায্যে সম্ভব নয়। তাঁর বিভিন্ন কাব্যের উপমাগুলি মন্থন করে প্রকৃতি যে সব উপাদানের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায় তাদের পরিচয় দেওয়াও প্রায় দুঃসাধ্য। ফুলের মধ্যে কালিদাসেব প্রিয় —লোধ্র, বাঁধুলী, শিরীষ, অশোক কেতকী প্রভৃতি ; নারীর রূপ বর্ণনায় কিংবা কোন উপমা সংস্থানের জন্য এই ফুলগুলিব নাম তিনি বহুবার ব্যবহার করেছেন। চন্দ্র ও কুমুদ এবং সূর্য ও পদ্মের কবিকল্পিত সম্পর্ক কালিদাসের উপমায় শতাধিক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। চন্দ্র দর্শনে সমুদ্রের উদ্‌বেলতাব একটি চিত্র আলোচিত হয়েছে ; এই চিত্রটির সমগোত্রীয় আরও অনেক চিত্রের সন্ধান কালিদাসের কাব্যে আছে। চক্রবাক-চক্রবাকীর যুগল প্রেম এবং সহকার তরুর প্রতি লতিকার একান্ত নির্ভর তাঁহার কাব্যকে অবলম্বন করেই অমরত্ব লাভ করেছে। নদীবক্ষে সফরীর উল্লাস এবং মদমত্তকরীর মত্ততার পরিচয়ও কালিদাসের কাব্যে আছে অগণিত স্থানে। কালিদাসের প্রিয় নদী শিপ্রা, মানসী-কন্যার মত নানারূপে সাজিয়ে কবি তাকে পাঠকের চোখে স্বপ্নময়ী করে তুলেছেন। উৎক্রোশের চীৎকারের সঙ্গে নারীর ক্রন্দনের তুলনা কালিদাসের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শরৎ সমাগমে গঙ্গাপুলিনে হংসমালার আগমন এবং শরৎ শেষে প্রত্যাবর্তনকেও কবি চিরকালীন মাধুর্য দিয়েছেন। পরস্পর সংলগ্ন দিবা যামিনীর পৃথিবী প্রদক্ষিণ এবং নবদম্পতীর অগ্নিশিখাকে

প্রদক্ষিণ, এই দুইএর মধ্যে একটি সুন্দর সাদৃশ কবির চোখে ধরা পড়েছিল। শিব ও পার্বতী এবং অজ ও ইন্দুমতী, উভয় দম্পতীর বিবাহের বর্ণনায় তাই এ চিত্রটি পুনরুক্ত হয়েছে। নয়নকে পদ্ম এবং নয়নতারাকে ভ্রমররূপে কল্পনা করে কবিত্বপূর্ণ উপমার অবতারণা কালিদাসের কাব্যে অজস্র। নয়নকে কুসুম এবং নয়নতারা অথবা কুটিল দৃষ্টিকে ভ্রমরের সাদৃশ্য দানের পরিচয় নিম্ন লিখিত দুটি উপমা হয়ে উঠেছে। মেঘদূত কাব্যে মেঘেব নিকট বিরহীযক্ষের যাত্রাপথেব বিবরণ,—

'তামুত্তীর্যবজ্র পরিচিত ভ্রূলতা-বিভ্রমাণাম্
পক্ষেণাৎ ক্ষেপাদুপরি বিলসৎ কৃষ্ণ-সার-প্রভাণাম্ ॥
কুন্দক্ষেপানুগমধুকব—শ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্বন দশপুর বধূ-নে॰-কৌতূহলানাম্ ॥'

—তারপর সোজা উত্তর দিকে চলে যাবে—তোমাব পথে পড়বে দশপুর নগর। সে নগরের বধূগণ সাগ্রহ নয়নে তোমার কান্তি নিরীক্ষণ করবে। তাদেব নৃত্যপবা নয়নদলের অন্তরাল থেকে নয়নের শুভ্রজ্যোতি দৃষ্টিগোচর হবে—তার পশ্চাতে কালো তারাগুলি। মনে হবে যেন একরাশ সাদা কুন্দকুসুমেব পশ্চাতে একঝাঁক কালো ভ্রমব। তুমি তাদের চোখের সামনে তোমার মূর্তিখানা একবার তুলে ধরবে।—মেঘদূতেই আবার,

'পদানাসৈঃ ধণিতবশনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ
রত্নচ্ছায়া খচিত ধলিভিশ্চামবৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্তত্তো খগপদ-সুখান প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দুনা
মোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকর শ্রেণী-দীর্ঘান কটাক্ষান ॥'

—সেই মন্দিরে সন্ধ্যাকালে সজ্জিতা নৃত্যপরা দেবদাসীরা তাদের রত্নখচিত হাতে চামর ব্যজন করে। বিলাসিনীদের প্রিয় নখ-বিক্ষত মৃণালের মতো কোমল হাতে চামর ব্যজনের পরিশ্রমে অলস শিথিল হয়ে আসে। তুমি যদি তাহাদের ক্ষতহস্ত দুফোঁটা জলসিঞ্চনে শীতল করে দাও তবে তারা কটাক্ষে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে—তাদের

শ্রোণীদীর্ঘ বঙ্কিম নয়নের দৃষ্টিভ্রমর মুহুর্মুহু সার বেঁধে তোমার দিকে ছুটে আসবে।—শুধু উপমায় নয় বর্ণনার সূক্ষ্ম বৈশদ্য এবং কল্পনার অবাধ সঞ্চরণে এ অংশটি মনোরম।

প্রধানত মাধুর্যের কবি বলেই হয়তো কালিদাসের কাব্যে রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রের সাহায্যে ভীষণ ব্যক্তি বা বস্তুর রূপ দেওয়ার চেষ্টা বেশি নেই। যদিও বা থাকে সেগুলি ভীষণতার সৌন্দর্যযুক্ত হতে পারেনি। মেঘদূতে কুরুক্ষেত্র বর্ণনার পর, মেঘের প্রতি বিরহীযক্ষের উক্তি,—

'রাজন্যানাং শির-শরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারা পাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন মুখানি।'

—তুমি যেমন ফুটন্ত পদ্মদলকে অজস্র ধারাপাতে ছিন্ন কর, গাণ্ডীবধারী অর্জুনও ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের মুখের উপর অজস্র শর বর্ষণ করেছিলেন।—যুদ্ধের ভীষণতা এই প্রকৃতি চিত্রের সঙ্গে তুলনায় কোমল হয়ে উঠেছে। রঘুবংশেও রঘুর হস্তে নিহত যবনসেনাদের দীর্ঘশ্মশ্রু বিশিষ্ট রক্তাক্ত মস্তকরাশির তুলনা কবি খুঁজে পেয়েছেন মধুমক্ষিকা ব্যাপ্ত মধুচক্রসমূহে। 'রঘুবংশে'ই তাড়কাবধ দৃশ্যে,

'জ্যানিনাদমথ গৃহ্নতী-তয়োঃ প্রাদুরাস বহুল-ক্ষপাছবিঃ।
তাড়কাচল-কপালকুণ্ডলী কালিকের নিবিড়াবলাকিনী॥"

—তাঁদের জ্যা-শব্দে রাক্ষসী তাড়কা এসে উপস্থিত হল। তার বর্ণ অমানিশাকৃষ্ণ, কর্ণে নরকপালের কুণ্ডল, মনে হল যেন বলাকাযুক্ত একখণ্ড নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ নাচতে নাচতে এসে দৃশ্যমান হল। অমানিশার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং নর কপালের কুণ্ডল শুনে আমাদের মনে যে ভীষণতার ছবি আঁকা হয়েছিল বলাকাযুক্ত কৃষ্ণমেঘের সঙ্গে তুলনায় সে ভীষণতার ছায়া দূর হয়ে যায়—কোমল কবিত্বের স্পর্শে ভীষণতা কমনীয় হয়ে আসে।

নারীসৌন্দর্য বর্ণনার রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রের ব্যবহার কালিদাসের আর একটি বিশেষত্ব। এক্ষেত্রেও কালিদাসের কাব্যে গভীর কবিত্বশক্তি এবং প্রকৃতিপ্রেমের চরম প্রকাশের পরিচয় আছে। বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে নারীর রূপকে তুলনা করে তিনি নারীর মাধুর্য,

কমনীয়তা এবং সমগ্রতাকে অপূর্ব সূক্ষ্মতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 'কুমারসম্ভবে' উমা আর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'য় শকুন্তলা সুকুমার সৌন্দর্যের প্রতীকস্বরূপিনী,—সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে প্রকৃতি থেকে তিল তিল সৌন্দর্য-আহরণ করে কবি তাঁর এই দুটি মানসী তিলোত্তমাকে সাজিয়েছেন।

'কুমার সম্ভবে' উমার চরণ-যুগলের রূপ,

'অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠ নখ-প্রভাভি
র্নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্গির স্তৌ।
আজহ্রতু চ্চরণৌ পৃথিব্যাং
স্থলারবিন্দ-শ্রিয়মব্যবস্থাম॥'

—উমার চরণযুগল পৃথিবীতলে বিন্যস্ত হলে তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুটির নখকান্তির ভিতর দিয়ে যেন একটি আরক্তিম প্রভা বিচ্ছুরিত হত, মনে হত যেন পৃথিবীতে সঞ্চরমান দুটি স্থলপদ্ম।

রাজহংসের গমনের মধ্যে নারীর পদপ্রক্ষেপের তুলনা কালিদাসের কাব্যে অজস্র। উমাও মরালগামিনী। তার বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গিতে যৌবন উন্মেষের উল্লাস,—

'বাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী।'

উমা যেদিন মহাদেবের তপোভঙ্গ করতে যাত্রা করলেন, বসন্তের পুষ্পাভরণ বহন করে, তাহার সেদিনের রূপটী অপূর্ব,

'আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম।
পর্যাপ্ত পুষ্প স্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥

—তরুণ অরুণের মত রক্তবস্ত্র পরিহিতা উমা স্তনভারে ঈষৎ অবনমিতা হয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, যেন পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকে অবনম্র একটি সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতা। উমার রক্তবস্ত্রে প্রথম অরুণরাগের আরক্তিম আভা, স্তনদ্বয়ে পুষ্পস্তবকের মাধুরী এবং সর্বোপরি উমার গতিভঙ্গি সঞ্চারিনী লতার ন্যায়।—এই সমস্ত প্রাকৃতিক

উপাদানগুলি মিলিয়ে উমার রূপ কাব্যময় হয়ে উঠেছে—এ সৌন্দর্য সৃষ্টির তুলনা অন্য কোনো কাব্যে বড়ো বেশি নেই। 'শকুন্তলা' নাটকেও সখীদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কবি শকুন্তলার লতিকাসুলভ কমনীয়তার প্রতি বহুবার ইঙ্গিত করেছেন। শকুন্তলাও প্রকৃতি থেকে আহৃত সৌন্দর্যের উপাদানে রূপময়ী,

'অধরঃ কিশলয় রাগঃ
কোমল বিটপানুকারি নৌ বাহু।
কুসুমিব লোভনীয়ং
যৌবনমঙ্গেষু সন্নর্ধম ॥'

—অধরে কিশলয়রাগ, বাহুদ্বয় কোমল বিপট, আর অঙ্গে অঙ্গে বাঁধা পড়েছে কুসুমের ন্যায় লোভনীয় যৌবন।—রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে" দেবতার বরে সৌন্দর্যময়ী হবার পর তাঁর কণ্ঠে যে গানটি স্থাপিত হয়েছে, তাতে আছে,

"আমার অঙ্গে অঙ্গে কে
বাজায় বাঁশি …
পুষ্প বিকাশের সুরে,
দেহ-মন উঠে পুরে।
কি মাধুরীর সুগন্ধ
বাতাসে যায় ভাসি ॥"

দৈহিক মাধুরীকে সুরের বা গন্ধের উপমায় তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পূর্ববর্তী সকল কবিকেই পশ্চাতে ফেলে এসেছেন। কুসুমের সঙ্গে তুলনায় নারী সৌন্দর্যের কমনীয়তা, পবিত্রতা এবং মাধুর্যের প্রতি কালিদাসও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। কুসুমের আর নারী সৌন্দর্যের তুলনা কালিদাসের কাব্যের অগণিত স্থানে আছে। শকুন্তলার রূপবর্ণনায় কবি একস্থলে নবমল্লিকা বা নবমালিকার উল্লেখও করেছেন। নারীসৌন্দর্য আভরণের অপেক্ষা রাখে না, নিরাভরণভাবে অঙ্গবর্হিভূত বস্তুর সংস্পর্শে এসেও তার উজ্জ্বলতা ম্লান হয় না। শকুন্তলা এবং উমা উভয়ের সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে কবি রূকাত্মক প্রকৃতি চিত্রের অবতারণা করেছেন—দুটি বর্ণনায়ই নারী-

সৌন্দর্যকে পুষ্পরূপী করে দেখানো হয়েছে। কুমারসম্ভব কাব্যে তপস্বিনী উমার রূপ,

'যথা প্রসিদ্ধৈর্মধুরং শিরোরুহৈ
জটাভিরপ্যেবম ভূত্তাদাননম্।
নষ্ট পদশ্রেণিভিরেব পঙ্কজং
সশৈবলাসঙ্গমপি প্রকাশতে ॥'

—উমার আনন জটাতেও কেশদামে শোভিতের ন্যায়ই শোভা পাচ্ছিল—কমলের সৌন্দর্য শুধু ভ্রমরের সংস্পর্শেই ফোটে না, শৈবালের সহযোগেও কমল সুন্দর।—'শকুন্তলা' নাটকেও দুষ্মন্তের উক্তিতে শকুন্তলার রূপবর্ণনায় একটি সমধর্মী চিত্রের প্রয়োগ করা হয়েছে।

'সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম ॥'

—শৈবাল আচ্ছাদিত পদ্মও সুন্দর, কলঙ্কচিহ্নধারী পূর্ণচন্দ্রও শোভমান। কিন্তু বল্কলে আবৃত শকুন্তলার দেহ যেন অধিকতর সুন্দর হয়ে উঠেছে।

কুমারী হৃদয়ের লজ্জা ও সংকোচ এবং নারীর প্রথম প্রিয়-সম্ভাষণের আড়ষ্টতার মধ্যে একটি ভাষাতীত মাধুর্য আছে। তা কালিদাসের কবিমনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। স্বয়ম্বর সভায় অজকে নির্বাচন করেও রাজ কুমারী ইন্দুমতী তাঁর গলায় বরমাল্যটি তুলে দিতে পারছিলেন না। তখন পরিচারিকা এসে তার হাত ধরে মালাটি অজের গলায় পরিয়ে দিল। শকুন্তলা এবং উর্বশী প্রথম দর্শনের পর প্রিয়তমের থেকে চলে যাবাব সময় বৃক্ষশাখায় আবরণ জড়িত করে খুলবার ছলে বঙ্কিম-নয়নে দয়িতের প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করে গিয়েছিলেন। এই বর্ণনাগুলির মধ্যে নারী হৃদয়ের মাধুর্যময় সংকোচটি সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। এই লজ্জা এবং সংকোচকে কালিদাস উপযুক্ত রূপাত্মক প্রকৃতি চিত্রের সাদৃশ্যে প্রকাশ

করেছেন। 'রঘুবংশে'র বর্ণিত একটি চিত্রের আলোচনা আগেই করা হয়েছে। 'কুমার সম্ভব'এও মহাদেব যখন ছদ্মবেশে পার্ব্বতীকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করিবার জন্য শিবনিন্দা করছেন, তখন পার্বতী ক্রোধভরে সেখান থেকে চলে যাবার সময় গতিবেগে তাঁহার বক্ষের বল্কলাচ্ছাদন খসে পড়ল। মহাদেব তখন সহাস্যে নিজমূর্তি ধারণ করে উমাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করলেন,

'তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি
নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃত মুদ্বহন্তী।
মার্গাচল-ব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিবাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥'

—মহাদেবকে দেখে ঘর্মাক্ত কম্পমানা পার্বতী চরণ ঊর্ধ্বে তুলেও যেতে পারলেন না, থাকতেও সংকোচ হল। তিনি পথিমধ্যে পর্বত প্রতিহত একটি ব্যকুলা নদীর সাদৃশ্য ধারণ করলেন।—সহসা পর্বতের প্রতিরুদ্ধ হয়ে গতিহারা নদী যেমন আর সামনে অগ্রসর হতে না পেরে অন্তর্বেগে শুধু আপনার ভিতর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে থাকে, গিরিরাজসুতা উমার তেমনই অন্তর্নিবদ্ধ ভাবাবেগে উচ্ছ্বাসময়ী হয়ে উঠছিলেন।

রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রের সাহায্যে নারীর মাতৃরূপ ফুটিয়ে তোলার সফল প্রয়াস কালিদাসের কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। গর্ভবতী ইন্দুমতীকে প্রভাতকল্পা ম্লানচন্দ্রময়ী রজনীর সহিত তুলনাটির কথা আগেই বলা হয়েছে। 'রঘুবংশ'এই আবার রামচন্দ্রকে পার্শ্বে শায়িত করে কৃশদেহ কৌশল্যার পুত্রলাভের পরেব মূর্তিটি কবি কল্পনা করেছেন।—

'শয্যাগতেন রামেণ মাতা শতোদরী বভৌ।
সৈকতাম্ভোজবলিনা জাহ্নবীব শরৎকৃশা ॥'

—'আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া যাওয়া শরতের ক্ষীণ স্রোতস্বিনীর শুভ্র সৈকতে ঈষৎ রক্তাভ প্রস্ফুট পদ্মকলিটি দেখিয়া কবি যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা যেন সদ্য প্রসূত রক্তিমাভ শিশুটিকে বুকের

কাছে ধরিয়া শুভ্র শয্যায় ক্ষীণ শিথিল অঙ্গ এলাইয়া দিয়া শায়িতা মাতৃমূর্তি লব্ধ আনন্দেরই সহোদর।' পাঠকের চিত্তে এই সাদৃশ্যের চিত্রটি চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতিই যে শুধু তবে সমস্ত সৌন্দর্য দিয়ে নারীর রূপমাধুর্য ফুটিয়ে তুলেছে তাই নয়, নারীও তার মাধুর্য যেন সময় সময় প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানে গচ্ছিত রেখেছে। পরস্পর এই আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানব-সম্পর্কের নিবিড়তা সার্থক হয়ে ওঠে। 'রঘুবংশ'এ ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর অজ–বিলাপে,

'কলমন্যভৃতাসু ভাষিতং কলহংসীষু মদালসগতম্।
পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতং পবনাধূতলতাসু বিভ্রমাঃ।।
ত্রিদিবোৎসুকয়াপ্যবেক্ষ্যমাং নিহিতাঃ সত্যময়ী-গুণাস্ত্বয়া।

—স্বর্গে যাবার জন্য একান্ত উৎসুক তুমি, তোমার বিরহ সহ্য করতে পারব না ভেবে, কোকিলের গানে তোমার মধুর কণ্ঠ, কলহংসীকুলে তোমার মদালস-গমন, হরিণের চোখে তোমার বিলোল দৃষ্টি এবং পবন-কম্পিত লতায় তোমার বিলাস অর্পন করে গিয়েছ।— 'কুমার সম্ভব' কাব্যে মদনের সাহায্যে শিবের ধ্যানভঙ্গ করবার চেষ্টায় উমা বিফল হয়েছে। অন্তরে অন্তরে নিজের সৌন্দর্যকে নিন্দা করে তিনি তপস্বিনীর বেশ ধারণ করলেন। তাঁহার রূপের সমস্ত উপাদান গচ্ছিত রইল প্রকৃতির অঙ্কে,

'পুনর্গ্রহীতুং নিয়মস্থয়া তয়া
দ্বয়েঽপি নিক্ষেপইবার্পিতং দ্বয়ম।
লতাসু তন্বীষু বিলাস চেষ্টিতং
বিলোলদৃষ্টিং হরিণাঙ্গনাসু চ।।'

—তন্বীলতার দেহে উমা তাহার বিলাসভঙ্গী রেখে গেলেন, হরিণীর চোখে রইল তাঁর বিলোল দৃষ্টি।—প্রকৃতির উপাদান থেকে নারীর লাবণ্য এবং নারীর মাধুর্য থেকে প্রকৃতির উপাদানের মধ্যে এই যে সৌন্দর্যের আদান-প্রদান, এর সাহায্যে কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতি সজীব অনুভূতির অধিকারিণী হয়ে উঠেছেন।

কালিদাস প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু থেকে নারী সৌন্দর্যের উপমান সংগ্রহ করেছিলেন—সেই উপাদানগুলির কিছু কিছু পরিচয় পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সাহিত্যে যে নেই তা নয়। তবে কালিদাসের লেখনীতেই তাদের প্রথম কবিত্বপূর্ণ আবির্ভাব। নারীর আঁখিকে কালিদাস বহুস্থানে পুষ্পের এবং বিশেষ করে কমলের সঙ্গে তুলনা করেছেন; পার্বতীর চঞ্চল চোখের তুলনা 'প্রবাতনীলোৎপল।' খঞ্জন এবং চকোরের সঙ্গে সুন্দরীর নয়নের তুলনাও কালিদাসের কাব্যে। কালিদাসের সুন্দরীদের ওষ্ঠ অচিরোদগত কিশলয়, অধর বাঁধুলীকুসুম অথবা পক্ক বিম্বফলের ন্যায় এবং দন্ত মুকুলের সাদৃশ্য সুন্দর। কালিদাসের নায়িকাগণ 'শিরীষ কুসুম-কোমল' বাহু, 'কিশলয়াগ্র' অঙ্গুলি এবং সরসকদলী উরু নিয়ে মরালগমনে নায়কের প্রাণহরণ করেন। তাদের কনককাঞ্চীগণের রুণুধ্বনি কলহংস কূজনের সাদৃশ্য। বিবাহের বেশে সজ্জিতা পার্বতীকে কবি একটি সুন্দর উপমায় ভূষিত করেছেন 'প্রফুল্লকাশা বসুধেব'—প্রফুল্ল কাশফুল সজ্জিত বসুধার মত; বিরহের বেদনায় ক্ষীয়মানা শকুন্তলার রূপ, 'পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা-স্পৃষ্টা লতামাধবী।'—মরুৎ-পৃষ্ট মাধবী লতার মতো পত্রশূন্যা। বিষাদময়ী নারীর সাদৃশ্য রহিয়াছে শিশিরছিন্ন কমলদলে এবং 'কলামাত্রশেষ' চন্দ্রে।

ঋগবেদে প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের যে সব নিদর্শন আছে তাতে প্রকৃতিকে সজীব বলে কল্পনা করা হয়েছে সত্য কিন্তু ঋগবেদের ঋষিকবিরা প্রকৃতিতে মানবসুলভ অনুভূতির স্পর্শ লাগাতে পারেন নি। রামায়ণের প্রকৃতিতে মানবত্ব-আরোপ স্থানগুলিতে নায়িকা-সুলভ অনুভূতির আরোপ করার ক্ষীণ পরিচয় অবশ্য আছে। কালিদাসের কাব্যে প্রাকৃতিক চিত্রগুলি নায়িকাসুলভ রূপমাধুর্য এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির গভীরতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মেঘদূত কাব্যে,

'তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতামিব প্রাপ্তবাণীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিল বসনং মুক্তরোধনিতম্বম্।'

—গ্রীষ্মতাপে স্বল্পসলিলা গম্ভীরার জেগে-ওঠা পুলিন থেকে বেতসলতাগুলি জলের উপর ঝুঁকে পড়ে স্রোতে আন্দোলিত হচ্ছে—যেন গম্ভীররূপিনী নায়িকা তার নিতম্ব থেকে স্খলিত বসনখানি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করার চেষ্টায় রত।—উপমার ভাব প্রচ্ছন্ন থাকায়, এই অংশে মানবসুলভ অনুভূতির স্পর্শ লেগেছে। 'মেঘদূত'এই আবার মেঘের নিকট যক্ষের উজ্জয়িনী, নগরীর বর্ণনা।—

'বক্রঃপন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতসোত্তরাসাং
সৌধোৎসঙ্গ প্রণয়বিমুখো মা স্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।'

—দক্ষিণ পশ্চিমদিকে একটু বেঁকে তুমি উজ্জয়িনীর শোভা দেখে যেও। সৌধশিখরগুলি দেখলে মনে হবে নগরী যেন উৎসঙ্গ এলয়িত করে করে কার প্রতীক্ষা করছে।—নায়িকার রূপের চেয়ে নায়িকাসুলভ অনুভূতিই এই অংশটাতে বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে।

'বিক্রমোর্বশী' নাটক বিরহী পুরুরবার চন্দ্রোদয় বর্ণনা,

'উদয়গূঢ় শশাঙ্কমারীচিভির্মসি
দূরগিতঃ প্রতিসারিতে।
অলকসংযমনাদিব লোচনে হরতি
মে হরিবাহন দিঙ্মুখম্।'

—ঈষৎ প্রকাশিত চন্দ্রের কিরণে অন্ধকার দূর হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন মুখের উপর থেকে কেশভার সরিয়ে পূর্বদিক বধূর হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমার চোখে জেগে উঠল।—এই মানবত্ব আরোপে পুরুরবার মিলনাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত আছে বলেই অংশটির ব্যঞ্জনা গভীরতর হয়েছে। 'রঘুবংশ'এ চতুর্দশবর্ষ বনবাসের পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন। সমস্ত নগরী আনন্দে অধীরা।

'প্রাসাদ-কালাগুরুধূম রাজিস্তস্যাঃ
পুরো বায়ুবশেন ভিন্না।
বনান্নিবৃত্তেন রঘুত্তমেন
স্বয়ং বেণিরিবাবভাসে॥'

—প্রসাদে প্রজ্বলিত কৃষ্ণ অগুরুর ধূম বায়ুবশে চারিদিকে ছড়িয়ে

পড়ল—মনে হল যেন দীর্ঘকাল পরে বনবাস প্রত্যাগত রঘুমণি তাঁর বিয়োগ-বিষন্না রাজপুরীর বেণিবন্ধন মুক্ত করে দিয়েছেন,—তাই নগরীর রুক্ষ কৃষ্ণ কেশকলাপ বায়ুভরে উড়ছে।—রাজপুরীকে রঘুমণির বিয়োগবিষণ্ণা এবং রুক্ষকেশ কলাপের অধিকারিণী করে এই মানবত্ব আরোপে কবি অনুভূতির স্পর্শ লাগিয়েছেন। এরকম বহুক্ষেত্রে শুধু মানবরূপের এবং প্রকৃতি চিত্রের সাদৃশ্যেই নয় মানুষের অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতাও কালিদাসের কাব্যে অবলীলাক্রমে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিবিড় যোগাযোগের সন্ধান কালিদাসের কাব্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। অনুভূতিশীল প্রকৃতি-চিত্র বর্ণনা এবং মানব হৃদয়ের সহিত প্রকৃতির একাত্মতার পরিচয় যেন কালিদাসের কবিত্বের সহজাত প্রকাশভঙ্গি। মানবজীবনের সুখদুঃখের নাটকে কালিদাসের উপলব্ধ প্রকৃতি শুধু মূক এবং জড় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে নি, শুধুমাত্র পটভূমিরূপেও তাকে ব্যবহার করা হয় নি। অনুভূতিসম্পন্ন হয়ে সে অভিনয়ে পরিপূর্ণ কুশীলব অংশে স্থান পেয়েছে রঘুবংশে পুত্রলাভ কবিবার আকাঙ্ক্ষায় যখন রাজা দিলীপ নন্দিনীর পরিচর্যায় নিযুক্ত তখন তপোবনের তরুগণ রাজার পার্শ্বচর হয়ে উঠেছে। পক্ষীরা সুমধুর গানে রাজার জয়ধ্বনি করেছে। দিগ্বিজয়ী রঘু যখন বিন্ধ্য-পর্বতে সসৈন্যে অবস্থান করছিলেয তখন মলয়পবন সেবকের ন্যায় সৈন্যদের ক্লান্তি দূর করেছে। রাজা কুশ যখন সরযূনদী পার হয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন হংসমালা তাকে চামরব্যজন করেছে। 'রঘুবংশ'এ প্রকৃতিকে অনুভূতিশীল করে অঙ্কিত করার প্রয়াস এবং সিদ্ধি গভীরতম রূপলাভ করেছে।

'যস্মিন্ মহীং শাসতি বণিনীনাং নিদ্রাং
বিহারার্দ্ধপথে গতানাম।
বাতোঽপি নীস্রংসয়দংশুকানি কো
লম্বয়েদাহরণায় হস্তম্ ॥'

দিলীপের সুশাসনের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলছেন,—মদমত্তা

কামিনীগণ বিহারস্থলে যাবার কালে যদি পথিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়ত তবে কোনো কামুক তো দূরের কথা পবন পর্যন্ত সেই রমণীর নিদ্রাগলিত বসন কম্পিত করার সাহস পেত না।—এখানে পবনকে শুধু অনুভূতিশীল করেই কবিত্বস্রোত হয়ে যায়নি কল্পনার অবাধ বিচরণ সে স্রোতকে চিরমুখর করে রেখেছে। 'রঘুবংশে'ই অন্য অংশে সীতা এবং রামের আকাশপথে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের সময় যখন আকাশগঙ্গার তরঙ্গ-শিখর-সিক্ত এবং অদূরবর্তী মহেন্দ্র পর্বতের ঐরাবত মদ-গন্ধী মন্দ সমীরণ সীতার মুখে এসে লাগছিল, তখন রামচন্দ্র সে পবনের প্রতি হিংসার ভাব পোষণ করে তাকে অনুভূতিশীল করে তুলেছেন। লক্ষ্মণ যখন অগ্রজের আদেশে সীতাকে বনে পরিত্যাগ করে আসছিলেন তখন,

'অবার্যতেবোত্থিত-বীচি-হস্তৈর্জহ্নোর্দুহিত্রা স্থিতয়া পুরস্তাৎ।'

—জহ্নুদুহিতা গঙ্গা যেন তরঙ্গময় হস্ত সঞ্চালনে তাকে এই দুষ্কার্য হতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।—'কুমারসম্ভ'বএও উমা যখন পতিলাভের আকাঙ্ক্ষায় ঘোর তপস্যায় রত তখন,—

'ব্যালোকয়ন্নুন্মিষিতৈস্তড়িন্ময়ৈর্মহাতপঃ-
সাক্ষ্যে ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ।'

—তিমিরা রজনী মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকের দ্বারা গৌরীর কৃচ্ছ্র সাধনা লক্ষ্য করত—মহাতপা উমার সেই তো একমাত্র সঙ্গী।—মেঘদূত-কাব্যে মেঘকে দূত কল্পনা করে তার কাছে বিরহ বেদনার পাত্র উজাড় করে দেবার মধ্যেই যদিও প্রকৃতিকে অনুভূতিশীল করে তুলবার সম্পূর্ণ প্রয়াস ধরা পড়েছে, তবু অনুভূতিশীলতাকে কবি প্রগাঢ় বর্ণনামাধুর্যে মাঝে মাঝে আরও সুন্দর করে তুলেছেন। মেঘ-দয়িতের দর্শণ অভিলাষিনী দশার্ণদেশের উদ্যানরাণীকে কবি পুষ্পরোমাঞ্চে সাজিয়েছেন, বিদিশার বেত্রবতী নদীর তীরও মেঘ-প্রিয়ের আগমনে 'পুলকিতমিব প্রৌঢ়ঃ পুষ্পৈ কদম্বৈঃ'—প্রস্ফুটিত কদম্ব পুষ্পে তাহার পুলক রোমাঞ্চ ফুটিয়ে তুলেছেন।

কালিদাসের সহানুভূতিশীল এবং নির্বিকার নিসর্গচিত্রগুলিও

সুন্দর। 'রঘুবংশ'এ দিলীপের সাম্রাজ্ঞীর সঙ্গে বনগমনের সময় এবং রঘুর জন্মের সময় দশদিক প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল এবং অনুকুল বায়ু প্রবাহিত. হয়েছিল। ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজবিলাপে এবং 'কুমার সম্ভব'এর রতিবিলাপে সমস্ত নিসর্গের মনে সহানুভূতির ছোঁয়া লেগেছে। পশু-পক্ষী লতা-গুল্মকে কবি অশ্রুবারিধৌত করে অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন। 'বিক্রোমর্বশী' নাটকেও বিরহী পুরুববার দুঃখে সমস্ত প্রকৃতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছে। 'রঘুবংশ'এ একটি সুন্দর সহানুভূতিশীল প্রকৃতি চিত্রের পরিচয় আছে। রামসীতার বিবাহের পর বিবাহযাত্রীদের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের সময়ে পথরোধ করে দাঁড়ালেন পরশুরাম। ভীষণ দর্শন পরশুরামের মূর্তি দেখে,—

'শ্যেন-পক্ষ-পরিধূসরালকাঃসান্ধ্য-মেঘ-রুধিরার্দ্রবাসসঃ।
অঙ্গনা ইব রজস্বলা দিশো নো বভূবুরবলোকন-ক্ষমাঃ ॥'

—দিকবধূদের ধূসর অলকের ন্যায় শ্যেন পক্ষিবৃন্দে আকাশ সমাচ্ছন্ন হল এবং রজস্বলা রমণীর শোণিতাক্ত বসনের ন্যায় সন্ধ্যাকালীন রক্তমেঘমালায় আকীর্ণ আকাশের দিকে আর দৃষ্টিপাত করা গেল না।—আধুনিক দৃষ্টিতে রুচি বিগর্হিত উপমার অংশটি বাদ দিলে এই পংক্তি দুটির কবিত্বসৃষ্টিতে সার্থক। বিবাহ শোভাযাত্রায় পরশুরামের আগমনজনিত ভয় এবং তাহার ভীষণতাকে কবি সন্ধ্যাকাশে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন, মানব মনের আশঙ্কার সঙ্গে প্রকৃতি একাত্ম হয়ে গিয়েছে।

বিরহের পটভূমিতে প্রকৃতিকে মিলনোচ্ছল করে উভয়ের তুলনার মধ্য দিয়ে বিরহের সুরটি আরও করুণ করে তোলাই নির্বিকার প্রকৃতি বর্ণনার উদ্দেশ্য। কালিদাসের নির্বিকার প্রকৃতিচিত্রগুলি সহানুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্র থেকে কিছু হীন মনে হলেও কবিত্ব সৃষ্টিতে সার্থক। বিরহী পুরুববার হৃদয় বেদনাকে পাঠকের উপলব্ধিসুলভ করে তোলবার জন্য কবি বহুবার নির্বিকার প্রকৃতিচিত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। বনের মধ্যে চারিদিকে মিলনের দৃশ্য দেখে পুরুরবার বিরহী হৃদয় আরও বিচলিত হয়ে উঠেছে। প্রেমোন্মাদ দুষ্মন্তকেও শীতাংশু

অগ্নিবর্ষণ করেছে, পুষ্পদল তার কাছে কঠিনতার প্রতিমূর্তি মনে হয়েছে, মলয়পবন রথে এসেছে জ্বালা। বিরহী হৃদয়ের নিকট চন্দ্র মলয় পবন এবং পুষ্পের সাধারণ ধর্মের এই পরিবর্তন বৈষ্ণব কবিদেরই বিশেষ করে প্রলুব্ধ করেছিল। রাধা কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর মধ্যে এই প্রকার বর্ণনার বান বয়ে গিয়েছে।

কালিদাসের অনুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পরবর্তী উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "কালিদাস কখনও বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে কোন অশরীরী আত্মার আবিষ্কার বা সন্ধান করেন নাই—বহিঃ প্রকৃতি তাহার কাছে একান্ত সজীব হইয়া উঠিয়াছে তাহার সকল জৈব প্রাণধর্ম্মে—তাহার সকল চেতনা বিলাসে। ইহার ভিতরে কোন দার্শনিকতা নাই,—রহিয়াছে স্পষ্ট বাস্তবদৃষ্টি, বাস্তব অনুভূতি।' প্রকৃতির প্রতি এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই প্রকৃতি মানুষের মতোই তাঁর কাব্যে নায়ক নায়িকা হয়ে উঠেছে। 'মেঘদূত'এ শুধু দূত মেঘ নয় সমস্ত প্রকৃতিই বিরহী যক্ষের প্রিয়া বিরহের বেদনা ভাগ করে নিয়েছে। মানুষেব সঙ্গে প্রকৃতির এই অনুভূতির আদান-প্রদানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'শকুন্তলা' কাব্যে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র।' কবি আলংকারিক উপায়ে তপোবনের প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন নাই—জীবনের সকল সূক্ষ্ম মাধুর্যের সহযোগে নিসর্গসুন্দরী শকুন্তলার সখীস্থান অধিকার করিয়াছে; 'বনজ্যোৎস্না ও সহকার তরুকে কেন্দ্র করে শকুন্তলা এবং সখীদ্বয়ের বিমল হাস্যপরিহাসের এই সম্বন্ধটি মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে। বনজ্যোৎস্না এবং সহকারতরু···মূক প্রকৃতির অংশ মাত্র নহে,— তাহাদের সহিত রহিয়াছে যৌবনের প্রচ্ছন্ন আশা আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া জাগিয়া উঠা একটি নবীন দম্পতীর অভেদসিদ্ধান্ত কুমারী জীবনের সেই স্বপ্ন সেই অভেদ সিদ্ধান্তকে পশ্চাতে রাখিয়াই সমস্ত দৃশ্যটি এমন সজীব এবং সরস হইয়া উঠিয়াছে।" শকুন্তলার বিদায়দৃশ্যে শকুন্তলার জন্য পুষ্পআভরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে আশ্রম বালকদ্বয় দেখতে পেল—

মঙ্গল কার্যের উপযোগী ক্ষৌম্যবসন দান করছে চন্দ্রপাণ্ডু কোনো বৃক্ষ, কোনো বৃক্ষ চরণ-প্ররাগ অলক্তরস ক্ষরণ করেছে, অন্যান্য তরুও যেন নিজেদের কিশলয় রক্তিম করতলে নানা আভরণ দান করবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।—এই উপহার প্রদানের দ্বারা শকুন্তলার সঙ্গে তপোবনের গভীর সম্বন্ধের মাধুর্য্য যে উপায়ে প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনা পাওয়া যায় না। বিদায়ের অব্যবহিত পূর্বে মহর্ষি কণ্বের অনুরোধে সন্নিহিত তরুগণ কোকিলকণ্ঠে সাড়া দিয়ে শকুন্তলার বিদায় অনুমোদন করেছিল। "জীবনের একটি সুকুমার অধ্যায়কে কথার তুলিতে কাব্যে আঁকিয়া তুলিতে তিনি (কালিদাস) বিশ্বপ্রকৃতিকে শুধু পটভূমি রূপে গ্রহণ করেন নাই,—প্রকৃতির প্রবাহকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার চিত্রগুলিকে জীবনের সমপর্যায়ে ফেলিয়া।"

কোনো একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তাহার সঙ্গে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দৈহিক অথবা ভাবসাদৃশ্য কল্পনা করাই ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতির গোড়ার কথা। ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতিতে রূপকাত্মকার একটি বিশেষ স্থান আছে। কালিদাসের ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি চিত্রগুলি ভাবের গভীরতায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে, রূপকাত্মকাকেও প্রকাশ করেছে। 'রঘুবংশ'এ রাজাদশরথের মৃগয়াদৃশ্যে,—চন্দ্রকরমণীয় কলাপ বিস্তার করে বনময়ূরগণ তাঁর অশ্বের চারদিকে উড়তে লাগল কিন্তু তিনি তাদের দিকে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারলেন না। ময়ূরপুচ্ছের বর্ণসাদৃশ্যে তাহার মনে পড়ে গেল —'মাল্যানুকীর্ণে রতিবিগলিত বন্ধে কেশপাশে প্রিয়ায়াঃ'—নানা কুসুম শোভিত রতিশ্রম বিগলিত প্রিয়ার কেশপাশ। সীতাবিরহকাতর রামচন্দ্রকেও 'স্তনাভিরাম স্তবকাভিনম্র' স্তনস্তবকের ভারে ঈষৎ অবনম্র অশোক লতিকা সীতার আলিঙ্গনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। এই ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি চিত্রগুলিতে রূপকাত্মকতার আভাস আছে কারণ প্রিয়ার পুষ্পশোভিত কেশপাশ এবং সীতার পয়োধরসংসর্গ আলিঙ্গনের সঙ্গে সাদৃশ্যই এস্থানে সূচিত হয়েছে। 'বিক্রোমার্বশী'তে উর্বশীহারা পুরুরবার উক্তি,

'আরক্ত কোটিভিরিয়ং কুসুমৈর্নবকন্দলীমলিনগর্ভৈঃ।
কোপাদন্তর্বাষ্পে স্মরয়তি মাং লোচনে তস্যাঃ॥'

—বর্ষার নবধারা স্পর্শে ভূগর্ভ থেকে রক্ত-নবকন্দলী ফুটে উঠেছে এবং তার মধ্যে জলবিন্দু জমে প্রিয়ার ক্রোধরক্ত সজল নয়নের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।—রূপকাত্মতাই এই ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি চিত্রের প্রাণ। প্রকৃতির প্রতি আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যে অত্যন্ত আধুনিক কালের সংযোজন। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন কবিরও জন্ম হয়, যাঁরা প্রতিভাবলে অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত কাব্যের কোনো একটি বিশেষ ধারার আভাস সূচিত করে যান। কালিদাস তাঁদেরই অন্যতম। 'মেঘদূত' কাব্যটি একদিকের বিচারে আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত। আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘাশ্লিষ্ট সানুদেশের দিকে তাকিয়ে বিরহী যক্ষ যে কল্পনার রাজ্যে চলে গিয়েছেন তা কালিদাসের কবিমনের বিশিষ্ট মেজাজের (mood) রাজ্য। 'মেঘদূতেরই মেঘলোকে ভবতি সুখিনোহপ্য ন্যথাবৃত্তি চেতঃ'। মেঘদর্শনে সুখী লোকের চিত্তও কেমন আকুল হয়ে ওঠে—এই কথাটির মধ্যে যেন কবি হৃদয়ের হতাশার দীর্ঘশ্বাস বাণীলাভ করেছে, কালিদাসের মানসরাজ্যের সন্ধান যতো ক্ষীণ আকারেই হোক যেন এই কথাটিব মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

কালিদাসের প্রকৃতি বর্ণনাগুলি মুখ্যত রূপকাত্মক একথা আগেই বলা হয়েছে। নানাপ্রকার উপমা এবং প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপ এর প্রধান অবলম্বন। সেগুলি সাধারণভাবে রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র এবং প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের অংশেই আলোচিত হয়েছে। এগুলি ছাড়া কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনা বস্তুলীন দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত নয়। প্রত্যেক বর্ণনার মধ্যেই কালিদাসের কবিকল্পনার অবাধ বিচরণ আছে। তাঁর প্রকৃতি বর্ণনাগুলি কল্পনার আভরণে বিশেষ-ভাবে সজ্জিত (decorative)। রাজসভার কবি রূপে কালিদাসের পক্ষে এটাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দীর্ঘ প্রকৃতি বর্ণনাগুলির মধ্যে 'রঘুবংশ'এ রামসীতার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন দৃশ্য, 'কুমারসম্ভব'এ হিমালয়ের রূপ এবং সন্ধ্যার বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। আর সমস্ত 'মেঘদূত'

কাব্যখানি তো নিসর্গবর্ণনার অপরূপ পরিচয়ে সমুজ্জ্বল। কল্পনার অবাধ সঞ্চরণে, কবি সুলভ অন্তর্দৃষ্টি এবং দৃশ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে আনুপাতিক সম্বন্ধ স্থাপনে 'মেঘদূত' কাব্যের প্রকৃতিবর্ণনা চিরদিনই রসিক মনের অনুভূতিতে আকৃষ্ট এবং মুগ্ধ করবে। 'বিক্রোমর্ব্বশী' নাটকেও কবি উর্ব্বশীর সন্ধানরত বিরহী পুরুরবাকে যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করেছেন, তার তুলনা অন্য কোনো সাহিত্যে প্রায় দুর্ল্ভ। 'শকুন্তলা'তে প্রকৃতি বর্ণনার স্বতন্ত্র প্রয়াস নেই। থাকার কথাও নয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি সজীব হয়ে 'শকুন্তলা' নাটকে পাত্রপাত্রীর স্থান অধিকার করেছে। প্রাকৃতিক কতকগুলি দৃশ্যের প্রতি কালিদাসের কবিসুলভ পক্ষপাতিত্ব ছিল। তাদের মধ্যে একটি আকাশপথ থেকে পৃথিবীর শোভাদর্শন। 'রঘুবংশ'এর পুষ্পকরথে রামসীতার অযোধ্যায় আগমন, 'শকুন্তলা'ও 'বিক্রোমর্বশী' নাটকে এবং সমস্ত 'মেঘদূত' কাব্য জুড়েই আকাশ থেকে সুন্দরী ধরণীর রূপ পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হয়েছে। কালিদাসের কল্পনাবিলাসের এটি অন্যতম পরিচয়।

কালিদাস প্রধানত শান্ত-রসের কবি। কাজেই প্রকৃতির রুদ্ররূপ বর্ণনা কালিদাসের কাব্যে অল্পই আছে। একথা পূর্বেই উদাহরণেয় সাহায্যে আলোচিত হয়েছে। শান্তরসের কবি হিসাবে তপোবন দৃশ্যের সমাহিত মূর্তি কিন্তু কালিদাসের কাব্যে অমরত্ব লাভ করেছে। দিলীপের তপোবন বাসকালীন তপোবন দৃশ্য এবং 'শকুন্তলা'র তপোবনের পটভূমি সাহিত্যের চিরকালীন সঞ্চয়।

'কুমারসম্ভব'এর প্রারম্ভে হিমালয়ের বর্ণনায়, কালিদাস কল্পনার রঙিন তুলিতে হিমালয়কে অপরূপ সজ্জা দান করেছেন।

একটি শ্লোক,—

'যশ্চাপ্সরো-বিভ্রম-মণ্ডনানাং সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বিভর্তি।
বলাহক-চ্ছেদ-বিভক্ত-রাগামকাল-সন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্॥'

—হিমালয়ের শিখরদেশের নানা ধাতুর আভা যখন বাতাসে ভেসে বেড়ানো মেঘখণ্ডের গায়ে লাগে, তখন পর্বত মধ্যবর্তিনী অপ্সরসুন্দরীরা

সন্ধ্যাভ্রমে তাড়াতাড়ি বেশভূষা সম্পাদন করতে গিয়ে ভুল করে বসেন।—কল্পনার অবাধ সঞ্চরণে এটি রমণীয়। 'কুমারসম্ভব'এই গৌরীর নিকট শংকরের সন্ধ্যাদৃশ্য বর্ণনায় রূপকাত্মক কিন্তু কল্পনার বিচিত্র সঞ্চরণে অপরূপ—

'পূর্বভাগতিমিরপ্রবৃত্তিভির্ব্যক্তপঙ্কমিব জাতমেকতঃ।
খং হৃতাতপজলং বিবস্বতা ভাতি কিঞ্চিদিব শোষবৎ সরঃ॥'

—পূর্বাকাশে পঙ্কের ন্যায় প্রগাঢ় অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে আসছে—যেন একটি নিদাগশুষ্ক জলাশয় আকাশের আকারে পড়ে রয়েছে। 'রঘুবংশ' কাব্যে আকাশ পথ হইতে দূরে বিলীয়মান বেলাভূমির দিকে তাকিয়ে রামের উক্তি,—

'দূরাদয়শ্চক্র-নিভস্য তন্বী তমাল-তালীবনরাজি-নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥'

—দূরে, অতিদূরে, নিতান্ত ক্ষীণ রেখাব ন্যায় লবণাম্বু রাশির বলয়াকার তীরভূমি দেখা যাচ্ছে,—একবার দৃষ্টি দানকর। তমাল ও তালবন রাজিতে বেলাভূমি একেবারে নীল—অতি গভীর নীলবর্ণ ধারণ করেছে' লৌহচক্রাকার নীলাম্বুরাশির ধারাভাগে কতনা মালিন্যের রেখা পড়েছে।—এই বর্ণনায় বেলাভূমির দূরত্ব বুঝাবার জন্য দীর্ঘবণ ব্যবহারের প্রাচুর্য অভিনব। শ্লোকটি আবৃত্তির মধ্য দিয়েই 'তমাল-তালি-বনরাজি-নীলা শোভিত সমুদ্রতীরের বিলীয়মান সীমা-রেখার চিত্র পাঠকমনে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

সাধারণ প্রকৃতি বর্ণনার মতো ঋতুবর্ণনায়ও কালিদাস কল্পনা বিলাসের পরিচয় দিয়েছেন। উপরন্তু বিভিন্ন ঋতুগুলি তাহার কাব্যে অনুভূতির গভীরতায় সজীব হয়ে উঠেছে। কালিদাসের বর্ণিত ঋতুগুলি কেবলমাত্র বাৎসরিক নৈসর্গিক প্রপঞ্চই নহে, তারা ঋতু-পুরুষ। মানবমনের সহিত গভীর সম্পর্কে তাহাদের সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে ওঠে।

'ঋতুসংহার' কাব্যে ষড়ঋতুর প্রত্যেকটিরই বর্ণনা আছে, তারা বিভিন্ন ঋতুর প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির সম্বন্ধে কালিদাসের কবিত্বপূর্ণ

জ্ঞানের পরিচায়ক। গ্রীষ্ম বর্ণনার প্রথম দিকটি ব্যবহারিকতায় পূর্ণ; তবে ব্যবহারিক বর্ণনাতেও কি করে কবিত্বের স্পর্শ লাগাতে হয়, সে ধারণা কালিদাসের স্বভাবজাত। গ্রীষ্মের আগমনে প্রকৃতির দেহে কি কি পরিবর্তন হয়েছে তাও কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায় সৃষ্টিমূলক হয়ে উঠেছে। শেষভাগে নিদাঘ প্রজ্জ্বলিত দাবাগ্নির চিত্রে কবি তৃষ্ণার্ত পশুপক্ষিদের ভয়ব্যাকুলতা এবং প্রকৃতির শ্রীহীন মূর্তির একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন,

'শ্বসিতি বিহগবর্গঃ শীর্ণ-পর্ণ-দ্রুমস্থঃ
কপিকুলমুপযাতি ক্লান্তমদ্রের্নিকুঞ্জম্।
ভ্রমতি গবয়যূথঃ সর্বতস্তোয়মিচ্ছঞ্ছরভকুল
মজিহ্মং প্রোদ্ধরত্যম্বু কূপাৎ ॥'

—অতিশয় তাপে ঝরে পড়া পত্রশূন্য রুক্ষ তরুতে বসে বিহগকুল ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করছে। বানরগুলি ক্লান্ত হয়ে গিরিকঞ্জের দিকে ধাতি হচ্ছে। পিপাসু গবকদল জলের আশায় ইতস্তত সঞ্চরমান। শরভ কুল খজুলম্বিত দেহে কূপ থেকে জল উত্তোলন করছে।—'রঘুবংশ'এ কুশের অযোধ্যা প্রত্যাগমনের পরও একটি গ্রীষ্ম বর্ণনার অবতারণা করা হয়েছে। সে স্থানে গ্রীষ্মকে ভোগ লালসার ঋতুরূপেই উপস্থাপিত কবা হয়েছে। রূপকাত্মক বর্ণনায় সে নিদাঘদৃশ্য রমণীয় হয়ে উঠেছে।

ভাবের দিক থেকে কালিদাসের কাব্যে বর্ষা ঋতুরই প্রাধান্য। অন্যান্য ঋতু বর্ণনায় কবি মানবমনের সহিত ঋতুপুরুষের গভীর সম্পর্কের ইঙ্গিত করেছেন কিন্তু বর্ষাঋতু বর্ণনায় সে ইঙ্গিত পূর্ণতা লাভ করেছে। অন্যান্য ঋতু মানবমনে ভোগলালসার কি অভিলাষ জাগিয়ে তোলে তাই যেন কবির বক্তব্য বিষয়। কিন্তু বর্ষা ঋতুতে এই অভিলাষকে কবি দেহাতীত অশরীরী প্রেমের রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছেন। বর্ষায় মানবমনের মিলনাকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ের অকথিত বাণীতে ভরা ব্যাকুলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। দেশ কাল এবং পাত্র নিরপেক্ষ বিরহী-হৃদয়ের চিরন্তন ক্রন্দন 'মেঘদূত'এর ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে। 'ঋতু-সংহার' কাব্যে বর্ষাবর্ণনার যে অংশটি স্থান পেয়েছে তারও প্রধান বিশেষত্ব কল্পনার অবাধ সঞ্চরণ।

'অভীক্ষ্ণমুচ্চৈর্ধ্বনতা পয়োমুচা ঘনান্ধকারীকৃতশর্বরীষ্বপি।
তড়িৎপ্রভা-দর্শিত-মার্গ-ভূময়ঃ প্রয়াস্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥'

—নিরন্তর মন্দ্রধ্বনিতে মেঘমালা রজনীর অন্ধকার শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। পথঘাট অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে। এই তিমিরাবৃত তামসী রজনীতেও অভিসারিকাগণ ক্ষণিকবিদ্যুৎ ঝলসিত পথে, অনুরাগান্ধ হৃদয়ে সঙ্কেত স্থলের উদ্দেশ্যে চলেছে ত্রস্ত পদক্ষেপে। অথবা—

'পয়োধরৈর্ভীম-গভীর-নিস্বনৈ-স্তড়িদ্ভিরুদ্বেজিত-চেতসো ভৃশম।
কৃতাপরাধানপি যোষিতঃ প্রিয়ান্ পরিষ্বজন্তে শয়নে নিরন্তরম ॥"

—একই শয্যায় অপরাধী প্রিয়তমের সহিত শয়ন করেও যারা রোষভরে মুখ ফিরিয়েছিলেন, অকস্মাৎ জলধরের গর্জন ও বিদ্যুৎছটায় ভীত হয়ে সে সব অভিমানিনী পার্শ্বপরিবর্তন করে অপরাধী প্রিয়তমকে প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করছে।—এ অংশগুলির সৌন্দর্য এবং কল্পনার অপরূপ বিচরণ রসজ্ঞ পাঠকের নিকট চিরন্তরণ রসের উৎস।

'ঋতুসংহার' কাব্যের শরৎবর্ণনাটি প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের নিদর্শন। শরৎকালকে শরৎরাণী রূপ দেবার এই প্রাথমিক অভিলাষ রবীন্দ্রনাথে এসেও শেষ হয়নি। কালিদাস শরৎকে নববধূরূপে সাজিয়েছেন। শরতে যুবকযুবতীর হৃদয়ের গভীর মিলনাকাঙ্ক্ষার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও এই বর্ণনায় অভিব্যক্ত। 'রঘুবংশ'এও রঘুর দিগ্বিজয়ের প্রারম্ভে একটি শরৎবর্ণনার অবতারণা করা হয়েছে। বর্ণনাটি অলংকারপূর্ণ এবং কল্পনাবিলাসের সূক্ষ্ম নিদর্শন। একস্থানে আছে।—

'প্রসবৈঃ সপ্তপর্ণানাং মদ-গন্ধিভিরাহতাঃ।
অসূয়য়েব তন্নাগাঃ সপ্তধৈব প্রসুস্রুবুঃ ॥

সপ্তপর্ণ কুসুমের গন্ধ মদস্রাবী করীর মদগন্ধের মতো। এই সপ্তপর্ণ কুসুমগন্ধে ঈর্ষান্বিত হয়েই যেন মদোদ্ধত মাতঙ্গগণ দেহের সপ্তস্থান থেকে সপ্তধারায় মদবর্ষণ করতে লাগল।

'ঋতুসংহার হেমন্ত বর্ণনাটি ব্যবহারিকতাময়। ভোগলালসার কথাই এই হেমন্ত বর্ণনায় প্রাধান্য পেয়েছে; কল্পনাবিলাসে

সে-ব্যবহারিকতা কবিত্বের স্পর্শ পেয়েছে। বর্ণনার শেষ দুইটি পংক্তিতে অবশ্য ব্যবহারিকতার ইঙ্গিত বেশি স্পষ্ট।—

'বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী পরিণত-
বহুশালিব্যাকুলগ্রামসীমা।
সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চমালাপরীতঃ
প্রদিশতু হিমযুক্তঃ কাল এষঃ সুখং বঃ॥

—বিলাসীর পক্ষে এই হেমন্ত ঋতু নানাপ্রকারে রমণীয় এবং অঙ্গণাকুলের পরমহৃদয়রঞ্জন। চিত্তমুগ্ধকর নানাপ্রকার পরিপক্ক শস্যে গ্রামের সীমা সুশোভিত। বকপংক্তির নির্মল মাল্যশোভিত এই হেমন্তকাল তোমার সর্বপ্রকার সুখ বিধান করুক।

'ঋতুসংহার' কাব্যের শীত ঋতুর বর্ণনা প্রায় সমগ্রভাবেই ব্যবহারিক তবে কালিদাসের লেখনীতে ব্যবহারিকতাও কাব্য হয়ে ওঠে। শীত ঋতুতে বিলাসিনীদের সম্ভোগসুখের উল্লেখ যদিও ঋতুবর্ণনার মুখ্য বক্তব্য। কিছু সুন্দর প্রকৃতিচিত্রের অবতারণাও আছে।

'কৃতাপরাধান বহুশোঽপি তর্জিতান
সবেপথূন্ সাধ্বসলুপ্তচেতসঃ।
নিরীক্ষ্য ভর্তৃন সুরতাভিলাষিণঃ
স্ত্রিয়োঽপরাধান্ সমদা বিসস্মরুঃ॥'

—এই শীতকালের প্রভাবে সুরতাভিলাষিণী স্ত্রীগণ অপরাধী, বারংবার বেপথুমান এবং ভয়বিলুপ্তজ্ঞান পতিদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করেই তাদের ক্ষমা করে ফেলছেন।

কালিদাসের কাব্যে ভাবের দিক থেকে না হলেও আয়তনের দিক থেকে বসন্ত ঋতুর প্রাধান্য। স্বল্পতম সুযোগেই তিনি বসন্ত বর্ণনার অবতারণা করেছেন। এর কারণ বোধ হয় এই যে, রাজসভার বর্ণনাধর্মী (decorative) কবি হিসাবে বসন্ত ঋতুকে ব্যবহার করাই কবির পক্ষে সহজ এবং অনায়াসাধ্য ছিল। বসন্ত ঋতুতে কল্পনা-বিলাসের পরাকাষ্ঠা দেখাবার সুযোগ প্রচুর। কালিদাসের কাব্যে

বসন্ত ঋতু মানবত্ব আরোপে সমুজ্জ্বল, সে 'মদনসখঃ বসন্তঃ'। 'ঋতু-সংহারেরও বসন্ত ভোগবিলাসেরই ঋতু। বর্ণনা বিলাস এবং অলংকারের সাহায্যে বসন্তকে কামীজনের কামবর্ধক ঋতুরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সিন্ধুবধের পূর্বে দশরথের মৃগয়ার পটভূমিতে রামায়ণে যেস্থানে শরৎ-বর্ণনা করা হয়েছে কালিদাসের 'রঘুবংশ'এর ঠিক সেইস্থানে বসন্ত বর্ণনা আছে। বসন্তের বিভিন্ন দৃশ্যের ভাবানুষঙ্গ দশরথকে নানাপ্রকার সম্ভোগদৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। বসন্তদৃশ্যের এই অনাবিল আনন্দ এবং দশরথের চিত্তচাঞ্চল্যের পরেই করুণ দৃশ্যের অবতারণা বৈপরীত্বের (contrast) সাহায্যে এ অংশটিকে কবিত্ব মণ্ডিত করেছে এবং নাটকীয় করে তুলেছে।

কালিদাসের বসন্তবর্ণনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'কুমার সম্ভব'এর মদন ভস্মের পূর্বে অকালবসন্তের বর্ণনায়। অকালবসন্তের অপরূপ কল্পনা এবং বর্ণনার কল্পনাবিলাস সমান তালে অগ্রসর হয়ে অংশটিকে কবিত্বের রাজ্যে উন্নীত করেছে। কল্পনার অবাধ সঞ্চরণের পরিচয়,

'কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌ গন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলঙ্ঘ্য।
দিগ্ দক্ষিণা গন্ধবহংমুখেন ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ ॥'

—দক্ষিণায়ণে অবস্থিতির নিয়মিত সময় পূর্ণ হবার পূর্বেই সূর্য উত্তরায়ণে গমন করতে প্রবৃত্ত হলে, দক্ষিণদিক পরিত্যক্ত কামিনীর মতো মলয়সমীর রূপ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন।—এর পর কামোদ্দীপক অনেক দৃশ্যের বর্ণনা করে শিবের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।—

'মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥

—মধুকর, প্রিয়া-পীতাবিশিষ্ট মধুকুসুম হতে তৃপ্তির সঙ্গে মধুপান করতে লাগল এবং প্রেমালসে যখন কৃষ্ণসার মৃগ প্রিয়তমার নয়ন শৃঙ্গদ্বারা কণ্ডুয়ন করে দিতে লাগল তখন মৃগীর চক্ষু তন্দ্রালসে নিমীলিত হয়ে এল।

বর্ণনা বিশেষতঃ ঋতুবর্ষায় কালিদাস বর্ণনাবিলাসী কিন্তু শুধু বর্ষা

বর্ণনায় কবি এক অনিন্দ্যসুন্দর ভাবরাজ্যের সন্ধান দিয়েছেন। সে ভাবরাজ্যের পরিপূর্ণ পরিচয় আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে অভিষিক্ত করেছে। সে আলোচনা স্বতন্ত্র রচনার বিষয়-বস্তু। শুধু কাব্যের পরিবেশ থেকে রবীন্দ্রনাথের কালিদাসের যুগে অভিসারের কিছু পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

কালিদাসের কাব্যে ভারতবর্ষেয় তপোবন প্রকৃতি তথা নাগরিক শোভা সম্পদ যে সমগ্রতায় আঁকা হয়েছিল সেটা আর কারও কাব্যে হয়েছে কিনা সন্দেহ। কালিদাসের সমসাময়িক বলে কথিত ভবভূতির কাব্যেও এই তপোবন প্রকৃতি এত সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত না হলেও প্রায় অনুরূপ গভীরতায় আঁকা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের "সীতার বনবাস" ভবভূতির কাব্য "উত্তর রামচরিত"কে অবলম্বন করেই লেখা। রবীন্দ্রনাথও ভবভূতির কাব্যের এই বিশেষত্বটি বহুবার উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে কালের দিক থেকে যদিও বা না হয়, তবু প্রেরণার দিক থেকে "ভবভূতি" কালিদাসেরই সমগোত্রীয়।

কালিদাসের কালকে সেজন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ আবার নূতন করে সৃষ্টি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের পূর্ববর্তী দুটি যুগের নূতন ক'রে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারমধ্যে একটি কালিদাসের যুগ, একটি বৈষ্ণব কাব্যের দীর্ঘ যুগ। এখানে শুধু কালিদাসের যুগের কথাই আলোচিত হবে। অন্য যুগটির প্রসঙ্গ যথাস্থানে সংযোজিত হবে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পূর্ববর্তী যুগের পরিবেশ যেভাবে স্থান পেয়েছে সেটি কেবলমাত্র পৌরাণিক কাহিনী বা পরিবেশ রচনার আপাত উদ্দেশ্য নয়। প্রাচীন যুগ নিয়ে কাব্য সাহিত্য রচনায় অনেক সময়ই কবি সে যুগের একটি পরিবেশ রচনার প্রয়াস করেন। সময় সময় সেটি রসোত্তীর্ণ এবং বাস্তব হয়েও ওঠে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কালিদাসের যুগের প্রভাব সেদিক থেকে বিচার্য নয়। তাঁর সমগ্র কাব্যের মধ্যে কালিদাসের যুগ আত্মস্থ হয়ে আছে। বিদেশী সাহিত্যে এর একটি মাত্র উদাহরণ চোখে

পড়েছে। ইংরেজ কবি Keats এর কাব্যে প্রাচীন গ্রীসের পরিবেশ নূতন বাহন পেয়েছিল। তাকে সমালোচকরা Hellenism আখ্যা দিয়েছেন। রবীন্দ্রকাব্যের কালিদাস-সৃষ্ট পরিবেশ তেমন করেই হয়তো বা তার চেয়েও গভীরভাবে নূতন সৃষ্টি মণ্ডিত হয়েছে।

"আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসেব কালে,
দৈবে হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের কালে।"

এশুধু কবিসুলভ অতিশয়োক্তি নয়। কালিদাসের যুগে কবির অভিসার এ-যুগের নানা প্রাকৃতিক শোভায় বিবরণের মতোই তার পক্ষে সত্য ছিল। কোনো কোনো কবিতায়, যেমন উপরোক্ত উদ্ধৃতির অংশের "সেকাল" নামক কবিতাটি কালিদাসের যুগের কথা সচেতনভাবেই বলেছেন। কিন্তু অনেক কবিতায় কালিদাসের যুগের ইঙ্গিত স্পষ্ট বক্তব্যে বিবৃত হয়নি কিন্তু সে যুগের পরিবেশ ও ভাবনা কাব্যকে সমৃদ্ধ কবেছে।

নীলাঞ্জন ছায়া
প্রফুল্ল কদম্ব বন।
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বসন্ত বন-বীথিকা ঘন সুগন্ধ ॥
মন্থব নব নীল নীবদ পরিকীর্ণ দিগন্ত
চিত্ত মোর পন্থহারা কান্তবিরহ কান্তারে ॥

এখানে কোথাও কালিদাস, তাঁর কাব্য বা তাঁর যুগের উল্লেখ নেই; তবু কালিদাসের কালের দশম রত্ন হবার অভিলাষী কবির সে-যুগে অভিসারটি কি গভীর হয়ে ধরা পড়েছে। বাংলাকাব্যে প্রকৃতির রূপের আলোচনায় কালিদাসের কাব্যের এই সার্থকতা নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা হতে পারে।

কালিদাসের পরবর্তী অনেক বিখ্যাত সংস্কৃত কবি আছেন কিন্তু প্রকৃতির রূপের বর্ণনায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব বা বাংলা কাব্যের উপর তাঁদের প্রভাব অনেক ক্ষীণ। ঋগবেদ থেকে কালিদাস

পর্যন্ত কাব্যরূপের এই ধারাটি যে-প্রকৃতি লাভ করেছিল পরবর্তী সাহিত্যে মোটামুটি তারই অনুবর্তন চলেছে। ভবভূতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও বাণভট্ট, ভর্তৃহরি, অমরু থেকে আরম্ভ করে জয়দেব পর্যন্ত বহু কবি নানাভাবে বাংলা সাহিত্য তথা আধুনিক ভারতীয় সব সাহিত্যকেই অল্প বিস্তর প্রভাবিত করেছে। ভর্তৃহরি এবং অমরু-র কাব্যাংশ বা শতক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন কিন্তু প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনের দিক থেকে এ কাব্যগুলির উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব ছিল না এবং বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে এদের প্রভাবও নগণ্য। তবে বাণভট্টের "কাদম্বরী"ব একটি বিশেষত্ব বাঙালি কবিদের, বিশেষ করে ববীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল অন্য একটি বিশেষ কারণে। রবীন্দ্রনাথেব ভাষায়ই বলি। "কাদম্বরী"র অন্যান্য অনেক গুণের সঙ্গে ববীন্দ্রনাথ বর্ণাঢ্য প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনের বিশেষত্বটি লক্ষ্য কবেছেন।—

"এই বর্ণনার আর কোনো উদ্দেশ্য নাই, কেবল শ্রোতার চক্ষে একটি কোমল রঙ মাখাইয়া দেওয়া এবং তাহার সর্বাঙ্গে একটি স্নিগ্ধ সুগন্ধ ব্যঞ্জন ডুলাইয়া দেওয়া।…এমন বর্ণ সৌন্দর্য বিকাশের ক্ষমতা সংস্কৃত কোনো কবি দেখাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত কবিগণ লাল রঙকে লাল রঙ বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কাদম্ববীকাবের লাল রঙ কত রকমের তাহার সীমা নাই। কোনো লাল লাক্ষা লোহিত কোনো লাল পারাবতের পদতলের মতো, কোনো লাল রক্তাক্ত সিংহনখের সমান।…

রঙ ফলাইতে কবির কী আনন্দ! -যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সে রঙ শুধু চিত্রপটের রঙ নহে, তাহাতে কবিত্বের বঙ ভাবের রঙ আছে।"

বাণভট্টের অনুসারী সংস্কৃত সাহিত্যেও কোনো কবি নেই। বাঙলা সাহিত্যেও নেই। বাংলাতে 'কাদম্বরী'র সার্থক অনুবাদ হয়েছে কিন্তু বাণভট্টের ভাবশিষ্যেব জন্য বাংলা সাহিত্য আজও অপেক্ষা করে আছে।

বাংলা সাহিত্যে জয়দেবের প্রভাবের গুরুত্ব আছে। বিশেষ করে বৈষ্ণবকাব্য বাংলাসাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা। সে কারণে জয়দেব বহু বাঙালি কবির আদর্শ। রবীন্দ্রনাথও বৈষ্ণব কাব্যের পরিবেশকে তাঁর কাব্যে নূতনত্ব মণ্ডিত করেছেন। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হবে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ

বাঙলা সাহিত্যের প্রথম যুগ থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত সাহিত্য রচনার যে-সকল নিদর্শন আছে, তাদের মধ্যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের নিতান্ত অভাব। বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রচিত বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের অবশ্য প্রচলন ছিল এবং জনসাধারণ সকল প্রকার সাহিত্যের মধ্য থেকেই আনন্দ সংগ্রহ করেছেন, তারও নজীর আছে। কিন্তু এই বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের সকলেরই গোড়ার কথা ছিল "ধর্ম"। সাম্প্রদায়িক কোনো দেব বা দেবী মাহাত্ম্য কিংবা কোনো সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মতবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যেই সেকালে সাহিত্য রচিত হত। কাজেই সাহিত্য স্রষ্টার পক্ষে নিজের বিচিত্র কল্পনার স্বচ্ছন্দ প্রকাশের সুযোগ ছিল কম। সেকালের সাধারণ সাহিত্য-সেবীদের রচনা পূর্ববর্তী কোনো প্রতিভাশালী কবির অন্ধ অনুকরণে পর্যবশিত। বিষয়বস্তুর গতানু-গতিকতার মধ্যেও অবশ্য কোনো কোনো কবি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন, কিন্তু তাদের কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্র অত্যন্ত অপ্রশস্ত ছিল। সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্যের মধ্যে কবিত্ব সৃষ্টিতে বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদী সম্মত সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে সূচিত হলেও বহুক্ষেত্রে এই কবিরা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ধর্ম-নির্বিশেষ কাব্য সৃষ্টিতে এদের তুলনা বিরল। বৈষ্ণবগণ মানবীয় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁদের ধর্মসাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান 'প্রেম'। কাজেই বৈষ্ণবসাহিত্য ধর্মমূলক সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমসাহিত্যও হয়ে উঠেছে। এবং প্রেম সাহিত্যে কল্পনার অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র বাধাহীন। বাংলার গ্রামীন সাহিত্যও স্বকীয় কবিত্বের মর্যাদায় সমুজ্জ্বল। ধর্মের গোড়ামি সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে বাঙলার লৌকিক সাহিত্যের গ্রামীন কবিগণ গ্রাম্য উপাখ্যানগুলিকে কবিত্বের স্পর্শে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। একারণে ধর্মমূলক

সাহিত্যের প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ বিষয়বস্তুর গতানুগতিকতা তাঁহাদের কাব্য সৃষ্টিতে প্রবেশ করতে পারেনি।

প্রকৃতিপ্রেমের দিক থেকে বিচার করলে এই দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ কোনো নূতন সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রকৃতি চিত্র অঙ্কনের সাহায্যে কাব্যের অগ্রগতি, এমনকি প্রকৃতিপ্রেমের একটি সংলগ্ন ধারাও সাহিত্য থেকে প্রায় অনুপস্থিত। প্রকৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কাব্যবস্তুর অন্তর্ভুক্ত করবার ক্ষেত্রে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'এর কবি অপেক্ষা 'অন্নদা মঙ্গল' এর কবি কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে পারেন নি। অবশ্য ভাষা চাতুর্য এবং মাধুর্য বেড়েছে এবং প্রকাশ ভঙ্গি স্বচ্ছন্দতর হয়েছে। বিভিন্ন কবিদের প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয়ে কোনো সংলগ্ন ধারা বর্তমান নেই। উপরন্তু কাল হিসেবে কবিগণের পর পর সংস্থানের মধ্যেও সন্দেহের কারণ আছে। সেজন্য এই যুগের কবিদের ক্রমিক আলোচনা না পরিহার করে এই যুগকে কয়েকটি সম্প্রদায় নামাঙ্কিত বিভাগে ভাগ করে নেওয়াই উপযুক্ত। এইস্থলে বিভাগগুলি যথাক্রমে ঃ—(১) বৌদ্ধসাহিত্য, (২) বৈষ্ণবসাহিত্য, (৩) মঙ্গলকাব্য ও শাক্তসাহিত্য, (৪) অনুবাদ সাহিত্য, (৫) লোকসাহিত্য। শৈব সাহিত্যে নিছক সাহিত্যসৃষ্টির তেমন কোন উন্নত নিদর্শন নেই বলে শৈব সাহিত্যের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগের প্রয়োজন নেই।

(১) বৌদ্ধ সাহিত্য

চর্যাপদ ঃ—চর্যাপদে বৌদ্ধধর্মের সাধন ভজনের নিয়মাবলী এবং ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং প্রকৃতি চিত্রের উপস্থাপনের কোনো সাধারণ সুযোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় চর্যাপদগুলিতে নেই বললেই চলে। দু এক স্থানে রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের অবতারণা করা হয়েছে মাত্র। যেমন

চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ।
চিঅ বকরণে তহি টলি পই সই ॥'

অর্থাৎ, চন্দ্র অস্তগত হলে যেমন জ্যোৎস্নাও তার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়, সেরূপ চিত্ত সহজে লীন হলে যাবতীয় বিকল্পদোষ তিরোহিত হয়।

এখানে অবশ্য কবিত্ব সৃষ্টির ক্ষীণ চেষ্টাও নেই। (চর্যাপদের অন্য একটি পদে একটি রূপকাত্মক নিসর্গের অবতারণায় ক.ব বলেছেন, 'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা' অর্থাৎ, জলের মধ্যে প্রতিফলিত চন্দ্র যেমন সত্যও নয় মিথ্যাও নয়! যে গভীর তত্ত্বের ব্যাখ্যায় এই পঙতিটি ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রবেশ করা হয়তো বা দুসাধ্য তথাপি 'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা' পংক্তিব রচয়িতার কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রকাশ ভঙ্গিব গৌববে আমাদের মনকে নাড়া দেয়। এই প্রকার দু একটি রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র ছাড়া নিসর্গপ্রীতির আর কোনো বিশেষ পরিচয় চর্যাপদগুলিতে নেই।)

শূন্যপুরাণঃ—শূন্যপুবাণে একটি গল্পাংশ আছে। কিন্তু এটি প্রধানত পূজাপদ্ধতি এবং পূজাপদ্ধতিতে প্রকৃতি চিত্র না থাকা নিন্দার্হ নয়। 'শূন্যপুরাণে' সৃষ্টিব পূর্ব্বেব অবস্থা বর্ণনায় কবি বলেছেন,—

নাহি বেক নহি রূপ নহি ছিল বর্ন্ন চিন্।
ববি সসী নহি ছিল নহি রা।ত দিন॥
নহি ছিল জল স্থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দাব নছিল নছিল কৈলাস।...
দশ দিক পাল নহি মেঘ তারাগণ॥'

—এই রূপবেখা, বর্ণচিহ্ন রবিশশী, রাত্রিদিন এবং জলস্থল আকাশহীন ও মেরুমন্দার-কৈলাস-বিবর্জিত, দশদিকপাল ও মেঘতারারহিত দৃশ্যের বর্ণনায় পাঠকের মনে মহাশূন্যের কোনো ভাব সৃষ্ট হয় না। বর্ণনাটী শুধুই সংবাদবাহী। তবে 'মেরু মন্দার নছিল নছিল কৈলাস' কথাটিতে যেন মহাশূন্যের বিরাটতত্ত্বের কিছুটা আভাস আনবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কতগুলি বিরাট্ বস্তুর অনুপস্থিতির দ্বারা অন্য বিরাটের রূপ বর্ণনার চেষ্টা প্রশংসনীয়।

'শূন্যপুরাণে'র একস্থানে পাতালের নদী বৈতরণীর বর্ণনা আছে। পা।তালের নদী বর্ণনায় যে রহস্যময় আবহাওয়ার অবশ্যম্ভাবী ছিল কবি কিন্তু সে সম্বন্ধে নির্বিকার। বাঙলা দেশের পুষ্প-কানন শো।ভিত কোনো একটি নদীর বর্ণনার সাহায্যে কবি বৈতরণীর রূপ দিতে চেষ্টা

করেছেন। ষোলক্রোশ বৈতরণীর তীরে বিশ্বকর্মা রোপিত নানাবর্ণের পুষ্পবৃক্ষ, ধারে ধারে কদলীবৃক্ষ, জলে রঙীন মৎস্য ক্রীড়া করছে এবং তটভূমি বৃক্ষ শাখাশ্রিত সুকণ্ঠ পাখির কলরবে মুখরিত। পাতালের অদেখা রহস্য ভূমির কোনো পরিচয় এ বর্ণনায় নেই।

ঋতু বর্ণনার স্থানও 'শূন্যপুরাণে' অতি অল্প। মাঝে মাঝে কয়েকটি ফুলের তালিকা দ্বারা কোনো ঋতুর পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির মত শূন্যপুরাণে বারমাসিয়াও স্থান পেয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঋতুবর্ণনার ক্ষীণ চেষ্টাও তাতে দেখা যায় না। কেবলমাত্র নায়িকার দুঃখ বর্ণনাই ঋতু এবং মাসের নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে—বিভিন্ন ঋতুগুলির নৈসর্গিক বিশেষত্ব অঙ্কনের প্রয়াস এতে নেই। গ্রন্থের শেষভাগে একটি বসন্ত বর্ণনা আছে। বর্ণনাটি গতানুগতিক কিন্তু পূজাপদ্ধতি ব্যাখ্যার শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে পাঠকমনের নিকট যেন একটি স্নিগ্ধ মরুদ্যানের মতো।

'দখিনা পবন বহত্র ঘনঘন
আসিয়া বসন্তকালে।
শিখিগণ মেলি করএ কুতহলি
তাণ্ডব করোন্তি জলে॥
মন অভিলাস জত রাজ হাঁস
চাতক চাতকী ডাক।
খঞ্জনা খঞ্জনী করে নানা ধুনি
উড় বৈসএ ঝাকে ঝাক॥'

বসন্তের আনন্দ প্রকাশের চেষ্টা পুরোপুরি বিফল হয় নি। এই ধরণের বর্ণনা পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যে রাশি রাশি আছে। কিন্তু একজন আদি কবির গৌরব তাতে ক্ষুন্ন হয় না।

ময়নামতীর গান ঃ—(ক) গোপীচন্দ্রের গান ঃ গোপীচন্দ্রের গানে রূপবর্ণনায়, নর অথবা নারীকে চন্দ্রের সহিত তুলনার প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়। গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর কথোপকথনের সময় কবির উক্তি,

'মায় পুতে কথা কয় ভর পুন্নিমার চান।'

একই ভাব এবং ভাষায় এই চিত্রটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। গোপীচন্দ্রকে রূপে মুগ্ধ করে সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে বিরত করবার জন্য রাণীর রূপসজ্জার বর্ণনায় রূপের উগ্রতাকে সূর্যের ছটার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

'এই খোঁপা পিন্ধিয়া রাণি রূপের দিকে চায়।
রাণির ছটায় সুজ্যের ছটায় এক লাগ্যপায়।।'

অন্যস্থলে গোপীচন্দ্রের রূপ বর্ণনার ভাষা—

'হাতে পদ্দ পাত্র পদ্দ কপালে রতন জলে।'

গোপীচন্দ্রের হস্তপদাদির সৌন্দর্য বর্ণনায় কবিত্বসৃষ্টির এই অপরিণত প্রয়াস প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্যে কবিত্বে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারত। একস্থানে রাজার চক্ষুর তুলনা।

'চক্‌খু দুটা স্থাখা জাএছে জ্যান সরগের তারা'

চক্ষুর সঙ্গে স্বর্গের তারার তুলনায় আমাদের মনে খুব উজ্জ্বল কোন চিত্রের উদয় হয় না সত্য কিন্তু পবিত্রতা এবং দূরত্বের গভীরতার আভাস হয়তো জাগিয়ে তুলতে পারে।

সৌন্দর্য বর্ণনা ছাড়া যে কটি রূপকাত্মক নিসর্গচিত্র 'গোপীচন্দ্রের গান'এ স্থান পেয়েছে, তাদের অধিকাংশই কবিত্ববর্জিত অথবা ভাব ও ভাষায় গতানুগতিকতার অনুগামী। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত স্থানগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে,

'দুই চক্‌খে দুকনা আকালি স্থাও ভাঙ্গিয়া।
আষাঢ় শ্রাবণ স্থাওরা যাইবে বরসিয়া।।'

অথবা.

'সগ্‌গে জ্যামন ঘিরি নিছে একশত তারাগণি।
সেইমত খেতুয়াক ঘিরি নিল একশত মহারাণী।।'

কবিত্ব সৃষ্টির ক্ষীণ চেষ্টা আছে তবু ভাষার অক্ষমতা প্রকাশভঙ্গির দৈন্য সহজেই চোখে পড়ে। একস্থানে অবশ্য একটি সুন্দর রূপকাত্মক

নিসর্গের বর্ণনা আছে। সন্ন্যাস গ্রহণোদ্যত গোপীচন্দ্রকে ভুলিয়ে গৃহে বদ্ধ রাখার জন্য রাণীর আকুল মিনতির ভাষা,

'তুমি হমু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়া যাবু কোথা ॥'

কালিদাসের কাব্যে সহকার তরুর প্রতি লতিকার একান্ত নির্ভর, নারী সৌন্দর্যের লতিকা সুলভ কমনীয়তা প্রভৃতির বৃহত্তর উল্লেখ আছে। এখানেই সেই চিত্রগুলির সৌন্দর্যের ইঙ্গিত কিছুটা স্পষ্ট। উপরন্তু রাণীর আক্ষেপের সুর উক্ত চিত্রসৌন্দর্যের সঙ্গে মিশেছে বলে কবিত্ব সৃষ্টিতে মধুরতার আভাস আছে। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় 'কঙ্ক ও লীলা'র উপাখ্যানে প্রায় একই ভাব এবং ভাষায় এ চিত্রটি প্রযুক্ত হইয়াছে,

'তুমি হও তরুরে বন্ধু আমি হই লতা।
বেইড়া রাখব যুগল চরণ ছাইড়া যাইব কোথা ॥'

প্রকৃতি বর্ণনার স্থানগুলির মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নেই। প্রভাতকালে কোকিলের ধ্বনির উল্লেখ গোপীচন্দ্রের গানে অনেকবার আছে। বর্ণনার মধ্যে শ্বেত কাকের অবতাবণায় এই অঞ্চলের পক্ষে অস্বাভাবিক নূতনত্ব,

'আত্রি করে ঝিকির্মিকি কোকিলা করে রাও।
শেতকাওয়া বলে রাত্রি প্রোহাও প্রোহাও ॥'

'গোপীচন্দ্রের গানে'র মধ্যে সহানুভূতিশীল নিসর্গের বর্ণনা কিছু কিছু আছে। রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় রাণীদের দুঃখে সহানুভূতিশীল প্রকৃতি চিত্র,

'গাছ কান্দে গাছানি কান্দে গাছের কান্দে পাতা।
বনের হরিণী কান্দে হেট করিয়া মাথা ॥'

এই অংশগুলির কবিত্ব পূর্ববর্তী সাহিত্যে বহুল ব্যবহারে মলিন।

(খ) গোপীচন্দ্রের পাঁচালী ঃ 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী'তেও সৌন্দর্যের উপমান সাধারণত পূর্ণিমার চন্দ্র কিন্তু নারীব রূপ বর্ণনায় এ কবি

পূর্বোক্ত কবি থেকে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বেশি পরিচিত তার প্রমাণ আছে।

'খঞ্জন গমনে যায় রাজার গোচরে।

অথবা,

'কেশেতে ধরিল পুনি মেঘর লক্ষণ।
কেশরী জিনি ক্ষীণ মাঝা জগত শ্রবণ ॥'

ইত্যাদি ধরণের রূপবর্ণনা গোপীচন্দ্রের গানে অনুপস্থিত। সৌন্দর্য বর্ণনা ছাড়াও কয়েকটি রূপকাত্মক নিসর্গচিত্র এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 'গোপীচন্দ্রের গান'এর মত সেগুলি অধিকাংশই গ্রাম্যতা দুষ্ট; কবিত্বসৃষ্টিতে এদের স্থানও পূর্বোক্ত কবির রচনা থেকে সরস কিনা সন্দেহ, তবে মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে অধিক পরিচয়ের প্রমাণ এদের মধ্যে রয়েছে।

'বনে থাকে হরিণী বনে ঘর বাড়ী।
প্রেমের কারণে কাকে কেহনা জাত্র ছাড়ি।
সর্বদিন চরা করে বনের ভিতর।
সন্ধ্যাকালে চলি জাত্র আপনা বাসর ॥
হরিণা জাত্র আগে আগে হরিণী জাত্র পাছে।
সর্ব দুঃখ পাসরএ স্বামী থাকে কাছে ॥'

স্বামী সোহাগিনী নারীকে হরিণীর সহিত তুলনায় এই দীর্ঘচিত্রের অবতারণায় পূর্বোক্ত কবি থেকে এই কবির শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করা যায়।

'কচু পাতার পানি জেন করে টলমল।
তেন মত যাবে তোমার যৌবন সকল ॥'

এই উপমাতে চিত্রটি গ্রামীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে কচু পাতার পানি, পদ্মপত্রে নীর হয়ে ওঠেনি। আক্ষেপের মধ্য দিয়ে রূপকাত্মক প্রকৃতির অবতারণা 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী'তে অজস্র। তবে তাদের মধ্যে চিত্রসত্তার অত্যন্ত অল্প, আক্ষেপের ভাবই প্রবল। সন্ন্যাস গ্রহনেচ্ছু গোপীচন্দ্রের প্রতি রাণীদের আক্ষেপে।

'জদি মণি মুক্ত হৈত হার গাঁথি গলে দিত
পুষ্প নহে কেশেতে রাখিতুম।'

অথবা,

'যেই দেশে গেলা তোমি · সেই দেশে যাবে আমি
পক্ষী হইয়া দেখিমু উড়িয়া।'

এই আক্ষেপের সুর বৈষ্ণব কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নিছক প্রকৃতি বর্ণনায় 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী'র বিশেষত্ব নেই। প্রভাতের দুই একটি ক্ষুদ্র বর্ণনায় কবিত্বের স্পর্শ লাগে নি। পূর্বোক্ত কবির রচনার মতো শ্বেত কাক এবং কোকিলের উল্লেখও এগুলিতে অনুপস্থিত। ঋতুবর্ণনাও কেবলমাত্র ঋতুর নামোল্লেখেই পর্যবসিত হয়েছে।

'আষাড যে শ্রাবণ ঘন দেওয়ার বরিষণ
ধাইয়া জাইবা বৃক্ষতলে।
সেগাছের টোফান্যাপানি ভিজিবেক মাথাখানি
অপমানে তেজিবা জীবন॥'

ঋতুবর্ণনা অপেক্ষা আক্ষেপ এবং ব্যবহারিকতার সুরই এস্থানগুলিতে প্রবল।

দু একটি সহানুভূতিশীল প্রকৃতি চিত্র অঙ্কনের ক্ষীণ প্রচেষ্টাও এ গ্রন্থে আছে। সেগুলি গতানুগতিকতার স্পর্শে মলিন,

'পদুনার কান্দনে সমুদ্রে উজান ধরে।'

অথবা,

'আমার কান্দন বানে কান্দে পশু-পক্ষিগণে
তোমার কঠিন বড় হিয়া।'

মানুষের কান্নায় পশুপক্ষীর অশ্রু ঝরার বহুল বর্ণনায় এ প্রকার চিত্রের মধ্যে নূতনত্বের আস্বাদ বহু পূর্বেই লুপ্ত হয়েগিয়েছে।

(গ) গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস: সৌন্দর্যবর্ণনায় 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'এর কবি উপরোক্ত দুই কবি হইতেই সংস্কৃত প্রভাবের অধিক পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যের কোকিল কণ্ঠের অধিকারিণী নারীগণ খঞ্জন গমনে চলে। তাদের নাসিকা তিল ফুলের মতো, আঁখি কুরঙ্গলোভন, নখ চম্পককলিকাতুল্য, অধর পদ্মের ন্যায় এবং দশন মুক্তার সাদৃশ্য। মূলহীন ইক্ষুর মতো তাহাদের দুই বাহু,

কমলকুড়ির মতো বক্ষস্থলে নায়কের জন্য ভালোবাসা সঞ্চিত হয়ে আছে, তাদের উরুযুগল রামকদলী এবং কিঞ্চিৎ হাসিতে তারা ঝলসিত। বাহুর সহিত মূলহীন ইক্ষুর তুলনা আর কোথাও দেখা যায় নি। কমলকুড়ির সঙ্গে বক্ষস্থলের তুলনা কবির মৌলিক চিন্তা-প্রসূত নয়। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সাহিত্যে এই তুলনাটির ব্যবহার নিতান্ত অল্প নয়। নারী বক্ষের কুসুমসুলভ কোমলতা আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকেও সমৃদ্ধ করেছে,—

'আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি,
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুলদুটি।'

"অনাঘ্রাত পূজার ফুল" কথাটির মধ্যে অপূর্ব শুচিতার ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রটি তুলনাহীন। অনাঘ্রাত ফুলের সহিত শকুন্তলার সমগ্র সৌন্দর্যের তুলনা কালিদাসের কাব্যে আছে, 'অনাঘ্রাতং পুষ্পম'। নারীর কপালের সিন্দুর বিন্দুতে প্রভাতসূর্যের রক্তিমাভার সন্ধান পেয়েছেন অনেক কবি। 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে'ও,

'ললাট দ্বিতীয় চন্দ্র ভূষণ মদন ফন্দ
সেন্দুরে উদিত দিনকর।
মৃগমদ চারি পাশে রাহু যেন ভানুগ্রাসে
তাথে যেন বসিল ভ্রমর॥'

ভাষা এবং চিত্রের দিক দিয়ে উদ্ধৃত অংশটি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব এবং মুকুন্দরাম প্রভৃতির কবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সূর্য এবং রাহুর সঙ্গে ভ্রমরের একত্র সমাবেশ চিত্রটিতে আনুপাতিক সম্বন্ধহীনতা এনে দিয়েছে। সৌন্দর্যবর্ণনা ব্যতীত অন্যান্য রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রের বর্ণনায় 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'এর কবি পূর্বোক্ত দুই কবির মতোই বিশেষত্বহীন। উল্লেখ করবার মতো কোনো কবিত্ব এ কাব্যেও বেশি নেই।

'পতি বিনে নারী যেন ধুতুরার ফুল।'

এই উপমাটির মধ্যে গ্রামীন সংস্কৃতি এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে। অন্য একস্থানে,

'আষাঢ় শ্রাবণে গঙ্গা উথলে সাগর।
চৈত্র মাসেতে গঙ্গা দেয় বালুচর॥
ধন যৌবন যত দেখ জোয়ারের পানি।
আসিবার কালে দেখি যাইতে না জানি॥'

এই চিত্রটিও সংস্কৃত কাব্যের থেকে পাণ্ডিত্যলব্ধ প্রকাশ নয়, অথচ বিষয় বস্তু চিত্রের সাহায্যে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আক্ষেপের মধ্য দিয়ে রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্র দু-একটি আছে।—

'পতি হবে পরবাস কিবা তার জীবনের আশ
জল বিনা মৎস্যের কি জীবন।
দিবসে জুড়ায় বাতি যেন আমাবস্যার রাতি
কি করিবে স্বর্গের তারাগণ॥'

প্রকৃতি চিত্রের পরিচয় এখানে অত্যন্ত ক্ষীণ। বারমাসিয়ার অনুরূপ একটি আক্ষেপোক্তির মধ্যে একস্থানে ঋতুবর্ণনার প্রয়াস করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন ঋতুর প্রাকৃতিক বিশেষত্ব তাতে প্রায় নেই। বর্ণনাগুলি উগ্র ব্যবহারিকতায় পূর্ণ। এগুলি বিভিন্ন মাস এবং ঋতুতে স্বামীর সঙ্গসুখ এবং স্বামী বিরহের দুঃখের ভারাক্রান্ত বর্ণনায় পর্যবসতি। সহানুভূতিশীল অথবা নির্বিকার নিসর্গের কোনো উদাহরণও এ কাব্যে নেই।

(২) বৈষ্ণব সাহিত্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রকৃতিপ্রেমের নিদর্শন প্রধানত রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রে প্রকাশিত হয়েছে। আবার এই রূপকাত্মকতা কেবলমাত্র নারী অথবা পুরুষের সৌন্দর্য বর্ণনায়ই পর্যবসিত।) সংস্কৃত সাহিত্যের আদি গ্রন্থাদিতে পুরুষের রূপ বর্ণনায় প্রকৃতি থেকে সাহায্য গ্রহণের নিদর্শন তুলনায় স্বল্প, কারণ পৌরুষ ফুটিয়ে তুলতে নারীরূপে কল্পিত প্রকৃতির আনুপাতিক অক্ষমতা। "শালপ্রাংশু" প্রভৃতি অল্প কয়েকটি উদাহরণ ছাড়া প্রকৃতি পুরুষোচিত

বৈভব লাভ করেনি। (বৈষ্ণব সাহিত্যে কিন্তু একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রাধা এবং কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা প্রায় সমধর্মী প্রকৃতি চিত্র থেকে আহৃত হয়েছে। মাঝে মাঝে যদিও 'মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল', ইত্যাদি বলে শ্রীকৃষ্ণের পৌরুষের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, তবুও শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি থেকে আহৃত নারী সৌন্দর্যের উপমান গুলিতেই বিভূষিত।) বাঙালি চরিত্রের কোমলতা হয়তো এর জন্য বহুলাংশে প্রভাব বিস্তার করেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার রূপ বর্ণনার প্রাচুর্যই আছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম রূপ বর্ণনা.

'ওষ্ঠ আধব যেহ্ন যমজ পোঁয়ার।
কর্ণযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল ॥
ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।
কর কুন্দবিন্দমাল নির্মিত কমলে ॥
ক্ষীণমধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল ॥
মাণিক রচিত চন্দ্রসম নখপান্তী ॥
সজল জলদরুচি জিনি দেহকান্তী ॥

এ-বর্ণনা থেকে দু-একটি পংক্তি বাদ দিলে সুন্দরী নারীর ক্ষেত্রে অনায়াসেই প্রযুক্ত হতে পারত। 'রামরম্ভাজংঘ', 'চন্দ্রসম নখপান্তী' ইত্যাদি বর্ণনায় সংস্কৃত সাহিত্যের ঋণ সাধারণ পাঠকেব দৃষ্টিও এড়িয়ে যায় না। ওষ্ঠ যুগলের সহিত প্রবালের তুলনা পরবর্তী সাহিত্যে অনেক কবিকে প্রলুব্ধ করেছিল। বিদ্যাপতিতে আছে,

'অধর সুরঙ্গ জনি নীরস পবার।
দুধক পবসে পবার ধবল ভেল ॥'

গোবিন্দদাসের একটি পদেও দেখতে পাই,

'অধব পঙার দশণ মণিমোতি।'

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার উল্লেখযোগ্য আর মাত্র দু-একটি উদাহবণ আছে। দুটিই রাধিকার উক্তি,

'দেহ নীল মেঘছটা গন্ধচন্দনের ফোঁটা
যেন উয়ে গগনে চান্দগোটা।...

নির্মল কমল বয়নে   নীল উৎপল নয়নে

রতন কুণ্ডল শোভে কর্ণে ।।'

এবং

'সংপুন শশধর বদনে।

কমল লোচন পাপ বিমোচনে ।।'

দুটি উদাহরণেই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সিন্দুর বিন্দুর সহিত নবোদিত সূর্য এবং চন্দনের ফোঁটার সহিত চন্দ্রের তুলনা পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে অজস্র। মুকুন্দরামের কাব্যেও একাধিকস্থানে এই চিত্রটি প্রয়োগ করা হয়েছে।—

'ললাটে সিন্দুর   তম করে দূর

যেন প্রভাতের ভানু।

চন্দনের বিন্দু   তাহে কিবা ইন্দু

হৈতে অকলঙ্কী তনু।'

সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণের নয়নকে খঞ্জনের সঙ্গে তুলনায়ও কবি সংস্কৃত প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন।

'কাজলে উজল নয়ন যুগল

খঞ্জনকে উপহাসে।'

প্রথম বর্ণনাটির "দেহনীল মেঘছটা" অংশটি পরিত্যাগ করলে দুটি বর্ণনাটি পরিপূর্ণভাবেই রাধিকার রূপের তুলনায় প্রযুক্ত হতে পারত। শ্রীকৃষ্ণের আর কোনো উল্লেখযোগ্য বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে নেই। প্রথমে উল্লিখিত রাধিকার রূপ বর্ণনাটি সুন্দর এবং কবিত্বপূর্ণ,

'শিরীষ কুসুম কোঁঅলী।

অদভুত কনক পুতলী ।।

দিনে দিনে বাঢ়ে তনুলীলা।

পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা ।।'

এই বর্ণনার প্রথম পংক্তি রাধিকার কোমলতাকে মাত্র একটি কথার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র অন্যস্থানে রাধিকার উক্তিতেই তাকে শিরীষ ফুলের মত কোমল বলা হয়েছে,

'শিরীষ কুসুম সম আঙ্গে কোঁঅলী।'

নায়িকাদের কোমল অঙ্গকে শিরীষ কুসুমের সহিত তুলনা কালিদাসেও আছে।—

'শিরীষ পুষ্পাধিক সৌকুমার্য্যৌ'

—কুমারসম্ভব

পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের নিকটও এই উপমাটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বিদ্যাপতিতে,

'সিরিসি কুসুম কোমল ও ধনি
শিরিষ কুসুম তনি অতি সুকুমার ধনি।

পদাবলীর চণ্ডীদাসেও রাধিকার দেহ,

'শিরীষ কুসুম জিনিয়া কোমল
পাছে বা গলিয়া পড়ে।'

গোবিন্দদাসের রাধিকাও,

'শিরীষ কুসুম জিনি
তনু অতি সুকোমল।'

মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে খুল্লনার রূপের পরিচয় দিয়েছেন,

'শিরীষ কুসুম তনু অতি অনুপম।'

ক্রমবর্ধমান তনুলীলার সঙ্গে চন্দ্রকলার তুলনা কবিত্বপূর্ণ হইলেও বহুল ব্যবহারে বিশেষত্ব বর্জিত হয়ে পড়েছিল। বাধিকার আরও অনেক রূপ বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইতস্ততঃ প্রযুক্ত হয়েছে। সৌন্দর্য বর্ণনার কোনো সুযোগই কবি উপেক্ষা করেন নি, সৌন্দর্যেই উপাদানগুলি কবি প্রকৃতিচিত্র থেকে নিজস্ব উদ্যমে সংগ্রহ করেন নি, সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ধার করেছেন। উপমা, উৎপ্রেক্ষা রূপক, ব্যতিরেক ইত্যাদি নানা অলংকারের সাহায্যে কবি রাধিকার একটি পরিপূর্ণ সুন্দর মূর্তি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসী। কিন্তু অলংকারগুলি বহুল ব্যবহারে একটি গ্রন্থের কলেবরের মধ্যেই একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। তবে মাঝে মাঝে নিজস্ব রীতিতে বর্ণনা নেই তা নয়। কবিসুলভ সে সব অংশই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতাকে কবিসমাজে

প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত পংক্তি কটিব উল্লেখ করা যেতে পারে,

'নীল জলদ সম কুন্তল ভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা ॥
শিশত শোভত্র তোর কাম সিন্দর।
প্রভাত সমত্র যেন উয়ি গেল সুর ॥'

মেঘ কুন্তলের দেহে চম্পকরূপ বিদ্যুতের দ্যুতি—এই চিত্র পরিকল্পনায় কবি নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। সিঁথির সিন্দূরের সহিত নবোদিত সূর্যেব তুলনা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এ নিতান্ত অপ্রচুর নয়। পদাবলীর চণ্ডীদাসের রচনায়ও,

'সিঁথায় সিন্দুর জিনিয়া অরুণ।'

রাধিকার দেহের সৌন্দর্য একটি ব্যতিরেক অলংকারের সাহায্যে বর্ণনা করার প্রয়াস কবিত্বপূর্ণ। এই ব্যতিরেক অলংকারের বহুল ব্যবহার ভারতচন্দ্রের কাব্যে এসে আতিশয্যে ভারাক্রান্ত।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে,

'ললিত আলোক পাঁতি কাঁতি দেখি লাজে।
তমাল কলিকা ফুল রহে বনমাঝে ॥

রাধিকার অঙ্গকান্তি নবোদ্গত তমাল কলিকার কমনীয়তা অতিক্রম করেছে। তমাল বৃক্ষের সহিত বাধাকৃষ্ণ লীলার সংস্কৃতি আমাদের মনে জাগ্রত থাকায় অলংকারটি বিশেষভাবে সার্থক। অন্যত্র,

'কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।
ওষ্ঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল ॥'

অধরের সঙ্গে বাঁধুলী পুষ্পের তুলনা নূতন নয়, কালিদাসের কাব্যে এবং পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে এর বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। কপোলের পাণ্ডুরতা বুঝাইবার জন্য মধুকপুষ্প বা মহুয়াফুলের সাহায্য গ্রহণ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'ও আছে,

'বন্ধুকদ্যুতি বান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধ মধুকচ্ছবি
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিন শ্রীমোচনং লোচনম্।'

অর্থাৎ, হে কোপনে! হে প্রিয়তমে! তোমার অধর লোহিতবর্ণ বন্ধুক কুসুমের মতো, বিরহে পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থল মধূক পুষ্পবৎ বিরাজ করিতেছে। তোমার নেত্রদ্বয় কুবলয় শোভাজয়ী।— 'মৈমনসিংহ গীতিকা'ও,

'সুন্দর বদন যেন মহুয়ার ফুল।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকার রূপ বর্ণনার আর একটি সুন্দর উদাহরণ,

'লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।'

আনুপাতিক সম্বন্ধের সুষ্ঠতা এবং কবিসুলভ প্রকাশভঙ্গিতে এই পংক্তিটির মূল্য অপরিসীম। শৈবালের সহিত কুন্তলের তুলনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির পূর্ববর্তী সাহিত্যে আর কোনো কবি ব্যবহার করেছেন বলে জানা নেই। লাবণ্যের সঙ্গে জলের তুলনাও লাবণ্যের তরলতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। অন্য একস্থলে রাধিকার নাভিকূপের গভীরতাব সহিত প্রয়াগের তুলনাও কবির মৌলিক বলে মনে হয়।—

'নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপমা।'

কালিদাসের কাব্যে অবশ্য নাভিকূপের সহিত জলাবর্তের তুলনা আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্য একস্থলে রাধিকার রূপবর্ণনারশ্রীকৃষ্ণের উক্তি,

'তোর রূপ দেখি সবজন মোহে
রঞ্জরে সুখান কাঠে।'

নারীর রূপ দেখে শুষ্ক কাষ্ঠে মঞ্জরী ধরার মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে তবু পংক্তিটিতে কবির নিসর্গপ্রীতির একটি বিশেষ দিকের সন্ধান আছে। নিসর্গকে অনুভূতিসম্পন্ন করে আঁকার ক্ষীণ হলেও আমাদের দৃষ্টিপ্রলুব্ধ করে।

'নেয়ালী শেআলী মাহলী বিকসে।
তোমার মধুর ঈষৎ হাসে॥

বাধিকার হাসিতে নবমালিকা, শেফালি এবং মালতি কুসুম প্রস্ফুটিত হবার মধ্যেও অনুরূপ প্রচেষ্টাই দেখা যায়।

(প্রকৃতির মধ্যে নারী-সৌন্দর্যের যে সকল উপাদান এবং উপমান

কবিদের চোখে ধরা পড়েছিল তাহার প্রায় অধিকাংশই 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে'র কবি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ধার করেছেন। সংস্কৃতকাব্যের নায়িকাদের মতোই তাঁর রাধিকার নীল জলদ সম চিকুর; চক্ষু নীলউৎপল, কুরঙ্গ বা খঞ্জনের সাদৃশ্যে সুন্দর; কপাল আধশশীজয় করে; ওষ্ঠ বন্ধূলী পুষ্প বা বিম্বফলের তুলনা, নাসিকা তিলফুলের মতো, কণ্ঠ কম্বুর ন্যায়, বক্ষ কমলকলিকা বা চক্রবাক্দম্পতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নায়িকার নাভি ঈষৎ স্ফুটিত পদ্ম। সিংহসদৃশ মধ্যদেশ, করিকর বা রামকদলী উরু, মৃণালবাহুর চম্পকঅঙ্গুলিতে চন্দ্রের ন্যায় নখকান্তি নিয়ে এবং করিরাজ বা রাজহংসের গমনের অনুকরণে, কালসাপ ভ্রূর চঞ্চল বিলাসে ও মুকুলিত কুন্দদশনের মধুর হাসিতে সে নায়কের হৃদয় জয় করে। বৃন্দাবনখণ্ডে নানা পুষ্পে কুঞ্জ সাজিয়ে বনমালী যখন রাধিকার যৌবন ভিক্ষা করছেন, তখন কবি রাধিকার প্রত্যেক অঙ্গের সহিত বিভিন্ন পুষ্পের তুলনা করেছেন। রূপ বর্ণনার শেষে,

'দেখোঁ মো তোর এ ফুল শরীরে।'

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিটি পার্বতীর রূপবর্ণনায় কালিদাসের—'বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী'র মতো কৃতিত্বপূর্ণ। পুষ্পরাজ্য থেকে রাধিকার বিভিন্ন অঙ্গের উপমান সংগ্রহেও কবি স্থানে স্থানে মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন। নারীসৌন্দর্য ছাড়াও কয়েকটি রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র পরিচয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আছে। পরোক্ষভাবে নারীর দেহ-লাবণ্যের ইঙ্গিত দেওয়াই অবশ্য সেগুলির উদ্দেশ্য। নায়কের সঙ্গে ভ্রমর, নায়িকার সহিত কোন পুষ্পের এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কা নায়িকাকে কালিকা বা মুকুলের সহিত তুলনা, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এ একাধিকবার প্রযুক্ত হয়েছে,

'চাঁপাকুড়ী দেখিতে রূপসে।
তাত নাহি গন্ধের পরসে॥
বিকসিলেঁ মোহে মুণি মনে।
হেন সব নারীর যৌবনে॥'

অথবা,

'উচিত কমলে ভোগ করয়ে ভ্রমরে।
আম্বার মুকুলে নাহি পাত্র মধুভরে॥'

মালতী এবং মধুকরের সাহায্যে বিদ্যাপতি এই চিত্রটিকেই রূপ দিয়েছেন,

'মালতি, সফল জীবন তোর।
তোব বিবহে ভুবন ভময়ে ভেল মধুকর ভোর॥'

শুধু তাই নয় পদাবলীর চণ্ডীদাস, বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র সকলেই বিভিন্ন ভাষায় এই চিত্রটির দ্বারা নায়ক নায়িকার সম্বন্ধের ইঙ্গিত কবিয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এ রাধায় বক্ষোস্থিত হারের তুলনা,

'কনককুম্ভ আকারে তুঙ্গতোর পয়োভাবে
তাহাব উপর গজমুকুতার হাবে।
যেহ্ন শোভা কবে সুমেরু গঙ্গার ধারে
তাক দেখি মোর পাত্র আগুনাহি সরে॥'

বামায়ণে অপহ্রিয়মানা সীতাব কণ্ঠ থেকে যখন মোতিমালা ছিন্ন হয়ে ভূতলে পতিত হচ্ছিল তখনও কবি তাকে গঙ্গাব সহিত তুলনা করেছিলেন।

বিদ্যাপতিতে আছে,

'পীন পয়োধর অপরূপ সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার॥'

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'এও,

'তোর কুচে অনুপাম মণিমুকুতার দাম
মেরুশৃঙ্গে বহে মন্দাকিনী।'

নৌকাখণ্ডে সজ্জিতা রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম নিবেদনের ভাষা,

'মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝারে।
তহিত নক্ষত্রগণ গজমতীহার॥
তাত তিখ নখরেখ চান্দের আকার।

কুচরূপ গগনমণ্ডলে নখরেখাকে চাঁদের সহিত তুলনা বিদ্যাপতিতে অজস্র। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'ও,

'ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে
মৃগমদরুচিরূষিতে।
মণিসরমমলং তারক পটলং
নখপদ-শশি-ভূষিতে।

অর্থাৎ—'সেই কামিনীব কুচযুগল আকাশমণ্ডলের ন্যায়। উহা কস্তুরীরসে অনুলিপ্ত ও সঘন, তদুপরি নখাঘাত চন্দ্র বিরাজ করছে। বনমালী তাতে মণিহার স্বরূপ নক্ষত্রমালা সংযোজিত করে দিচ্ছেন।'

কেলি-নিরত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তিব তুলনায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর কবিব ভাষা, 'মেঘত-উপর যেহ্ন শোভে শশিকলা' অথবা 'নীলমেঘে যেহ্ন পড়এ বিজুলী; শ্রীকৃষ্ণেরচূড়ায় ময়ূব পুচ্ছটিব তুলনা, 'শক্রেব ধনু যেন উয়িল আকাশে।' এই উপমাগুলি পরবর্তী বৈষ্ণবকবিদেরও প্রলুব্ধ করেছিল। পদবলীর চণ্ডীদাস রাসমিলন বর্ণনায় উপরোক্ত চিত্রগুলির সাহায্যেই যুগলমূর্তিব রূপ অঙ্কিত করেছেন।—

'মেঘের উপর চাঁদ ফলিয়াছে
হেরনা আসিয়া দেখ।'

অথবা,

'যেমন জলদ সোনার বিজুরী
তেমতি দেখয়ে আভা।'

এবং,

'যেমন আকাশে আসিয়া বেড়ল
ইন্দ্রধনু দিল দেখা।'

শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-প্রস্তাব শ্রবণে শঙ্কিতা রাধাব চিত্রটি একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে,

'ভএ কাম্পো যেন নব কদলীর বালী।'

নবোদিন্ন কদলীপত্রের কম্পনের সহিত তুলনায় শুধু যে রাধিকার শঙ্কাই প্রকাশিত হয়েছে তাই নয় নবযৌবনোদ্ভিন্না রাধিকার দৈহিক কোমলতাও রূপায়িত হয়ে উঠেছে। রাবণের সীতাহরণের সময় সীতার কম্পান্বিত দেহ এবং চিত্তকেও কবি অনুরূপ উপমায় ভূষিত করেছিলেন।

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ঋতুবর্ণনার স্থানগুলি উচ্চাঙ্গের কবিত্ব স্পর্শ পায় নি। সাধারণতঃ নায়ক-নায়িকার মানসিক পটভূমিতেই ঋতুচিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। মানবমনের উপর বিভিন্ন ঋতুর প্রভাবও বর্ণিত হয়েছে কিন্তু যে প্রকৃতিচিত্রের সাহায্যে ঋতুচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, সেগুলি গতানুগতিক (Conventional)। মানবমনের সঙ্গে নিসর্গের গভীর যোগাযোগ এসব ঋতুবর্ণনায় স্পষ্ট রূপলাভ করে নি,—

'কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।
তাতে মধুকর মধু পীএ॥
সুন্দর পঞ্চমশর গাএ পিকগণে।
তেকারণে থির নহে মনে॥'

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি মধ্যে বসন্তঋতু তার চিরাচরিত রূপেই উপস্থাপিত। বিরহদগ্ধ হৃদয়ের উপর বসন্তের প্রভাবেরও খানিকটা পরিচয় আছে, কিন্তু বাইরের বসন্তকে কবি মানসলোকে স্থানান্তরিত হয়নি। ঋতুবর্ণনায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এ বসন্তেরই প্রাধান্য। বৈষ্ণব কবি সমাজে অবশ্য বসন্ত থেকেও বর্ষা প্রাধান্য পেয়েছে। বিরহী হৃদয়কে প্রধানত বসন্তের পটভূমিতে উপস্থাপিত করেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর কবি তার হৃদয়ের আকুল ক্রন্দনকে রূপ দেবার প্রয়াসী।) বংশীখণ্ডে রাধিকার উক্তি,

'চারি দিগেঁ তরুপুষ্প মুকুলিল বসন্তের বাএ।
আম্রডালে বসী কুয়িলী কুহলে লাগে বিষবাণ ঘাএ॥'

(রাধা-বিরহখণ্ডে মদনসখা বসন্তের আবির্ভাবে রাধিকার চিত্তচঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু প্রিয়তম পলাতক।) রাধিকার ব্যাকুল প্রশ্ন,

'যেনা দিগেঁ গেলা চক্রপানি।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জানী ॥'

(শ্রীকৃষ্ণ যে দেশে গিয়েছেন সে দেশ কি বসন্তের অজ্ঞাত, যদি অজ্ঞাত না হয় তবে যে ঋতুর ফুলশরে আমার হৃদয় বিরহজর্জর সে ঋতুর আবির্ভাবে কৃষ্ণের হৃদয় কি মিলনাকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠত না। এস্থলে বসন্ত বর্ণনার চেষ্টা নেই কিন্তু বসন্তের সাহায্যে হৃদয়ের আকুলতাকে রূপ দেবার প্রয়াস সৃষ্টির দিক থেকে সার্থক হয়েছে। ঋতুবর্ণনার ক্ষীণ উপাদানের সঙ্গে মনের বেদনাকে যুক্ত করে বসন্ত-চিত্রটি একদিক থেকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অন্য যে কটি বসন্ত বর্ণনা এই কাব্যে স্থান পেয়েছে তাদেব মধ্যে বসন্তের সমস্ত উপাদানই বর্তমান—পুষ্প, ভ্রমর, কোকিল, মলয় বায়ু ইত্যাদি বসন্তব প্রাকৃতিক সম্ভার দৃশ্যকে সাজিয়ে তুলেছে কিন্তু গতানুগতিকতার স্পর্শ কবিমনেব মাধুরীকে লুপ্ত করে দিয়েছে।/

বর্ষাঋতুর কয়েকটি চিত্রও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এ আছে, কিন্তু সেগুলি বর্ষাবর্ণনার সার্থক চিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। বর্ণনাকে পশ্চাতপটে রেখে কবি যেন বিবহী হৃদয়ের ক্রন্দনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সে ক্রন্দনের মধ্যে অনুভূতির যথেষ্ট গভীবতা থাকলে হয়তো বর্ষাদৃশ্যের প্রাকৃতিক পটভূমির সঙ্গে সেই অনুভূতির সমন্বয়ে কবিত্ব সৃষ্টি অনুভূতির অনুরূপ গভীরতামগ্ন হতে পারত। কিন্তু বর্ষাদৃশ্য এবং অনুভূতি, এ-দুটি তেমন একত্মতা লাভ করেনি। অবশ্য এই একাত্মতা সম্পাদনের বিফলতায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর কবির কবিগৌরব তেমন ক্ষুণ্ন হয়নি, কারণ রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙালি কবিদের এই চেষ্টা বহুবার ব্যর্থ হয়েছে। বর্ষাবর্ণনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর এই কয়টি পংক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে,)

'আশিন মাসের শেষে নিবিড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী ॥
তবে কাহ্ন বিনি হৈব নিফল জীবন।'

এখানে কাশ-হসিত আশ্বিন এবং রাধিকার বিরহ ক্রন্দনও কবি

সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, তবে পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যে কোথায় যেন একটু ফাঁক রয়ে গিয়েছে।

'অন্যান্য প্রকৃতিচিত্রের বর্ণনার মধ্যে' "বৃন্দাবনখণ্ড"এ শ্রীকৃষ্ণরচিত কুঞ্জের উল্লেখ করা যেতে পারে। সে বর্ণনায় নানা পুষ্প, ফল ও বৃক্ষাদির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সে বর্ণনার তৎকালীন বৃক্ষলতাদির পরিচয় আছে সত্য কিন্তু কবিত্ব সৃষ্টির বিচারে সেটা পুষ্প ফল বৃক্ষাদির একটি তালিকামাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। '"নৌকাখণ্ড"এ ঝড়ের বর্ণনায় কবি বিশেষ অপটুতার পরিচয় দিয়েছেন। ঝড়ের রুদ্ররূপের কোনো আভাস এ বর্ণনায় প্রকাশিত হয়নি। তবে শুধু 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' এর কবি একা এ নিন্দার ভাগী নন। সমগ্র বাঙলা সাহিত্যেই প্রকৃতির রুদ্ররূপের পবিচয় অতি ক্ষীণ।'

' অনুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্রের উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নিতান্ত অল্প নেই, তবে ইংরেজী সাহিত্যের Pathetic fallacyর ব্যবহারকে তারা অতিক্রম কবতে পাবেনি। তাদের মধ্যে নির্বিকার প্রকৃতিচিত্রের উদাহরণগুলি অধিকতর কবিত্বপূর্ণ।' রাধিকার উক্তিতে আছে—-

'দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতি হো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়াই
চখুত নাই সে নিন্দে॥'

-(এ নির্বিকার প্রকৃতি চিত্রে তেমন কোনো নূতনত্ব নাই সত্য কিন্তু অনুভূতির অফুরণ আছে।' কয়েকটি নির্বিকার প্রকৃতিচিত্র জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ থেকে অনূদিত বলে মনে হয়। +শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে,

'নিন্দ এ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে॥'

আর 'গীতগোবিন্দ'এ আছে,

+অধ্যাপক মণিমোহন বসু লিখিত 'জয়দেব ও চণ্ডীদাস' শীর্ষক প্রবন্ধ— "পাঞ্চজন্য"।

'নিন্দতিচন্দনমিন্দু কিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম।
বাল্য নিলয় মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয় সমীরে ॥'

অর্থাৎ—'তিনি রাধিকা চন্দন ও শশধরের স্নিগ্ধরশ্মিকেও নিন্দা করিতেছেন, বিষাদে ব্যাকুল হইতেছেন এবং মলয় সমীরও তাহার পক্ষে বিষের ন্যায় সন্তাপজনক বোধ হইতেছে।' অন্যস্থলে,

'সরস চন্দন পঙ্কে
আল
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহণ সমান মানে নিশি শশাঙ্কে।'

এই অংশটিও অনুবাদ-গন্ধী। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র নিম্নলিখিত অংশ তুলনীয়,

'সরস স্থণমপি মলয়জ পঙ্কম।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম ॥'

এবং

'ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধি-
বপি তনুতে তনুদাহম্।'

অর্থাৎ—'দেহলিপ্ত স্নিগ্ধ সরস চন্দনকেও বিষতুল্য বোধে তিনি (রাধিকা) তৎপ্রতি সভায় দৃষ্টিপাত করিতেছেন।' এবং 'তুমি অপ্রসন্নহেতু সুধানিধি চন্দ্রও যেন তাপ বিকীরণে শ্রীমতীর অঙ্গ দগ্ধ করিতেছ।'

(নির্বিকার প্রকৃতিচিত্রের এই উদাহরণগুলি গতানুগতিক হলেও মোটামুটি সুন্দর। কাব্যের ছন্দও কাব্যবর্ণিত ভাবের সঙ্গে মিল রক্ষা করেছে। একাব্যে সহানুভূতিশীল নিসর্গ বর্ণনাগুলি নির্বিকার নিসর্গ-বর্ণনা থেকে কবিত্ব সৃষ্টিতে হীন। মিলন বাসরে ভ্রমর গুঞ্জন এবং পুষ্পগন্ধি মলয়ের অবতারণা এবং বিরহ রাত্রিতে আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করেই তাদের কাজ শেষ হয়েছে। বিশেষ কোনো মৌলিক কবিত্ব তাদের সঞ্জীবিত করেনি।)

বিদ্যাপতির পদাবলী :(বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু বাঙালি

তাঁকে হৃদয়ের দরদ দিয়ে আপনার করে নিয়েছে। কাজেই বাঙালি কবিদের কাব্য আলোচনায় বিদ্যাপতি অপরিহার্য। বাঙলা কাব্য এবং বিশেষ করে বাঙলার বৈষ্ণবকাব্যে বিদ্যাপতির প্রভাব অপরিমিত। কেবলমাত্র এই প্রভাবের জন্যই বাঙলা কাব্যের আলোচনায় তাহার একটা অসংবাদিত স্থান আছে।

বিদ্যাপতি জয়দেবের মতো ভোগবিলাসেরই কবি, সুতরাং দৈহিক রূপবর্ণনায় কবি প্রকৃতি থেকে যেসব উপাদান সংগ্রহ করেছেন তারা অলংকার মণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাধার রূপ বর্ণনায় বিদ্যাপতি যে সব প্রাকৃতিক উপমা প্রয়োগ করেছেন তারা অনেক ক্ষেত্রে নূতন নয়, কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গি এবং উপস্থাপনেব কলাকৌশলে নূতনত্ব মণ্ডিত হয়েছে। রাধা এবং কৃষ্ণের ভোগ বিলাসময় যে লীলা বিদ্যাপতি বর্ণনা করেছেন, অলংকার-বহুল রূপ বর্ণনাগুলি তার সঙ্গে পরিপূর্ণ সঙ্গতিও রক্ষা করেছে। উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাসের পরই বিদ্যাপতির স্থান। স্বল্প উপাদান থেকে কেবলমাত্র অলংকারের বিচিত্র প্রয়োগে তিনি রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনাকে অনেককাংশে নূতন সৃষ্টির গৌরব দান করেছেন। নীলবসনা রাধিকাব তড়িতের ন্যায় অঙ্গকান্তি দেখে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের ব্যথার বিদ্যাপতি কৃত ভাষারূপ।)

'মেঘমালা সঞে তড়িৎলতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল

অন্যত্র অভিসাব-অভিলাষিণী রাধিকাকে দূতীর উপদেশ,

'নাল নিচোলে ঝাঁপবি নিজ দেহ।
জনি ঘন ভিতরে দামিনী রেহ।'

গোধূলির অস্পষ্ট আলোকে মন্দির বাহিরে একঝলক রূপ সঞ্চারিত করে রাধিকা আবার মন্দিরে প্রবেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের মনে হল,

নব জলধরে বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয় গেল।'

(উপমান এবং উপমেয়ের আপাত সাদৃশ্য দেখিয়ে বিদ্যাপতির

উপমাগুলির কাজ শেষ হয়ে যায়নি। এই উপমাগুলি বহুব্যবহারে মলিন হয়ে গিয়েছিল। প্রথম যে কবি মুখের সঙ্গে পদ্মেব বা চন্দ্রের অঙ্গুলীর সঙ্গে চম্পক-কলিকার বা চরণের সঙ্গে কমলের তুলনা করেছিলেন, তাঁর চিন্তারসে মৌলিকত্ব বহুদিন পাঠকের মনে লগ্ন হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কবিসাধারণ যখন সেগুলির নির্বিচার প্রয়োগ আরম্ভ করলেন, তখন সেগুলির চিত্ররূপ সাধারণ বিধিবদ্ধতার মরুভূমিতে হারিয়ে গেল। বিদ্যাপতির বিশেষত্ব হল তিনি প্রাচীন চিত্ররূপগুলিকে উপস্থাপনে এমন কারিগরি দেখিয়েছেন যে সেই চিত্ররূপগুলি বহু ব্যবহারের বালুকাস্তূপ থেকে পুনরায় উদ্ধৃত হয়েছে। পাঠকের মনে নির্বিকার উপমার পরিবর্তে একটি সুন্দব চিত্রের উদয় করে দিয়ে প্রত্যেকটি উপমাকে তিনি প্রচুব ইঙ্গিতপূর্ণ করে তুলেছেন ; মহাকবি কালিদাসের পর সাহিত্যিক সাধনার এক্ষেত্রে বিদ্যাপতির স্থান প্রায় একক। অন্যান্য কবির কাব্যে উপমার প্রয়োগ নেই এমন নয়, অনেকের কাব্যে উপমার বাহুল্যও আছে। উপমার মধ্যে যে চিত্ররূপটি প্রচ্ছন্ন থাকে তাকে পরিস্ফুট করার চেষ্টাও অনেক কবি করেছেন, কিন্তু বহুল ব্যবহারে সেই চিত্রগুলি এত মলিন যে তাদের ঔজ্জ্বল্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। বিদ্যাপতির কাব্যে পুরাতন চিত্রগুলিকে অলংকারের সাহায্যে বা উপস্থাপনার নৈপুণ্যে নূতন করে তোলা হয়েছে।। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করা যাবে। লোচনের সহিত ভ্রমরের তুলনা নূতন নয়, কিন্তু বিদ্যাপতির ভাষায় সেই পুরাতন তুলনাটিরই নূতন চিত্ররূপ,

'লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উডই পার ॥'

এই তুলনাটির দ্বিতীয় পংক্তিটি প্রথম পংক্তির নির্বিকার সাদৃশ্যটি সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করে তোলে।

অন্যত্র রাত্রি জাগার ক্লান্তিতে রাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণের অরুণ নয়নের তুলনা,

'জাগি রজনী দুঁহু লোহিত লোচন আলস ভাতি
মধুকর লোহিত কমলকোর জনি শুতি রহল মদে মাতি ॥'

চণ্ডীদাসের একটি উপমায় অনুরূপ ভাব প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বিদ্যাপতির উপমা বর্ণনার বৈশিষ্ট্যের (details) এর দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। মুখ-কমল এবং দেহ-মৃণালের অতি প্রাচীন উপমা একটি বিশদ চিত্রকে অবলম্বন করে সার্থক হয়ে উঠেছে।

'নীরস কমল মুখ অবলম্বই সখিমাঝে
বৈসলি গোই।
নয়ন নীর থির নাহি বান্ধই পঙ্ক
কয়ল মহী রোই ॥'

নয়নের ধারায় মহীতে পঙ্কসৃষ্টির মধ্যে হয়তো একটু আতিশয্য আছে, কিন্তু তুলনাটির অভিনবত্ব পাঠক চিত্তকে আকর্ষণ না করে পারে না। বিরহখিন্না রাধিকার তুলনা কালিদাসের ন্যায় বিদ্যাপতি নীরস কমলের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন,

'দিনে দিনে তনু অবসন ভেল
হিম কমলিনী সম নেহ।'

কমলিনীর সঙ্গে রাধিকার সাদৃশ্য আর একটি কালিদাস-গন্ধী উপমায় ও আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকার মিলনের বর্ণনা।—

'নব নলিনী যেন কুঞ্জর গঞ্জলি।'

প্রিয়তমের প্রেম-মত্ততার চিহ্ন ধারণ করে বাঙলা সাহিত্যের অনেক নায়িকাই দলিত কমলের মতো আলুলায়িত সৌন্দর্য লাভ করেছে।

রাধিকার পুষ্পসুলভ দৈহিক কোমলতা প্রকাশের জন্য বিদ্যাপতি তাঁকে শিরীষ কুসুমের সঙ্গেও করেছেন। এটিও কালিদাস-গন্ধী। পয়োধরের সঙ্গে সুমেরুর তুলনা অনেক কবিকে প্রলুব্ধ করেছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চোখে রাধিকার অর্ধঅনাবৃত পয়োধরকে বিদ্যাপতি অপরূপ চিত্রের সাদৃশ্যে অভিনব করে তুলেছেন।—

উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে শরদঘন জনি
বেকত কয়ল সুমেরু ॥'

অন্যত্র অনুরূপ আর একটি উপমা,

'করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাপন ন যায়।
মলয় শিখর জনু হিমে ন লুকায় ॥'

রাধিকার মুখমণ্ডলকে চন্দ্রমণ্ডলের সঙ্গে তুলনা বিদ্যাপতিতে অজস্র। একটি উপমায় কুন্তলকে মেঘ কল্পনা করে কালিদাস প্রযুক্ত একটি উপমার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে,

'বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল
চাঁদে বেঢ়ল ঘনমালা।'

নায়ককে ভ্রমর এবং নায়িকাকে মালতির সঙ্গে তুলনা করে বিদ্যাপতি বহু পদে উপমা প্রয়োগ করেছেন। অঙ্গুলির সহিত চম্পকের তুলনা এবং মুখমণ্ডলের সহিত চন্দ্রের সাদৃশ্য একটি বিশদ চিত্ররূপের সাহায্যে গতানুগতিকতা মুক্ত হয়েছে।

'জোরি ভুজযুগ মোরি
বেঢ়ল ততহি বয়ন সুছন্দ।
দামচম্পকে কাম পূজল
যৈসে শারদ চন্দ ॥'

মুখকে চন্দ্র আর অঙ্গুলিকে চম্পকদাম বললে পাঠককে সচকিত করা যেত না। কিন্তু এই চিত্রটি বহুক্ষণ পাঠকের মনে লগ্ন হয়ে থাকে। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ধার করা উপমার অতি সাধারণ প্রয়োগও বিদ্যাপতির কাব্যে অত্যন্ত সুলভ। বিম্বাধরা, মরালগামিনী, হরিণনয়নী ইত্যাদি রূপকাত্মক নিসর্গের পরিচয় প্রায় প্রতি ছত্রে ছত্রেই আছে। প্রত্যক্ষভাবে সৌন্দর্য বর্ণনার উদ্দেশ্য না থাকলেও বিদ্যাপতি কতকগুলি উপমার মধ্যে পরোক্ষভাবে প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন,

'কুচযুগ পর চিকুর ফুজি পসরল
তা অরু ঝায়ল হারা।
জনি সুমেরু উপর মিলি উগল
চন্দে বিহুন সবে তারা।'

রামায়ণে সীতার বক্ষ থেকে খসা মালিকাকে কবি হিমালয় থেকে প্রবাহমানা গঙ্গার সহিত তুলনা করেছিলেন। সেই চিত্রটির উপমা বিদ্যাপতির কাব্যেও একাধিক স্থানে আছে। রাধার ভালে সিন্দুর বিন্দুর তুলনা,

'সুন্দর বদন সিন্দুর বিন্দু সামর চিকুর ভার।
জনি রবি শশী সঙ্গহি উগল পাছু কএ অন্ধকার॥'

মুখকে শশী এবং সিন্দূরকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা বৈষ্ণব সাহিত্যে সংখ্যাহীন কিন্তু চিকুরকে অন্ধকারের সহিত তুলনায় বিদ্যাপতির উপমাটি বর্ণনার বৈশিষ্ট্য অধিকতর গৌরবের অধিকারী। বিদ্যাপতির কাব্যে নখচিহ্নভূষিত পয়োধরের তুলনা।—

'কুচে নখ লাগ সখিজন দেখ।
গিরি কৈসে লুকায়ত নবশশি রেখ॥'

সমধর্মী উপমা বিদ্যাপতির কাব্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। ভীতির অথবা ক্রোধের সঞ্চারে নারীর কম্পমান দেহকে নব কদলী-পত্রের চঞ্চলতার সহিত তুলনার উদাহরণ সংস্কৃত এবং পূর্ববর্তী বাংলা কাব্যে পেয়েছি। রামায়ণে রাবণের উদ্ধত প্রস্তাবে সীতার দেহও ক্রোধে কদলীপত্রের মতো কম্পমান হয়েছিল। বিদ্যাপতির কাব্যে আছে।—

কদলীদল সন কাঁপয় অঙ্গ।'

চন্দ্রের উদয়ে বারিধিবক্ষের উচ্ছ্বাস কালিদাসের কাব্যে অমরত্ব লাভ করেছে। বিদ্যাপতিও একটি উপমায় এই চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছেন,

'রাধা বদন হেরি কানু আনন্দা।
জলধি উছলে যৈসে হেরইতে চন্দা॥'

মহাদেবের যোগভঙ্গের পর তাহার ঈষৎ উদ্বেলিত হৃদয়ের বর্ণনায় এই চিত্রটি যেমন ইঙ্গিতপূর্ণ (suggestive) হয়েছিল এখানে অবশ্য সে ইঙ্গিত নেই।

নায়িকার আক্ষেপের মধ্যে রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের অবতারণা করা বাঙলা সাহিত্যে বিশেষ করে বাঙলার বৈষ্ণবসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। বিদ্যাপতির কাব্যেও এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র হিসেবে তাদের মূল্য হয়ত সাধারণ, কিন্তু পরবর্তী বৈষ্ণবকাব্যের আক্ষেপেব করুণ সুরটি হয়তো বিদ্যাপতির কাব্যেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।—

'আতপে তাপিত শীতল জানিকহু
সেবল মলয় গিরি ছাহে।
ঐসন করম মোর সেহও দূর ভেল
কএল দাবানল দাহে॥'

অথবা

'সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নিহারি চাতকী মরি গেল॥'

চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদগুলির সঙ্গে এই অংশগুলির একাত্মতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

বিদ্যাপতির কাব্যে নির্বিকার নিসর্গবর্ণনাগুলির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির সঙ্গে সাদৃশ্য রহিয়াছে—উভয়েরই আদর্শ হয়তো ছিলেন জয়দেব। নির্বিকার প্রকৃতি বর্ণনাকে গতানুগতিকতার স্পর্শমুক্ত করে বিদ্যাপতিও উচ্চাঙ্গের কবিত্ব সৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নি।—

'বহই মন্দ সুগন্ধি শীতল
মন্দ মলয় সমীর রে।
জানি প্রলয় কালক প্রবল পাবক
দহই দূর শরীর রে॥'

ইত্যাদি ধরণের পদগুলির মধ্যে জয়দেব ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সুরই

ঝংকৃত, পাঠকের অতিরিক্ত প্রাপ্তি ঘটেনি। সহানুভূতিশীল প্রকৃতি-বর্ণনা বিদ্যাপতির কাব্যে প্রায় অনুপস্থিত। ভাব সম্মিলনের একটি পদে প্রকৃতিকে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবার জন্য রাধিকার গভীর আবেদনটি সুন্দর,

'সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ লাখ উদিত করু চন্দা।'

চণ্ডীদাসেরও কতকগুলি পদের সঙ্গে এর ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে।

ঋতুবর্ণনায় বিদ্যাপতির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। শব্দঝংকার সৃষ্টি এবং অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্য বিদ্যাপতির ঋতুগুলিকে আমাদের দৃষ্টিতে প্রাণবাণ্ করে তুলেছে। বিদ্যাপতিতেও বর্ষা এবং বসন্ত ঋতুরই প্রাধান্য শুধু তাই নয়, অন্য ঋতুবর্ণনার অনুপস্থিতির সুযোগে এই দুটি ঋতুই বিদ্যাপতির ঋতুবর্ণনার দ্বৈত উপাদান। একস্থানে রাধিকার বিরহদশায় একটি বারমাসিয়ার অবতারণা করা হয়েছে। বিরহী হৃদয়ের পটভূমিতে এই বারমাসিয়ার পুরো অংশই বিরহে কিছুটা অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে কিন্তু বসন্ত এবং বর্ষাবর্ণনার স্থানগুলি কবিত্ব সৃষ্টিতে অধিকতর সার্থক। বসন্তের বর্ণনা,

'রস লাল কোকিল কোকিলাকুল
কাকলি মন মোহই।'

এই বর্ণনায় প্রকৃতির আনন্দের উচ্ছলতা তরল শব্দঝংকারে ধরা পড়েছে। এই আনন্দোচ্ছল প্রকৃতির পটভূমিতে রাধিকার বিরহী-হৃদয়ের ব্যাকুলতাটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। বর্ষা-বর্ণনায় আছে।—

'তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
হামার লোচন ছন্দ।'

এখানে ক্রন্দনরতা রাধিকা মেঘময় আকাশে আপনার দয়ের প্রতিফলন খুঁজে পেয়েছেন,—অনুভূতির বেদনায় বর্ষা ব্যাকুলতাময় রূপ ধারণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে।—

'শ্রাবণ আকাশে ওই দিয়েছি পাতি
মম জল ছলছল আঁখি মেঘে মেঘে।'

বিদ্যাপতির বর্ণনায় রূপক হিসেবে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর অন্তরাল থাকলে তিনিও প্রায় অনুরূপ গভীরতায় পৌঁছে যেতেন।

'বিদ্যাপতি ভোগবিলাসের কবি, সুতরাং বসন্তবর্ণনায় তার প্রতিভার উপযুক্তক্ষেত্র এবং সেখানেই তার কবিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। বসন্তবিহারের কবিতাগুলিতে বসন্তের আনন্দ অলংকার মাধুর্যে ও শব্দ ঝংকারে মূর্ত।—

'আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্থ ॥'

বসন্ত এ বর্ণনায় ঋতুপুরুষ, ঋতুরাজ। দিনকরকে অশ্বভূষণ, কেশরকুসুমে হেমদণ্ড এবং চম্পকপুষ্পের ছত্র ধাবণ করে তিনি ধরণী-জয়ের অভিযানে বের হয়েছেন। তাঁর 'তন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ' এবং 'কুন্দবল্লরীতরু ধরল নিশান।' ধরণী বিজয়ের উপযুক্ত সৈন্যও তাঁর আছে, 'সৈন্য সাজল মধু মক্ষিকাকুল।' জীবত্ব আরোপেব এই প্রকৃতিবর্ণনা অপরূপ হয়ে উঠেছে অন্যত্র।

'নববৃন্দাবন নবনব তরুগণ নব নব বিকশিত ফুল্ল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল মাতল নব অলিকুল ॥'

অথবা,

'মধুর মধুর পিকবব   তরু তরু সব
করু করু লতিকা সঙ্গ।'

ইত্যাদি বর্ণনায় প্রকৃতির অঙ্ক নিবাসী মিলনচিত্রগুলির দ্বারা নায়ক নায়িকার মিলনের পটভূমি রচনা করেছেন। বিরহের পটভূমিতেও বসন্তবর্ণনা আছে।—

'পথ নিহারইত চূত মঞ্জুল
ফুটল মাধবী লতা।
নবীন কোকিল পঞ্চব গাবয়
গুঞ্জর ভ্রমর যতা ॥'

এই পদটিতে চণ্ডীদাস-সুলভ আক্ষেপের সুর পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাসের একটি পদ, 'সখিরে, বরষ বহিয়া

গেল' ইত্যাদিতে এই পদটির ভাব এবং ভাষা-সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। চারিদিকে মিলনসূচক দৃশ্য রাধিকার অন্তরের ব্যথাকে বহুগুণিত করে তুলছে। নির্বিকার প্রকৃতিচিত্রের সাহায্যে বসন্ত-বিরহ আঁকবার চেষ্টা সার্থক হয়ে উঠেছে।

অভিসারের বর্ণনায় বর্ষাদৃশ্যের অবতারণাই বিদ্যাপতির কাব্যে প্রধান। পরবর্তী বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসও বিদ্যাপতির অনুকরণেই বর্ষাভিসারের বর্ণনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাপতির বর্ষাকাব্যে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। বর্ষার বারিধারাও তাঁর কাব্য থেকে অলংকার প্রাধান্য এবং শব্দবিলাসকে মুছে ফেলতে পারেনি। চণ্ডীদাসের বর্ষার উপাদান থেকে তাঁর কাব্যের বর্ষার উপাদান তাই বিশিষ্ট। চণ্ডীদাসের ক্ষুদ্র বর্ষাবর্ণনায় বর্ষার একটি স্নিগ্ধ রূপ, নায়ক শুধু আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে ভিজছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির নায়িকা অভিসারের পথে কুলিশ ঝংকারে হাত দিয়ে কান বন্ধ করেছেন, বিদ্যুতের অসহনীয় দীপ্তি তার চোখ ঝলসিত করেছে।—

'গগনে অব মেহ দারুণ
সঘন দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শব্দ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই॥'

অথবা,

ঝরঝর বরিষ সঘন জলধার দশদিশ সবহুঁ ভেহ আঁধিয়ার।
এ সহি কিয়ে করব পরকার অবু জনু যাবয়ে হরি অভিসার।
ঝলকই দামিনী দহন সমান ঝনঝন শব্দ কুলিশ ঝনঝন॥'

অন্যত্র,

'গগন সঘন মহী পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারত উপজয় শঙ্কা॥'

বাঙালি কবিদের বর্ষার স্নিগ্ধ রূপের বিপরীতে বিদ্যাপতির কাব্যে বর্ষার রুদ্র রূপের কিছুটা আভাস আছে। সে আভাস সার্থক হয়ে

উঠেছে শব্দ-ঝংকারে। বিদ্যাপতির কাব্যে বর্ষাবিরহও আছে এবং রাধিকার নিকট বসন্তবিরহ তবুও সহনীয় কিন্তু বর্ষার বিরহবেদনা শান্ত করবার যে কোনো উপায়ই নেই।

'খেদব মোঞে কোকিল অলিকুল বারব
করকঙ্কন ঝমকাই।
যখনে জলদে ধবলা গিরি বরিষব
তখণুক কোঞোন উপাই ॥'

বর্ষাবিরহের অসহ্য ব্যাকুলতা এই পংক্তিকটিতে ধরা পড়েছে।

বিদ্যাপতির কাব্যে বসন্তের প্রাধান্যই স্থির হয়ে যেত কিন্তু একটি পদে বর্ষাকে কবি অমর করে গিয়েছেন। বসন্তকাব্যের সুর ছাপিয়ে সেই পদটির সুর গভীর অথচ ব্যাকুল বেদনায় প্রবাহিত হয়েছে। পদটি বিরহের। পদটির প্রথমেই গীতিকবিতা সুলভ একটি বেদনাময় আর্তি;

'সখি, হমর দুখের নাহি ওর।
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥'

যে বর্ষায় সুখীগণ পর্যন্ত "অন্যথাবৃত্তিচেতঃ" হয়ে যায়, সে বর্ষায় বিরহিণী রাধিকার দুঃখ যে কল্পনাতীত। অন্তরের এই আকুল ক্রন্দন সমস্ত পদটিতে পরিব্যাপ্ত। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতিসুলভ বর্ণনাও আছে,

'কুলিশ শতশত পাত মোদিত
ময়ুর নাচন মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥'

বর্ষার বেদনা বহির্লোক থেকে অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছে। আত্মলীন দৃষ্টির পরিচয় এ-পদটিকে গৌরবমণ্ডিত করেছে। যে অন্তর্লোক থেকে কবিতার প্রথম দুটি পংক্তির উদ্ভব, বর্ষা-বর্ণনার পর কবি আবার সে অন্তর্লোকে ফিরে গিয়েছেন,

'বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া।"

কিন্তু এই পংক্তিতে রাধাকৃষ্ণ সকলকে ভুলে গিয়েছেন। বর্ষার শাশ্বত রূপ মানুষের মনে যে বেদনার্ত স্পন্দন জাগায় এ যেন তারই অভিব্যক্তি। ঐ হিসাবে এ পংক্তি দুটির অর্থ অফুরন্ত।

বিদ্যাপতির কাব্যে অলংকারেরই প্রাধান্য কিন্তু এই পদে সে অলংকার পরিত্যাগ করে কবি নিরাভরণ অন্তরের ব্যাকুল সৌন্দর্য অভিব্যক্তির আনন্দবেদনালোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ভোগবিলাসের কবি যে প্রয়োজন অনুসারে চণ্ডীদাস সুলভ-ভাবোচ্ছাসে তাহার লেখনীকে সংযত করতে পাবেন, এ পদটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়রূপে এ পদটি শুধু বৈষ্ণব সাহিত্য নয়, সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম।

চণ্ডীদাসের পদাবলী ঃ—চণ্ডীদাসের প্রকৃতি তাঁর সৃষ্ট রাধিকার মতোই নীরব এবং বেদনাবিধুর। বিদ্যাপতির কাব্যের মতো উচ্ছল আনন্দে সে প্রকৃতি কোনো স্থানেই আত্মপ্রকাশ করেনি। বিশেষ করে জয়দেবের মতো বিদ্যাপতিও ভোগবিলাসের বর্ণনায়ই পারদর্শী, কাজেই তাঁর কাব্যের পটভূমির প্রকৃতি ও ভোগবিলাসের রঙে অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। চণ্ডীদাস ভাবোচ্ছাস ভরা দুঃখের কবি. তাঁর কাব্যের প্রাকৃতিক পটভূমিও অনুরূপ ভাবোচ্ছাসেই পূর্ণ।

রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের সাহায্যে নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনায় চণ্ডীদাস সংস্কৃত সাহিত্যেরই অনুগামী, তবে বাঙলা সাহিত্যে সৌন্দর্যের প্রাকৃতিক উপমানগুলি অলংকারের আতিশয্য এবং অনুকৃতির একঘেয়েমিতে যেমন বিশেষত্বহীন চণ্ডীদাসে তার ব্যতিক্রম। ভাবই যে কবির প্রধান উপজীব্য বাহ্যিক রূপবর্ণনায় সে কবির কাব্যে অলংকার রূপবৈচিত্র্য না থাকাই স্বাভাবিক। দৈহিক রূপ থেকে

+এ পদটি ছোটো বিদ্যাপতির রচিত, এ মতও প্রচলিত আছে। সে বিতর্ক এস্থানে অপ্রয়োজনীয়। বিদ্যাপতি নামাঙ্কিত সব কবিকেই একসঙ্গে বিচার করা হয়েছে।

মানসিক লাবণ্যই তাঁর কাছে বেশি প্রিয় কিন্তু বৈচিত্র্য না থাকলেও অল্প কথায় চণ্ডীদাস ভাবময় দৈহিকরূপও ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণের রূপ,

'নব জলধর করে ঢলঢল বরণ অঞ্জন সম।
নীলজে মুকুর অতসীর ফুল তেমতি দেখয়ে ভ্রম।।'

এই অতসীর ফুলটি বিশেষ করিয়াই বাঙলার ফুল, ধ্রুপদী সাহিত্যে এটি মোটামুটি অনাদৃত। মৈমনসিংহ গীতিকায় এই ফুলের উল্লেখ প্রচুর। চণ্ডীদাসেও অন্যত্র,

'অতসী কুসুম সম শ্যাম সুনায়র
নায়রী চম্পক গোর।'

সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব থাকলেও দেশজ তুলনাগুলি চণ্ডীদাসের কাব্যকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, 'সান্দ্রপয়োদ সৌভাগম' এবং বিষ্ণুপুরাণে 'নীলোৎপলদলশ্যামল'। তমাল তরুর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ-সাদৃশ্যের কথাও চণ্ডীদাসের কাব্যে আছে। 'তমাল জিনিয়া তনু'। ময়ূরের কণ্ঠ এবং পুচ্ছের অপরূপ বর্ণচ্ছটার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তির সৌন্দর্য কবি খুঁজে পেয়েছিলেন। এই স্বল্প অথচ সুন্দর উপমানগুলিকে কবি ব্যতিরেক অলংকারের সাহায্যে অথবা রাধা এবং গোপিনীদের আক্ষেপের সুরের সঙ্গে মিশিয়ে কবিত্ব মণ্ডিত করেছেন। অধিকাংশ স্থলে অবশ্য ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি বর্ণনা স্বাভাবিক ভাবেই এ-বর্ণনাগুলিকে অধিকার করছে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের সংবাদ শুনে গোপিনীদের বিলাপ—

'তোমার বরণ ধরয়ে সঘন ময়ূর পাখীর গায়।
তোমার বরণ না দেখি যখন এ-চিত রাখি যে তায়।।
নবনীলপদ্ম লইয়া করেতে হেরিয়ে নয়ন ভরি।
অতসীর ফুল তুলি মনোহর যতন করিয়া পরি।।'

এইস্থানে শুধু যে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাই প্রকাশিত হয়েছে তা নয় ভাবানুষঙ্গকে অবলম্বন করে গোপিনীগণ প্রকৃতির মধ্যে আপনাদের আক্ষেপের ভাবকে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। এ হিসাবে এরকম

উদাহরণগুলির সার্থকতা অতুলনীয়। "এ চিত রাখিয়ে তায়" কথাটী বিশেষ অর্থব্যঞ্জক। অন্যস্থানে রাধার আক্ষেপোক্তি।—

'সই, লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদ না হেরি গো
ত্যাজিয়াছি কাজরের সাধ॥'

রাধার পূর্বরাগের বর্ণনায়ও দিব্যোন্মত্ততা সঞ্চারের মধ্যদিয়ে কবি শ্রীকৃষ্ণের নবলজধর কান্তি এবং ময়ূরকণ্ঠী বর্ণের কবিজনোচিত অবতারণা করেছেন।

'সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়ন তারা।'

অথবা,

'একদিঠ করি ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরীক্ষণ॥'

এখানে ময়ূর এবং ময়ূরীর অবতারণা তাদের কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ সাদৃশ্য দেখিয়েই শেষ হয়ে যায়নি, একদৃষ্টে ময়ূর এবং ময়ূরীব দিকে তাকিয়ে থাকায় রাধিকাব মিলনাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিতও অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'বিদগ্ধমাধবে' রূপগোস্বামীও রাধিকাব অনুরূপ দিব্যোন্মত্ততার আভাস দিয়েছেন—'যদি দৈবাৎ অসিত বর্ণ নব জলধর দৃষ্ট হয়, তৎক্ষণাৎ উৎকণ্ঠিত চিত্তে আলিঙ্গন নিমিত্ত পক্ষদ্বয় ইচ্ছা কবেন। শ্রীরাধা অগ্রে ময়ূর পুচ্ছ দেখিয়া সহসা উৎকম্প অবলম্বন করেন।' চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধা নাম গানে অশ্রুসিক্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ,

'নয়ন কমল যেন ঢলঢল লোরেতে কোমল আঁখি।
যেমন মেঘের বারিখে শ্রাবণ তেমতি ধরণ দেখি॥'

অশ্রুকে শ্রাবণ মেঘের বর্ষণের সহিত তুলনার অন্তরালে শ্রীকৃষ্ণের নবঘনরূপের পরিচয় আছে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর ব্যতিরেক অলংকার ব্যবহার করে শ্রীকৃষ্ণের মেঘনিন্দিত কান্তির পবিচয়।—

'শ্যামের জলদরূপ হেরি হেরি জলদ গগনে যত।
লাজে লুকাইয়া রহল সকল রহল শত হি শর্ত॥'
এখন আনন্দে বিকশিত হউ আর কি তাহার ভয়।'

দেহকান্তি ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য অঙ্গ বর্ণনার নৈসর্গিক উপমাগুলি

চণ্ডীদাস সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই গ্রহণ করেছেন। ‘খঞ্জন নয়ন,’ ‘তিলফুল নাসা, এবং “কুন্দদশন”—এই সকলের পরিচয় পূর্ববর্তী এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যে অজস্র, আর বহুল ব্যবহারে চিত্রগুলি মলিন একথাও আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

‘শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তির সাদৃশ্য যেরূপ কবি নীলপদ্ম, নবঘন অথবা অতসী কুসুম, রাধিকার অঙ্গও সেরূপ শিরীষ কুসুম, চম্পক পুষ্প অথবা তড়িতের সৌন্দর্য জয় করেই প্রকাশিত।

‘শিরীষ কুসুম জিনিয়া কোমল পাছে বা গলিয়া পড়ে।’

অথবা,

তড়িৎবরণী হরিণ-নয়নী দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।’

অন্যত্র,

‘নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী চমকি চলিয়া গেল।’

পূববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যে এই চিত্রগুলির অজস্র ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। রাধিকার চম্পক-কান্তিব পরিচয় কবি অতি নিপুণভাবে এঁকেছেন। জ্যোৎস্নাভিসারিকা রাধিকার চন্দ্রকে এত উজ্জ্বল আলো বিতরণের জন্য মৃদু তিরস্কার করেছিলেন। চন্দ্রের উত্তর।—

‘শুনগো রাধিকা চাঁপার কলিকা
অধিক উজর কে।
শতকোটি চাঁদ উদয় করেছে
একেলা তোমার দে॥’

এই চিত্রগুলির প্রয়োগ একাধিক স্থানে আছে। রাধিকার অন্যান্য অঙ্গের বর্ণনায় সংস্কৃত সাহিত্যের মোটামুটি অনুকরণ করা হয়েছে। রাধিকার রূপও নখচাঁদ, মরাল গমন, খঞ্জন নয়ন ইত্যাদি চিরাচরিত রূপবর্ণনায় অভিব্যক্ত। মাঝে মাঝে এই অভিব্যবহারে মলিন চিত্রগুলিকে চণ্ডীদাস নিপুণ তুলিকা স্পর্শে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। প্রভাতে খণ্ডিতা রাধিকার নিকট রতিচিহ্ন দেহ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ

ফিরে এসেছেন। রাধিকার উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের নিশিজাগরণ রক্তিম আঁখির তুলনা।—

'রক্তউৎপল ফুলে যৈছন ভ্রমর বুলে
ঐছন ফিরয়ে ছুটি আঁখি ॥'

বিদ্যাপতির 'মধুকর লোহিত কমল কোরে শুতি রহল মদে মাতি,' উপমার এটি যেন ভাষান্তরিত রূপ। অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে রাধিকার নয়নের রূপ,—

'সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরালকুল।'

এই উপমাতে 'ছুটিছে মরালকুল' কথাটির মধ্যে অতিশয়োক্তির আভাস আছে। তবু মানস সরসের সহিত রাধিকার গভীর দৃষ্টির তুলনা কবিত্ব সৃষ্টিতে সার্থক।

চণ্ডীদাসের রূপ-বর্ণনায় আরও একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। বর্ণনার মধ্যে কোথাও যৌবন-উচ্ছলতা এবং দৈহিক-বিলাসেব ক্ষুদ্রতম আভাসও নেই। সরল ভাষায় এবং সাধারণ উপাদানের সাহায্যেই তিনি নায়ক নায়িকার রূপকে প্রচুর ইঙ্গিতপূর্ণ (suggesstive) করে তুলেছেন। বিপরীত উদাহরণ শুধু একস্থানে। শ্রীকৃষ্ণেব জন্ম লীলায় মায়ার রূপ—

'নয়নখঞ্জন ওষ্ঠ রাতা সম দশন কুন্দের কলি।
তাহাই দেখিয়া ফুলের ভরমে উড়িআ পড়িছে অলি ॥
বিম্বযুগ দেখি কির সুকপাখী সেজে খাইতে চাহে।
উডি উড়ি ফিরে ফুলের ভরমে ওষ্ঠ ঠোকারিয়া জাএ ॥'

ভারতচন্দ্রের ন্যায় এই অতিশয়োক্তি যুক্ত বর্ণনা চণ্ডীদাসের সহজ কবিত্বের মধ্যে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে। যদি এই অংশ প্রক্ষিপ্ত না হয় তবুও এটা চণ্ডীদাসের প্রকৃত পরিচয় নয়। নারী সৌন্দর্য ছাড়া অন্যান্য রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের উদাহরণ চণ্ডীদাসের কাব্যে আছে। তাদের আলংকরিক মূল্য খুব বেশি নয় কিন্তু তাদের মধ্যে একটা ভাবলীনতা থাকায় কাব্য হিসাবে সেগুলি গভীর হয়ে

উঠেছে। অক্রুরের গোকুল যাত্রার সূচনায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর দেহে রোমাঞ্চ জেগেছিল।

'যেমন কদম্ব কেশর ফুটল
তৈছন অক্রুর দেহা।'

রোমাঞ্চের সহিত কদম্ব অথবা মুকুলের তুলনা পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে অজস্র। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে চৈতন্যের ভাবময় রূপ,

'কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক র।'

গোবিন্দদাসের কাব্যেও আছে,

'নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব॥'

বিরহিনী গোপিনীগণের আক্ষেপোক্তিতে অনেক স্থলে তাদের চাতকীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চাতকী এবং মেঘের সম্পর্কের প্রতি যেন চণ্ডীদাসের কবিসুলভ একটা দুর্বলতা ছিল বলে মনে হয়। অগণিত স্থানে তিনি এই সম্পর্কটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে শ্যামের নবজলধর রূপটিও আভাসিত হয়েছে। মিলন উল্লাসের সময় অবশ্য নায়ক-নায়িকার রূপ-বর্ণনায় চণ্ডীদাসের কাব্যে শুধু চাঁদ ও চকোরের প্রাধান্য,

'চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পীরিতি ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ।'

কমলিনী ও মধুপের সম্পর্কটিও প্রাচীন কাব্যে বর্ণিত চণ্ডীদাস বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন। শুধু চণ্ডীদাসের কাব্যেই নয়, এই উপমাগুলি সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্যে নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে। রাধিকার বিরহদশায় এক সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছেন, তার উক্তিতে রাধিকার বিরহখিন্ন কণ্ঠস্বরের তুলনা,

'শুনি কি না শুনি কহে সরু বাণী
যেন অরুন্ধতী তারা।'

কর্ণগ্রাহ্য বস্তুকে দৃষ্টি গ্রাহ্য বস্তুর সহিত তুলনা করা চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভার একটি বিশেষ দান। প্রাচীন বা মধ্যযুগের আর কোনো বাঙালি কবির কাব্যে অনুরূপ উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। আধুনিক রোমান্টিক কাব্যে এধরণের ইন্দ্রয়ের ভেদরেখা লুপ্তির উদাহরণ একটি বিশেষ গুণ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কাব্যেই আছে।—

"ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো
জড়ায়ে ধরিছে গলে।"

এখানে ঘ্রানেন্দ্রিয় স্পর্শেন্দ্রিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। অনুরূপ আরও অনেক উদাহরণ রবীন্দ্রকাব্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে।

গোপিনীগণ অথবা রাধিকার আক্ষেপের মধ্যে কতগুলি রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেসকল প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় তেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি, আক্ষেপই তাদের মূল সুর।

'সখি কহবি কানুর পায়।
সে সুখ সাগর দৈবে শুকায়ল
তিয়াসে পরাণ যায়।।'

রাধিকার এই আক্ষেপোক্তির মধ্যে বিগত সুখের সঙ্গে শুষ্ক সাগরের যে তুলনা তা বিষাদের সুরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। চিত্রটি তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

'শীতল বলিয়া ওচাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি।।'

অথবা,

'পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।।'+

ইত্যাদি বর্ণনায় কানুপ্রেমের রূপ পরিবর্তনের এই প্রাকৃতিক উপমাগুলি প্রধান নয়, প্রধান হ'য়ে উঠেছে রাধিকার অন্তরের আকুল ক্রন্দন।

'কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি।।'

+মতান্তরে এই পদগুলি জ্ঞানদাসের রচিত।

অভাগিনী নারীর অবস্থাকে স্রোতে ভাসমান শৈবালের সঙ্গে তুলনা, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় প্রচুর আছে। মহুয়ার উপাখ্যানে,

'নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভসুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই ॥'

এই চিত্রটি গ্রামীন এবং পাণ্ডিত্য বিবর্জিত কিন্তু কবিত্বপূর্ণ। বৈষ্ণব কাব্যে গোপিনীদের আক্ষেপের মধ্যে অনুরূপ চিত্রের সন্ধান অপ্রচুর নয়, কিন্তু কবিত্ব সৃষ্টিতে তাহাদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্যও নয়।

ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি বর্ণনার কতগুলি উদাহরণ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। রাধিকার সদাই ধেয়ানে মেঘপানে চেয়ে থাকা অথবা গোপিনীদের নীলপদ্ম দর্শনে অশ্রুপাত, এ সবই ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি বর্ণনার উদাহরণ। এই বর্ণনাগুলির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ফুটিয়ে তোলাই যদিও কবির প্রধান উদ্দেশ্য, তবু ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি চিত্র হিসেবে তাদের মূল্যও বড়ো কম নয়। অনুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনা চণ্ডীদাসের কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ভাবোচ্ছ্বাস ভরা কবির লেখনীর পক্ষে অনুভূতির আরোপ করে প্রকৃতি বর্ণনায় কৃতিত্ব দেখাবার ক্ষেত্রও অত্যন্ত প্রশস্ত, সুযোগও প্রচুর এবং সে সুযোগের অপব্যবহার চণ্ডীদাস করেন নি। শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শুনে শুধু রাধিকা এবং গোপিনীগণই ব্যাকুল হয়ে শুঠেন নি,

'যবে বেণুপুরে মৃগপাখী ঝুরে
পুলকে তরু পল্লব-পুষ্প-ফলে।'

তরু এবং মৃগপাখী গোপিনীদের সহিত একাত্মতা লাভ করেছে, তাদের পুলক অশ্রুধারায় এবং পল্লবও ফুল পুষ্পে প্রকাশিত হয়েছে। বংশীধ্বনি শুনে যমুনা নদীও উজান বয়ে চলেছে।

'রহে সে যমুন রহে নিরমল উজান হইয়া ভাল।'

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পূর্বরাত্রিতে প্রকৃতির নিকট গোপিনীগণ এবং যশোদার মিনতিতে প্রকৃতির অনুভূতিশীল রূপটি প্রকাশিত হয়েছে।

'গগনে দারুণ নিশি।
প্রভাত হইল বাসি ॥
নিশি তোরে করিয়ে মিনতি।
ঐছন থাকয়ে তুমি নিতি ॥
প্রভাত না হও তুমি চাঁদ।
বেকত-বহিত গতি ছাঁদ ॥

এ বর্ণনায় শুধু প্রকৃতিতে অনুভূতিই আরোপিত হয়েছে তা নয়, গোপিনীগণের ভাবোচ্ছ্বাস ক্রন্দনের সুরে স্পন্দিত হয়েছে। যশোদার মিনতিটি আরও সুন্দর।

'পবনে মিনতি বহু সাধি।
মন্দ মন্দ বাতাস সুসাধি ॥'

এই বর্ণনা দুটিতে চিরাচরিত উপায়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে প্রকৃতির অনুভূতি আরোপ সার্থক হয়ে উঠেছে। এই উদাহরণগুলি যেন পূর্ববর্তী কবিদের অক্ষম অনুকরণ নয়। নিশি, চাঁদ এবং পবন মানুষের মতোই অনুভূতি দিয়ে আমাদের সামনে এসে ছাড়িয়েছে।

সহানুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনায় কবি কৃষ্ণের বিরহে গোপিনীগণের সঙ্গে মৃগগণকেও কাঁদিয়েছেন, কোকিল এবং ভ্রমর সহানুভূতি জানিয়েছে গুঞ্জন বন্ধ করে। যশোদার কান্নায় প্রকৃতির সহানুভূতি।

'যশোদার করুণা শুনি গলিত পাষাণ মানি
মৃগ তরু কান্দয়ে ঝর্ঝরে।'

মিলনের আভাসে রাধিকার চিত্তের সঙ্গে আবার সমস্ত প্রকৃতিও সজীব হয়ে উঠেছে,

'কদম্ব তরুয়া ছিল বিরহ মদন হেন
সো ভেল সরস মান।

মিলনের পটভূমিতে সমস্ত প্রকৃতি বার বার আনন্দসূচক দৃশ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে,

'আজি মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহত
নিরমল চাঁদ প্রকাশ।'

প্রিয়তমকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ রাধিকার মন প্রকৃতির মধ্যে আপনার পরিপূর্ণ হৃদয়ের প্রতিকৃতি খুঁজেছে।

'এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদিত হউক চন্দ ॥'

আপনার আনন্দ উচ্ছল মনের সঙ্গে সহানুভূতি জানাবার জন্য এই আবেদনের সঙ্গে বিদ্যাপতির 'আজু রজনী হাম ইত্যাদি পদটির সাদৃশ্য আছে। প্রকৃতির অনুভূতির পরিচয় এই পদে ক্ষীণ হইলেও অনুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনায় এ-অংশগুলির প্রকৃত স্থান।

চণ্ডীদাসের নির্বিকার প্রকৃতি চিত্রগুলিও সুন্দর। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'এ রাধিকার মতো পদাবলীর চণ্ডীদাসে রাধিকার কিসলয় শয্যাও অগ্নির তাপ বিকীরণ করেছে বিরহ রাত্রিতে, চুয়াচন্দন এবং মৃগমদ বিষের মতো তাঁর শরীরে জ্বলেছে। উৎকণ্ঠিতা রাধার উক্তি,

'দুয়ারের আগে ফুলের বাগান কিসের লাগিয়া কলুঁ।
মধু খাই খাই ভ্রমর মাতল বিরহ জ্বালাতে মলুঁ ॥
জাতি রুইনু যূথি রুইনু রুইনু সুগন্ধ মালতী।
ফুলের বাসে নিদ নাহি আসে পুরুষ নিঠুর জাতি ॥'

প্রিয়তমের আশায় শয্যা সাজিয়ে প্রতীক্ষমানা রাধিকার নিকট মধুলোভী ভ্রমরের আনন্দ এবং পুষ্পের সুগন্ধ বিফল হয়ে গিয়েছে। নিষ্ঠুর প্রিয়তমের অভাবে এত আনন্দের দৃশ্যেও নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। একটি পদে রাত্রির জ্যোৎস্না রাধিকার অভিসার গমনে বাদ সেধেছে, সখীর নিকট বিরহখিন্না রাধিকা নিষ্ফল বেদনার পাত্র উজার করে দিয়েছে।

'কহিও বঁধুরে নতি কহিও বঁধুরে।
গমন বিরোধী হৈল পাপ শশধরে ॥'

শশধরের মধ্যে সহানুভূতিহীনতার আরোপ করে প্রকৃতিকে অনুভূতির অধিকারিণী করে তোলা হয়েছে।

নিছক প্রকৃতি বর্ণনায়ও চণ্ডীদাসের কাব্যে চণ্ডীদাস সুলভ বিশেষত্বেরই অভিব্যক্তি। আতিশয্য বা উচ্ছলতার প্রাধান্য তাতে নেই। কতগুলি প্রাকৃতিক উপাদান (যদিও এরা প্রকৃতিবর্ণনা বলে অভিহিত হতে পারে না) চণ্ডীদাসের কাব্যেই প্রথম উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে তারা বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রায় অক্ষয় আসনের অধিকারী হয়ে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। 'কদম্ব কানন', 'নীপমূল,' মাধবীতল,' তমালতরু', 'নবমল্লিকা', এবং 'গুঞ্জামালা' ইত্যাদি বৈষ্ণব সাহিত্যে একটা বিশেষ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। সে পরিবেশ রচনা বহুলাংশে চণ্ডীদাসের প্রতিভার দান।

চণ্ডীদাসের মতো ভাববিশিষ্ট একমনা কবির নিকট প্রকৃতির রুদ্র রূপের খুব বেশি আবেদন থাকতে পারে না। কারণ রুদ্ররূপের প্রকৃতি চিত্র অন্তরের যে উন্মত্ত কলরোল থেকে উদ্ভূত চণ্ডীদাস তার থেকে বহু যোজন দূরে বাস করেন। রাধাকে চণ্ডীদাস প্রথম থেকেই যোগিনী বেশে সাজিয়েছেন। কবির মনও শান্ত গভীর উদাসী। বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণবধের জন্য তৃণাবর্ত অসুরের বৃন্দাবনে আসার সময় কবি ভাগবতের অনুকরণে একটি ঝড় বর্ণনার প্রয়াস করেছেন। নৌকালীলায় ও ঝড়ের রূপ বর্ণনার আর একটি ক্ষীণ চেষ্টা দেখা যায়। দুটি ক্ষেত্রেই প্রথা রক্ষিত হয়েছে মাত্র। প্রকৃতি তার রুদ্ররূপ নিয়ে পাঠকের মনে আশঙ্কার ছায়া ফেলেনি।

মিলনের পটভূমিতে কবি কয়েকটি প্রকৃতি বর্ণনার অবতারণা করেছেন। বর্ণনাগুলি কাব্যবিচারে বিশেষত্বহীন। অধিকাংশ দৃশ্য সমধর্মী প্রকৃতি থেকে গৃহীত। ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য, চাতক চাতকীর মিলন উন্মাদনা, কোকিলের কণ্ঠস্বর, ফুল্লপুষ্পে ভ্রমরের ঝংকার প্রভৃতি প্রাচীন উপাদনেই সে প্রকৃতি বর্ণনা নিঃশেষিত। অবশ্য "রাইরাজা" দৃশ্যের বর্ণনায় কোনো নূতন উপাদান না ব্যবহার করেও কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রকৃতি নিজেই আপন অঙ্কনিবাসী পক্ষীদের সাহায্যে রাধিকাকে রাজবেশে সাজিয়ে দিয়েছে।

'ময়ূর ধরিল আড়ানি শিরেতে ময়ূরী ধরিল তা।
ফেকন ধরিয়া রাই শিরে দিয়া এই দুই রহল তথা ॥
রাজভাট ডাকে কোকিলা কোকিল ডাহুকী ডাহুক বলে।
ভ্রমর ঝংকারে শানাই শব্দ তাহা সে গাইল ভালে ॥

দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে বৃন্দাবনের সাধারণদৃশ্য, যমুনার তট এবং বংশীবটের কয়েকটি বর্ণনা চণ্ডীদাসের কাব্যে স্থান পেয়েছে। বর্ণনা-গুলিতে 'গোবিন্দ-লীলামৃত'এর প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সবকটিই পূর্ববর্তী বর্ণনার পুনরাবৃত্তি। যমুনার জলে হংসহংসিনী, চক্রবাক দম্পতী এবং সফরীর উল্লাসের কাহিনীও বাদ যায়নি। চণ্ডীদাসের অধিকাংশ প্রকৃতি বর্ণনা মিলনের পটভূমিতে, তবু দৈহিক মিলনাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিতপূর্ণ কোনো বর্ণনার পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই। বর্ণনার এই বিশেষত্বই চণ্ডীদাসকে অনেক কবি থেকে একটি স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছে। বিপ্রলব্ধা রাধিকার উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার পটভূমিতে কবি একটি প্রভাত বর্ণনা করেছেন,

'দুকান পাতিয়া ছিল এতক্ষণ বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি চমকি উঠিল রাই ॥
পাতায় পাতায় ঝরিছে শিশির সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া দেখলো সজনি, বঁধুর শব্দ শুনি ॥'

বর্ণনার উপাদান এখানে অপ্রচুর। প্রভাতের কোনো বিশদ চিত্র আঁকার প্রয়াসও নেই। তবু শুধু বঁধুর পদধ্বনি ভ্রমে প্রভাতের শিশির বিন্দুর মৃদুঝরন কবিত্ব সৃষ্টিতে সার্থক হয়ে উঠেছে। প্রেম-উন্মাদিনী রাধিকার ব্যাকুলতাকে প্রকাশের এর থেকে সুন্দর উপায় আর কিছু হতে পারত কিনা সন্দেহ। এরূপ বিরল অথচ গভীর বর্ণ বিন্যাসই চণ্ডীদাসের বিশেষত্ব। ঋতুবর্ণনার প্রচেষ্টা চণ্ডীদাসের কাব্যে স্বল্প। সকল ঋতু থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কবি মিলনাত্মক প্রকৃতি চিত্র এঁকেছেন কিন্তু বিশেষ কোন ঋতুর বিশদ বর্ণনামূলক চিত্রের সন্ধান চণ্ডীদাসের কাব্যে প্রায় নেই বললেই চলে। ভাব গভীরতা অনেক

সময় উপাদানের এই দৈন্যকে অন্যতর সুষমা দান করেছে। চণ্ডীদাসের বসন্ত রাধিকার উক্তিতে গভীর বেদনা বিধুর,

'সখিরে !

বরষ বহিয়া গেল বসন্ত আওল

ফুটল মাধবীলতা।

কুহু কুহু করি কোকিল কুহরে

গুঞ্জরে ভ্রমর যতা ॥'

বসন্তকে এখানে বিরহের ঋতুরূপেই আঁকা হয়েছে। ঋতুবর্ণনার উপাদান প্রাচীন এবং স্বল্প। কিন্তু রাধিকার অন্তরের ব্যাকুলতা 'প্লুতস্বর' সম্বোধনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহারাসের সূচনায় শারদ রাত্রির একটি বর্ণনা আছে। মালতীমল্লিকার গন্ধে মত্ত ভ্রমরগণ এবং চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল বনভূমির সংবাদ জানিয়েই সে বর্ণনার পাত্র নিঃশেষ হয়েছে। বিশেষ কোনো নূতনত্বের সন্ধান তাতে নেই। তবে ভাষার সারল্য চণ্ডীদাসের সনাতন বিশেষত্ব।

চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে একটি বর্ষাভিসারের চিত্রে,

'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা

কেমনে আইল বাটে।

আঙ্গিনাব কোনে বঁধুয়া তিতিছে

দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥'

এই চিত্রে বর্ষাবর্ণনার উপাদান প্রায় নেই, বর্ষার চিত্র অঙ্কনের প্রয়াসও স্বল্পতম। তবু একটি বাদল রাত্রির গভীর বেদনা যেন আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়। কেবলমাত্র শিশির পতনের শব্দের সাহায্যে কবি যে উপায়ে প্রতীক্ষায় জাগা রাত্রির শেষে একটি প্রভাতকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, এই বর্ষাদৃশ্যে সেই উপায়েরই নূতন এবং পরিপূর্ণতম পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কোনো বাঙালি কবি কেবলমাত্র ভাবের বর্ণনায় এমন সুন্দর প্রকৃতিচিত্র উপস্থাপিত করতে পারেন নি। এখানে কবি যেন তাঁর যুগের অগ্রগামী। তাঁর প্রতিভার ভবিষ্যৎ কাব্যের একটি বিশেষ রূপের সূচনা করেছে।

গোবিন্দদাসের পদাবলী : শব্দ মাধুর্য্যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির সার্থক অনুগামী এবং বহুস্থানে তাঁর প্রতিভা বিদ্যাপতির প্রতিভাকে অতিক্রমও করেছে। রূপবর্ণনায় এই অনুগমন এবং অতিক্রমণের তুলনা প্রচুর।

'কাজর ভরম তিমির জিনি তনুরুচি
নিবসই কুঞ্জ কুটীর।'

অথবা

'অঞ্জন-গঞ্জন জগজন-রঞ্জন
জলদপুঞ্জজিনিবরণা।
তরুণারুণথল- কমলদলারুণ
মঞ্জরীবঞ্জিত-চরণা ॥'

বিদ্যাপতির উপমাগুলিতে অবলুপ্ত প্রাচীন চিত্ররূপগুলির যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল গোবিন্দদাসের কাব্যে সেরকম প্রচেষ্টা নেই। বিদ্যাপতির মতো ভোগের ইঙ্গিতপূর্ণ যৌবন উচ্ছল রূপ বর্ণনাও গোবিন্দদাসের কাব্যে নেই। এক্ষেত্রে গোবিন্দদাস যেন চণ্ডীদাসের মন্ত্র-শিষ্য। ভাবানুষঙ্গী নিসর্গের সহায়তায় রাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণের ভাবময় দৈহিক রূপ আঁকার পরিচয় গোবিন্দদাসের কাব্যেও প্রচুর। গোবিন্দদাসের রাধিকার,

'জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর।

অথবা,

'জলধর হেরি সজল দিঠি চাহ।'

পূর্বরাগের ব্যথায় চণ্ডীদাসের রাধিকার অশ্রুর উৎস পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছিল, গোবিন্দদাসের রাধিকা অবশ্য অশ্রু বিসর্জন করেছেন। কিন্তু রাধিকার ভাবময় রূপ প্রকাশে দুই কবির একাত্মীয়তা বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনাও রাধিকার অনুরূপ ভাবগভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের,

'চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।

গোবিন্দদাসের রূপ বর্ণনার প্রাকৃতিক উপাদানগুলি সাধারণভাবে প্রাচীন। রাধিকার অঙ্গের কমনীয়তাকে অন্যান্য কবির মতোই গোবিন্দদাসও শিরীষ কুসুমের সহিত তুলনা করেছেন,

'শিরীষ কুসুম জিনি
তনু অতি সুকোমল।'

অলংকার বহুল রাধিকাব একটি রূপ বর্ণনা শুধু ভাবে নয় ভাষায়ও বিদ্যাপতির অনুকরণ করেছে,

'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনুতনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি।।
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ যুগ চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই।।…

যাঁহা যাঁহা তরুণ বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীলউৎপল ভবই।।
যাহা যাহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দকুসুম পবকাশ।।'

বিদ্যাপতিতেও আছে,

'যহা যঁহা পদযুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সবোরুহ ভরই।।
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুবি তরঙ্গ।।..

যঁহা যঁহা নয়ন বিকাশ।
তঁহি তঁহি কমল পরকাশ।।'

রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের যুগলরূপের তুলনাও গোবিন্দদাস পূর্ববর্তী বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের নিকট হইতে ধাব করেছেন। শ্যাম তমালে কনকলতা অথবা কমলে মধুপ ইত্যাদি চিত্রে নূতনত্ব নেই। সিন্দুর-বিন্দু শোভিত চিকুরদামের প্রেক্ষাপটে রাধিকার সুধাকর সদৃশ মুখ-মণ্ডলের তুলনা,

'সিন্দুর তরুণ অরুণ-রুচিরঞ্জিত
ভাল সুধাকর কাঁতি
সে ঘন চিকুর . তিমিরঘনচুম্বিত
ইহ অতি অপরূপ ভাতি।'

বিদ্যাপতির 'জনি রবি-শশী সঙ্গহি উগল পাছু কএ অন্ধকার' অথবা মুকুন্দরামের 'করিয়া তিমির মেলা, ধরিয়া কুন্তলছলা, বন্দী করিল নব ইন্দু'র সঙ্গে গোবিন্দদাসের চিত্রটি তুলনীয়। অবশ্য শব্দ মাধুর্যে গোবিন্দদাসের চিত্রটি হয়তো বা শ্রেষ্ঠ। নায়ক নায়িকার সৌন্দর্যের অন্যান্য উপাদান এবং বিভিন্ন অঙ্গের সৌন্দর্য বর্ণনায় গোবিন্দদাসের কাব্যেও চিত্রগুলিই অভিব্যক্ত কিন্তু প্রাচীন চিত্রগুলি অনেক সময় ছন্দ-মাধুর্য ও অলংকার বৈচিত্র্যে নূতন রূপ গ্রহণ করেছে। রাধিকার ভ্রূযুগলের সৌন্দর্য একস্থানে নয়ন কমলকে অবলম্বন করে বর্ণনা বৈশদ্যে নূতন হয়ে উঠেছে।—

'নয়ন কমল পব যুগল ভুজগবর
কাজর গরল উগা।র।'

নায়ককে ভ্রমর ও নায়িকাকে কেতকী কুসুমের সঙ্গে তুলনা গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিব কাব্য থেকে পেয়েছিলেন। বিরহখিন্না রাধিকার তুলনা বিদ্যাপতিতে 'হিম কমলিনী সম নেহ'। গোবিন্দদাস কালিদাস প্রযুক্ত অন্য আর একটি উপমার সাহায্য গ্রহণ করেছেন,

চাঁদকলা সম দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল।'

চৈতন্যদেবের রূপ বর্ণনায় গোবিন্দদাস তাঁর যে ভাবময় প্রেমন্মোত্ত চিত্র এঁকেছেন, বৈষ্ণব সাহিত্যেও তাঁর তুলনা দুর্লভ।

'নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদমকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥'

মেঘ নয়নের অশ্রুপাত, পুলক মুকুলে ভরা দেহকান্তি এবং স্বেদ মকরন্দ অবলম্বন করে কদম্ব বৃক্ষের সাদৃশ্যে সুন্দর চৈতন্যদেব একটি

বিকশিত ভাবরূপ নিয়ে পাঠকের মানস চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। পদতলে ভক্তগণের গুণগানও একটি বিশিষ্ট চিত্ররূপ লাভ করেছে,

'চঞ্চল চরণ- কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।

অন্যত্র চৈতন্যবেবের দেহকান্তির তুলনা,

'চম্পক শোন কুসুম কনকাচল
জিতল গৌর তনু লাবনিরে।'

ছন্দমাধুর্য এবং প্রকাশ ভঙ্গির নমনীয়তা এই রূপ বর্ণনা গুলিকে অপরূপ কবিত্ব দান করেছে। রূপবর্ণনার প্রকৃতি চিত্রের সাহায্য থাকিলেও, ভাবরূপই বর্ণনায় মুখ্য হয়ে উঠেছে।

গোবিন্দদাসের কাব্যে অনুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্র সহানুভূতি সম্পন্ন এবং নির্বিকার চিত্রগুলি জয়দেব বিদ্যাপতি এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কবিদেরই অনুরূপ। প্রথম দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে চোখের ভাষায় কি যেন বলেছেন। সেকথা বুঝতে না পেরে রাধিকা তার পরিপার্শ্বের সর্বত্র সহানুভূতিহীনতা আরোপ করেছেন, পূর্বরাগের বেদনার সঙ্গে সে নির্বিকার প্রকৃতিচিত্র মিলে রাধিকার চিত্তকে বিমথিত করে তুলেছে।—

'এ সখি কাহে ভেটল নন্দ নন্দন।
মন্দর গহন দহন ভেল চন্দন॥
তৈখন দক্ষিণ পবন ভেল বাম।
সহইনা পারিএ হিমকর নাম॥'

অন্যত্র রাধিকার মিলন আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমস্ত প্রকৃতি বিষবর্ষণ করেছে।—

'কিয়ে হিমকর কিয়ে নীর ঝরঝর
কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ
জলতহি চন্দন পঙ্ক॥'

পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব এস্থানে অত্যন্ত স্পষ্ট। মাধবের মথুরায় অবস্থিতির সময় সমস্ত প্রকৃতি রাধিকার বিরহ অবস্থার সঙ্গে সহানুভূতিশীল একাত্মতা লাভ করেছে,

'কুসুম তেজি অলি ভূতলে লুঠত তরুগণ মলিন সমান।
সারী শুক পিক মউরী না নাচত কোকিল না কক তহি গান॥'

অন্যান্য অনুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনে কবি কেবল মুরলীধ্বনি শ্রবণে যমুনার উজান বহার সংবাদ দিয়েছেন—কিন্তু সে সংবাদ কবিত্বের স্পর্শ লাভ করেনি। এর আগের বহুকাব্যে এই একই বর্ণনা বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিভিন্ন ঋতু বর্ণনার প্রাচুর্যে গোবিন্দদাস পূববর্তী বৈষ্ণবকবিগণ থেকে শ্রেষ্ঠ। কেবলমাত্র বর্ষা এবং বসন্তই নয়, শরত এবং শীতের প্রচুর বর্ণনাও গোবিন্দদাসের কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। শব্দ-ঝংকারের সাহায্যে ঋতুচিত্র অঙ্কনে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে অনুগমন এবং স্থানে স্থানে অতিক্রম করেছেন। বর্ষাবর্ণনায় এর চরম নিদর্শন। গোবিন্দদাসের বর্ষা-অভিসারের পদগুলি অতুলনীয়।—

'মন্দির তেজি যব চারি পদ আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দূরন্ত পথ হেরই না পা রয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুল কামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর রব খিয়ে ঝরঝর
হাম যাওব কোন পূর॥'

এই বর্ণনায় বর্ষা-অভিসারের দুঃখ এবং মিলনের দুরন্ত আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতা পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। শব্দচয়ন এবং পদলালিত্যে গোবিন্দদাসের এই পদগুলি পূর্ববর্তী সকল কবিকেই অতিক্রম করেছেন।

'ঝরঝর জলধর ধার ঝঞ্ঝা পবন বিহার।
ঝলকত দামিনী মালা ঝামরি ভৈ গেল বালা ॥
ঝাঁপি রহত তুহুঁ কাণ ঝনঝন বজর নিশান।
ঝিঁঙ্গরি ঝঙ্কর রাতি ঝঙ্ক সহনে নাহি যাতি ॥'

ইত্যাদি পদটির সহিত বিদ্যাপতির, 'গগনে অবঘন মেঘ দারুণ' ইত্যাদি পদটির ভাব ও ভাষা সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। কিন্তু শব্দ লালিত্যে গোবিন্দদাসেব শ্রেষ্ঠত্ব।

অন্যত্র,

'ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক।
চ৯ইতে খলয়ে সঘনে মহীপঙ্ক ॥'

বিদ্যাপতির,

'গগন সঘন মহীপঙ্কা
বিঘিন বিথারত উপজয় শঙ্কা ॥'

ইত্যাদি পদটির সুরই এতে পুনর্বার ঝংকৃত। বিবহের ঋতুরূপে বর্ষা চিত্রেব অবতাবণাও গোবিন্দদাসের কাব্যে রহিয়াছে,

'উয়ল নবনব মেহ। দূরে রহু শ্যামর দেহ ।।
তহিঁ ঘন বিজরী উজোব। হরি বঙু নাগরীকোর ॥
চাতক পিউ পিউ বোল। শুনইতে জীউ উতরোল ॥
দাদুরা উনমত ভাষ। বিবহিণী জীবন নৈরাশ ॥'

এই অংশটির প্রথম পংক্তিতে 'নব নব মেহ' রাধিকাকে শ্যাম অঙ্গের কথা স্মরণ কবিয়ে দিয়েছে। ভাবানুষঙ্গের সাহায্যে পদটির অর্থ হয়ে উঠেছে। চাতক, দাদুরী ইত্যাদি অবশ্য বর্ষাকাব্যেব প্রাচীন উপাদান।

গোবিন্দদাসের বসন্ত বর্ণনায়ও বিদ্যাপতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিদ্যাপতির মতো তাঁহার কাব্যেও কতগুলি বসন্ত বিলাসের পদ আছে। তবে বিদ্যাপতির কাব্যে ভোগবিলাসের ইঙ্গিত স্পষ্টতর। গোবিন্দদাসের কাব্যে সে বিলাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। শব্দ ঝংকারে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে সার্থক অনুকরণ এবং অতিক্রম করিয়াছেন।

'ঋতুপতি রাতি, উজরল চন্দ।
মলয় সমীরণ কুসুম সুগন্ধ ॥'

বিদ্যাপতির 'আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত' ইত্যাদি পদটিতে গোবিন্দদাসের উদ্ধৃত দুইটি পংক্তি অনায়াসে সংযুক্ত করে দেওয়া যেত। বিদ্যাপতির মত গোবিন্দদাস অবশ্য বসন্তকে মানবত্ব আরোপের দ্বারা প্রাণবান করে তোলেন নি, তবে মাঝে মাঝে সুন্দর বর্ণনায় বসন্তঋতু উজ্জ্বল বর্ণসম্ভারে সমুপস্থিত।—

'কাঁহা কাঁহা সারস হংস-নিসান।
কাঁহা কাঁহা চাতক পিউ পিউ ফুর।
কাঁহা কাঁহা উনমত নাচয়ে ময়ূর॥'

এরকম দু একটি বসন্তের উপাদানে অনেক বর্ষার উপাদান অনুপ্রবেশ করেছে। "প্রসিদ্ধি ত্যাগ" অলংকারে সমস্ত বর্ণনাটি ভাবাক্রান্ত। কিন্তু কবিত্ব সৃষ্টির চেষ্টা নিষ্ফল হয়নি। অন্য একটি বসন্ত বর্ণনায় সখীগণের বসন্তবিলাসে প্রকৃতিও যোগ দিয়েছে।—

'মত্ত কোকিল মুরলী তাহে বাওত
নাচন শিখিগণ মাতিয়া।
তেজি মকরন্দ ধাই বেঢল
মুখর মধুকর পাঁতিয়া।'

এই অংশটিতে বিদ্যাপতির,

'কুশল শত শত পাত মদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।'

ইত্যাদি পংক্তিগুলির সুর অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

"মহারাস" বর্ণনায় গোবিন্দদাস দুই একটি শুক্লা শারদ রাত্রির বর্ণনা দিয়াছেন। চণ্ডীদাসসুলভ সম্ভোগহীন বর্ণনা সে চিত্রগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।—

'শরদ চন্দ পবন মন্দ।
বিপনে ভরল কুসুম গন্ধ॥
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী।
মত্ত মধুকর ভোরণী॥'

এই চিত্রে শব্দমাধুর্য এবং ছন্দ ঝংকার মিলনের পটভূমিটি অপূর্ব হয়ে উঠেছে।

শীতকালীন অভিসারের কয়েকটি পদে গোবিন্দদাস শীতবর্ণনার অবতারণা করেছেন। বর্ণনাগুলিতে বিশেষত্ব কিছু নেই। অনেক স্থলে ব্যবহারিকতার স্পর্শে কবিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

'পৌখিনী রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিহে হিমকর হিম করু বন্ধ।।
মন্দিরে রহত সবহু তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে শয়ন কঝাঁপ।।'

এ বর্ণনায় প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনের বিশেষ কোনো চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। তবে ছন্দের ঝংকারে অনেক স্থলে শীতবর্ণনার পদগুলি কবিত্ব লাভ করেছে।

'হিমঋতু যামিনী যামুনক তীর।
তরল লতাকুল কুঞ্জ কুটীর।।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রবাসে পুরবঙ্গিনীদের বিরহবর্ণনা করা হয়েছে একটি "বারমাসিয়ার" সাহায্যে। গোবিন্দদাসসুলভ ছন্দ ঝংকারে পদটি অনুরণিত।—

'ভাদরে দর দর দারুণ দুরদিনে
ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর নিকরে থির নহ অন্তর
দহই মনোভব মন্দ

অন্যান্য ঋতুর প্রাকৃতিক উপাদানে অবশ্য কোনো নূতনত্ব নেই। কিন্তু আক্ষেপের সুরে অনেক ঋতুর বর্ণনায় অপরূপ সৌন্দর্যের স্পর্শ লেগেছে,

'আসিন মাসে বিকশিত পদুমিনী
সারস হংস নিশান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর
ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ।।'

চণ্ডীদাস সুলভ ভাবগভীরতা এবং ছন্দের অপূর্ব লালিত্য এ বর্ণনায় শ্রেষ্ঠ সম্পদ্।

জ্ঞানদাসের পদাবলী :—রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে প্রকৃতিচিত্র থেকে সাহায্য গ্রহণে জ্ঞানদাস পূর্ববর্তী কবিদেরই সার্থক অনুকরণ করেছেন। তাঁর রাধাকৃষ্ণের রূপের তুলনাগুলি প্রাচীন কিন্তু তবুও চণ্ডীদাসের মতোই নায়ক নায়িকার ভাব মূর্তি ফুটিয়ে তুলতে জ্ঞানদাসের দক্ষতা অসাধারণ। পূর্ববর্তী কবিদের মতো জ্ঞানদাসের কৃষ্ণও কুবলয়, অতসীফুল বা নবঘনরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। রাধিকার রূপও তড়িতের বর্ণ এবং শিরীষ কুসুমের কোমলতায় প্রকাশিত। সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্যের উপাদান কমল-বয়ান, মুকুতাদশন, তিলফুল নাসিকা, হরিণ-নয়ন, কদলী-উরু ইত্যাদির অভাবও জ্ঞানদাসের কাব্যে নেই। কিন্তু এই চিরাচরিত রূপবর্ণনাগুলি মাঝে মাঝে নায়কনায়িকার ভাবোচ্ছাসকে অবলম্বন করে তাদের ভাবরূপ অঙ্কনে সার্থক হয়ে উঠেছে।

'চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়াছে
ধরনে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙারিয়া মুখখানি মাজিয়াছে
না জানি তায় কত সুধা দিয়া॥'

অথবা,

'সজনি, আর কি লোকের ভয়,
ওচাঁদ বয়ানে নয়ন ভুলালো আর মনে নাহি লয়।'

ইত্যাদি পদ্যাংশগুলিতে রূপের উপাদানের অপ্রাচুর্য অথচ বর্ণনাগুলি ভাব সমৃদ্ধ। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবরূপ বর্ণনায় জ্ঞানদাস বিশেষ কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

'মেঘ জিনি ঘন গরজন।
সঘনে প্রেম বরিষণ॥
পুলকে বলিত সব তনু।
কেশর কদম্ব ফুল জনু॥'

গোবিন্দদাসের সহিত তুলনায় অলঙ্কারের আপেক্ষিক অনুপস্থিতি এবং শব্দ মাধুর্যের দীনতা সহজেই লক্ষ্যণীয়। কিন্তু তাতে কবির

উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়নি। চৈতন্যদেবের রূপ পাঠকে ভক্তের মর্মে প্রবেশ করেছে।

রূপ বর্ণনা ব্যতীত অন্যান্য রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনা জ্ঞানদাসের পদে অপ্রচুর। তবে অতি প্রাচীন চিত্রকেও সহজ ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা তিনি চণ্ডীদাস থেকে যেন উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন। অনেক রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র চণ্ডীদাস অনুসারী। গোষ্ঠ থেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনে ব্রজবাসীদের আনন্দের অভিব্যক্তি—

'ভুখিল চকোর চাঁদ জনু পাওল
মন্দিরে নাচয়ে ফের'রি।'

চণ্ডীদাসের 'চকোর পাওল চাঁদ' ইত্যাদি উপমাটির সঙ্গে এই অংশের তুলনা করা যায়। অন্যত্র রাধিকার আক্ষেপে নায়কনায়িকার সম্বন্ধকে মালতী ও মধুকবেব সঙ্গে তুলনায় কবি পূর্ববর্তী কবিদেরই অনুকবণ করেছেন,

'আছিনু মালতী বিহি কৈল বিপবীত
ভৈ গেল কেতকী ফুলে।
কণ্টক লাগি ভ্রমবা নাহি আওত
দূরে রহি দুহু মন ঝুরে।'

অনুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনায় জ্ঞানদাসেব পদে প্রায় নেই বললেই চলে। দুই একটি সহানুভূতিশীল অথবা নির্বিকাব যদিও বা থেকে থাকে, সেগুলি পূববর্তী কবিদেরই অনুকরণ মাত্র।

'মৃগমদ চন্দন লেপন বিখ।
মন্দ পবন যেন আনল লিখ॥'

অনুরূপ বর্ণনা পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে বহুবাব আলোচিত হয়েছে। অতি পরিচয়ের ফলে এদের কাব্য দীপ্তি পাঠকের অনুভূতিকে আর পরিতৃপ্ত করতে পারে না। পুরাতন বলেই এদের সৌন্দর্য পাঠক চিত্তকে আর উদ্দীপ্ত করেনা।

ঋতুবর্ণনায় জ্ঞানদাস প্রধানত বিদ্যাপতিরই সদৃশ। চণ্ডীদাসের

কাব্যের ঋতু বর্ণনা অপ্রচুর অথচ ভাবগভীর ঋতুবর্ণনা জ্ঞানদাসের পদে নেই। তবে গোবিন্দদাসের মতো তিনিও বিদ্যাপতিসুলভ ভোগ বিলাসময় বর্ণনা সর্বথা পরিহার করেছেন। বসন্তলীলায় আছে।—

'আওবরে ঋতু রাজ বসন্ত।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত ॥
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব।
মদন মধুৎসব পিককুল রাব ॥'

এই বসন্তচিত্রে দৃশ্যাঙ্ক এবং ভাষা মাধুর্যে বিদ্যাপতির অনুকরণ পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। তবে জ্ঞানদাসের অধিকাংশ বসন্ত বর্ণনাই মিলনের পটভূমিতে। সুতরাং মিলনানন্দের আবেগটি বসন্তদৃশ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে, সে আনন্দে আবেগের উচ্ছলতা নেই, সেখানেই জ্ঞানদাসের বিশেষত্ব।

'কুঞ্জলতা-পর সাজল ঋতুপতি
বহুবিধ বিচিত্র বিধানে।
কুসুম বিকাশল রাসস্থল ঝলমল
কানু শুনল নিজকানে ॥'

রাসলীলায় পূর্ববর্তী কবিদের মতো জ্ঞানদাসও শারদ দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। আর শারদদৃশ্য বর্ণনার প্রাচুর্যও জ্ঞানদাসের কাব্যের আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিশেষত্ব। রাসলীলার পটভূমিতে আনন্দ-উজ্জ্বল শারদদৃশ্য বর্ণনায় গোবিন্দদাসের সঙ্গেও জ্ঞানদাসের প্রচুর সাদৃশ্য আছে,

'মন্দ পবন কুঞ্জ ভবন
কুসুম গন্ধ-মাধুরী
মদন রাজ নব সমাজ
ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী ॥'

এবং

'ভ্রমর ভ্রমরী করত রব,
পিক কুহু কুহু করত রাব
সঙ্গিণী রঙ্গিনী মধুর বোলনি
বিবিধ রাগ-গায়নী।'

এই বর্ণনাগুলিতে গোবিন্দদাসের 'শরদচন্দ পবন মন্দ' পদটির সুর খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু অলংকার প্রয়োগ, ঝংকার সৃষ্টি এবং পদলালিত্যে জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের পর্যায়ে গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অসংবিবাদী। তবে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, ভাষায় সরস বর্ণনায় জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসধর্মী একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বর্ষাভিসারের বর্ণনায় জ্ঞানদাস প্রধানত বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসেব সমগোত্রীয়,

'মেঘ যামিনী অতি ঘন অন্ধিয়াব।
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি।
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি॥...

বারিখত ঝর ঝর থরতব মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেত গেহ॥'

বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের বর্ষাবর্ণনার সুর এই পদে প্রচ্ছন্ন আছে কিন্তু ধ্বন্যাত্মক শব্দের সাহায্যে বর্ষার ঝঞ্ঝনা এইস্থানে ততটা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়ে ওঠেনি। চণ্ডীদাসের 'এ ঘোব রজনী' পদটির ছন্দ ও সুরের অনুসরণে জ্ঞানদাস বিপ্রলব্ধা রাধিকার একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন। এ পদটির পটভূমিও বর্ষার,

'এ ঘোব রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহিনু বসিয়া
পথপানে নিরখিয়া॥'

চণ্ডীদাসের কাব্যে প্রিয়তমের অভিসারের দুঃখ রাধিকার বর্ষা বেদনাকে অপরূপ মাধুর্য দান করেছিল। জ্ঞানদাসের পদে বর্ষা-রজনীতে রাধিকার প্রিয়তমের জন্য প্রতীক্ষা কিছুটা যেন বিরহের পটভূমি রচনা করেছে। বিরহের পটভূমিতে বর্ষাবর্ণনাও জ্ঞানদাসের কাব্যে আছে।—

'কান্থ রহল পরদেশ।
জলদ সময় পরবেশ ॥
দামিনী দশদিক ধাব।
নিকরুণ কান্ত ন আ। ॥'

অথবা,

নিশি আন্ধিয়ার অপার ঘোরতর
ডাহুকী বজকল ডাক।
বিরহিনী হৃদয় নিদারণ ঘনঘন
শিখরে শিখণ্ডিনী রাব ॥'

এই পদগুলিতে পদাবলী সাহিত্যের বিরহের সুর ঝংকার স্পষ্টরূপেই ফুটে উঠেছে। কিন্তু জ্ঞানদাসের বর্ষাকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ একটি পূর্বরাগের পদে। বিদ্যাপতির 'সখি, হামার দুখের নাহি ওর' পদটির মতো এই পদটিও বৈষ্ণব সাহিত্য তথা সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে অক্ষয় স্থান লাভের অধিকারী। এই পদটিতে স্বপ্নদর্শনে রাধিকার পূর্বরাগ সঞ্চারের বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বরাগের আনন্দানুভূতির সঙ্গে কিছু বেদনারও আভাসও থাকে। পূবরাগের প্রথম সূচনায় আনন্দের সঙ্গে অকথিত অপূর্ণতার অনুভূতি নায়িকার হৃদয়কে মথিত করে। জ্ঞানদাসের পদটিতে আনন্দ ও বেদনা মিশ্রিত এই অনুভূতির পটভূমি বর্ষাদৃশ্যটি অবলম্বন করে অনুরূপভাবে প্রকাশিত হয়ে গভীর কবিত্বের রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে।

'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিম শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিঁদ যাই মনের হরিষে ॥
শিখরে শিখণ্ডরোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝিঁঝাঁ ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেন কালে ॥'

রিমিঝিমি বর্ষণক্লান্ত একটি বর্ষা রজনীর চিত্র অঙ্কনে শব্দচয়ন এবং

অনুভূতিব প্রকাশেব সবলতায এই পদটিব সৌন্দর্য্য উপলব্ধিব গভীবতম প্রদেশে প্রবেশ কবে পাঠকেব সমস্ত চিত্তে বহুক্ষণ এব অনুরণন ঝংকৃত হতে থাকে।

মঙ্গলকাব্য

বৌদ্ধ সাহিত্যেব তথা মধ্যযুগেব সব সাহিত্যেব মতোই মঙ্গলকাব্য গুলিও কোনো সাম্প্রদাযিক দেবতাব মাহাত্ম্য প্রচাবেব উদ্দেশ্যে বচিত। বৈষ্ণব সাহিত্য কিপ্রকাবে সে ধমসম্প্রদায সম্পর্কিত প্রযোজনেব উর্ধ্বে উঠেছিল, সেকথা যথাস্থানে আলোচিত হযেছে। কিন্তু মঙ্গল-কাব্যেব ক্ষেত্রে সে সুযোগেব পবিপূর্ণতা ছিল না সেই কাবণেই সহজ কবিত্ব প্রকাশেব ক্ষেত্র এদেব মধ্যে সীমাবদ্ধ। মঙ্গলকাব্যগুলি কিছু পবিমাণে তৎকালীন সমাজ এবং দেশেব ইতিহাস হযে উঠেছে কিন্তু অনিবার্য কাবণে সার্থক হযে উঠতে পাবেনি। প্রকৃতি প্রেমেব পবিচযও মঙ্গলকাব্যগুলিব মধ্যে ক্ষীণ। মঙ্গলকাব্যেব অবশ্য প্রকৃতিপ্রেম প্রকাশেব কতগুলি বিশেষভঙ্গি ছিল। বাবমাসেব বিবহ দুঃখ বর্ণনা প্রভৃতিব মধ্য দিযে চিবাচবিত উপাযে মঙ্গলকাব্যেব প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ কবেছে। বিষয বস্তুব গতানুগতিকতা এবং সংকীর্ণ প্রকাশেব ক্ষেত্রেব মধ্যেও কোনো না কোন কবি আপনাদেব কবিগনেব কিছু কিছু পবিচয দিযেছেন।

***বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল**ঃ প্রকৃতিব চিত্র থেকে নাবী সৌন্দর্যেব উপাদান সংগ্রহে বিজযগুপ্ত সংস্কৃত সাহিত্যেব অনুগামী মাঝে মাঝে বাচনভঙ্গিব কিঞ্চিৎ নূতনত্ব ছাড়া আব কোনো মৌলিকতা তাঁব কাব্যে নেই। তাঁব নাযিকাদেবও

'জিনিযা বান্দলী পুষ্প অমব সুন্দব।
কনক চম্পক জিনি শোভে কলেবব॥'

দৈত্যদেব ছলনা কবিবাব সময শ্রীকৃষ্ণেব মোহিনীরূপেব বর্ণনা,

---

*মঙ্গলকাব্যগুলির কালানুক্রম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এ আলোচনায সে বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করা হযনি।

'তেন অঙ্গ ভঙ্গ করে যেন রূপ গমন।
বিজলীর ছটা যেন পড়ে ঘনেঘন।'

রূপসীর চঞ্চল লীলায়িত ভঙ্গির সহিত বিদ্যুতের ক্ষণিক দ্যূতির তুলনা বৈষ্ণব সাহিত্যে অজস্র! বিজয়গুপ্তের কাব্যের নারীগণেরও নাসিকা তিলফুল, মুখছাদ চন্দ্রের ন্যায়, কলেবর চম্পক বরণ, বাহু হস্তীশুণ্ড, অধর বাঁধুলীপুষ্প, নয়ন চকোর অথবা খঞ্জনের সঙ্গে তুলনীয় আর,

'দাড়িম্বের বিচি যেন দন্ত ঝলমল।

গোবিন্দদাস. বিদ্যাপতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি প্রভৃতিব ন্যায় অধরের তুলনায় বিজয়গুপ্তও প্রবালের কথা স্মরণ করেছেন,

'বান্ধুলি জিনিয়া তার অধর মধুব।
তাহা চাপি প্রবালের দর্প করে চূর॥'

প্রথম যৌবন উন্মেষে বেহুলার ঈষৎ-স্ফুরিত বক্ষের সঙ্গে কবি পদ্ম-কুড়ির তুলনা করেছেন, সেই সঙ্গে তাব হৃদয়কে সরোবরের সঙ্গে তুলনা করায় বেহুলার অন্তবের গভীরতাও মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'অর্ধোত্থিত স্তনদ্বয় শোভে হৃদি পরি।
সরোবর মধ্যে যেন কমলের কড়ি॥'

অন্যান্য অনেক কাব্যেও এই চিত্রটির প্রয়োগ আছে, কিন্তু বৈশদ্য (details)এ বিজয়গুপ্তের উপমাটি কালিদাসসুলভ গভীরতার পরিচয় দিয়েছে। সুন্দরীর বেণী বন্ধনের সহিত ভূজঙ্গিনীর সাদৃশ অনেক কবিকে প্রলুব্ধ করেছিল। বিজয়গুপ্তের কাব্যেও আছে,

'পৃষ্ঠেতে দুলিছে বেণী ভুজঙ্গিণী প্রায়।

ভারতচন্দ্রের অনুরূপ চিত্রটি অলংকারে ভারাক্রান্ত,

'বিননিয়া চিকনিয়া বিনোদ কবরী।
ধরাতলে ধায় ধরিবাবে বিষহরী॥'

বৈষ্ণব কবিদের মতো বিজয়গুপ্তের পুরুষের রূপবর্ণনাও নারী সৌন্দর্যেরই অনুরূপ। লখীন্দরের খঞ্জন চক্ষু, তিলফুল নাসিকা এবং

চামরের ন্যায় কেশ। নারীর কোমল প্রাণের সহজাত ভয়কে কবি একটি সুন্দর উপমায় ভূষিত করেছেন,

'পদ্মাবতীর প্রাণ কাঁপে যেন কলার মঞ্জরী।'

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মণ বিশ্লেষণে এই উপমা কালিদাসের অনুগামী কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ স্বাভাবিক, কিন্তু নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক ভয়কে রূপ দেবার চেষ্টা অনেকাংশে সার্থক। উপমাটি অবশ্য কবির মৌলিক চিন্তা প্রসূত নয়। মূল রামায়ণে রাবণের কুপ্রস্তাব শুনিয়া সীতাও রোষে কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার উক্তি,

'ভএ কম্পো যেন নব কদলীর বালা।

নাবীসৌন্দর্য ছাড়াও কয়েকটি রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র বিজয়গুপ্তের কাব্যে আছে। তাদেব অধিকাংশই গতানুগতিক এবং বিশেষত্ব বর্জিত। শিবের প্রতি গৌরীব রোষযুক্ত নয়নের তুলনা,

'কোপে রাঙ্গা আঁখি যেন প্রভাতের রবি।'

রাঙ্গা আঁখির সহিত প্রভাতের রবির তুলনা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সাহিত্যে অজস্র পাওয়া যাবে। চাঁদসদাগরকে রূপে মুগ্ধ করে মহাজ্ঞান হরণেব পূর্বে মনসার উক্তি,

'চন্দ্র দেখি ফোটে যেন কুমুদের ফুল।
মোর রূপ দেখি চান্দ হউক আকুল॥'

চন্দ্র এবং কুমুদের সাহিত্যাশ্রিত সম্পর্কটি প্রাচীন। পদ্মাবতী শুধু রূপ নিয়েই চাঁদসদাগরকে ভোলাতে আসেননি, সঙ্গে মৃদঙ্গযুক্ত সংগীতও ছিল।

'মৃদঙ্গের রাগ যেন গর্জে জলধর।
পদ্মাবতী-গানে যেন গুঞ্জরে ভ্রমর॥'

এ তুলনাটির দুটি অংশের আনুপাতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে কবি সার্থক সৃষ্টি করতে পারেন নি। ভেলায় ভাসবার পূর্বে বেহুলার বিদায় গ্রহণের করুণ দৃশ্য।

'শ্রাবণের ধারা যেন ঝরিছে নয়ানী।
চরণে পড়িয়া বেহুলা চাহিল মেলানী॥'

অশ্রুর সহিত শ্রাবণ ধারার তুলনা অন্যান্য কবির কাব্যেও সুলভ। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে,

'মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে,
ঝরে তার পানী নয়নে গো ॥'

কৃত্তিবাসের রামায়ণেও রাম-বিচ্ছেদ অধীরা সীতার,

'শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর।'

হোসেনেব ক্রন্দনরতা বৃদ্ধ মাতার পুত্রশোক রোদনেদৃশ্যে একটি সুন্দর উপমা আছে

'ফুটন্ত ধুতুরার ফুল,
যেন দেখি দন্তমূল ॥"

পিতা কর্তৃক বনবাসে প্রেরিত হয়ে মনসা নিজের অসহায় অবস্থাকে একটি সুন্দর উপমার সাহায্য প্রকাশ করেছে। যদিও উপমার ভাব প্রবল নয়, আক্ষেপেব সুরই এক প্রাধান্য লাভ করেছে, তবু রূপকাত্মক প্রকৃতির উদাহরণরূপে এটি সার্থক।—

'জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল ॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষান আগুন হয় মোর কর্মফলে ॥'

পংক্তি কয়টিতে যে বিষাদের সুর বেজে উঠেছে তা পদাবলী সাহিত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চণ্ডীদাসের 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু' ইত্যাদি পদটির সঙ্গে এই অংশটির ভাব সাদৃশও লক্ষ্য করা যায়।

অনুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্রের পরিচয় বিজয়গুপ্তের কাব্যে নেই বললেই চলে। দুই একটি স্থানে প্রকৃতির মধ্যে ক্ষীণ অনুভূতি আরোপ করা হয়েছে মাত্র। প্রায় সবগুলিই সহানুভূতিশীল প্রকৃতি চিত্র। মনসা জন্মের পর প্রকৃতি তাহার হর্ষ শীতল বায়ুপ্রবাহে প্রকাশ করেছিল।

'উপজিল বিষহরী জগতের মাও।
দশদিকে প্রসন্ন শীতল বহে বাও ॥'

অন্যত্র বিবাহবেশে সজ্জিতা,

'বেহুলার দেখি ছাঁদ আকাশে উঠিল চাঁদ
পশ্চিমে নামিল দিনমনি।'

বেহুলার রূপ সজ্জা দেখে দিনমনির অস্তগমন এবং চন্দ্রের আবির্ভাবের মধ্যে শুধু নিসর্গের অনুভূতি প্রকাশ পায়নি, বেহুলার রূপের স্নিগ্ধতার প্রতিও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে!

বিজয়গুপ্তের কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনার স্থানও খুব বেশী প্রশস্ত নয়। তার মধ্যে কয়েকটি আবার কবি কর্ণপূরের ভণিতাযুক্ত। বর্ণনাগুলির মধ্যে নূতনত্ব বিশেষ কিছুই নেই। কোনো কোনো স্থলে বর্ণনা শুধু ফুল বৃক্ষাদির তালিকায়ই পরিসমাপ্ত। চাঁদ সদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবির সময় ঝড়ের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে ঝড়ের প্রচণ্ডতা মূর্তি পায় নি।

'বায়ু কোনে ডাকে মেঘ যেন দেখি নীল।
ঝড বরিষণ হইল আর পড়ে শিল॥'

এ বর্ণনায় পাঠকের মনে যে কোনো ভীতির সঞ্চার হয় না একথা বলা বাহুল্য। প্রকৃতির রুদ্র রূপের বর্ণনায় বাঙালি কবিদের সনাতন বিফলতা বিজয়গুপ্তকেও অধিকার করেছে। জরৎকারুকে প্রেমে মুগ্ধ করে মনসার সঙ্গে তার বিবাহ দেবার জন্য, কবি এক তপোবন দৃশ্যের পটভূমির সাহায্য নিয়েছেন। সে তপোবনের বর্ণনা।

'চক্ষু মেলি দেখে মুনি তপোবন চারু॥
শৃঙ্গ দিয়া হরিণে কামড়ায় হরিণীরে।'

এ বর্ণনার সঙ্গে কালিদাসের কুমারসম্ভবের অকাল বসন্ত বর্ণনার একটি পংক্তির মিল আছে। হয়ত সেই পংক্তিটিই বিজয়গুপ্তের আদর্শ ছিল,

'শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ।'

কিন্তু বিজয়গুপ্তের বর্ণনায় 'শৃঙ্গ দিয়া হরিণে কামড়ায়,' এই কথাটির মধ্যে কবিত্বপূর্ণ প্রকাশ ভঙ্গির অভাব পাঠককে পীড়িত করে।

ঋতুবর্ণনায় বিজয়গুপ্তের কাব্যে বসন্তই প্রধান। প্রকৃত পক্ষে আর কোনো ঋতুবর্ণনা তার কাব্যে নেই। বসন্ত বর্ণনাও গতানুগতিক। প্রথম বর্ণনাটিতে বিদ্যাপতির সাদৃশ আছে,

'হেনকালে ঋতুরাজ আসিল বসন্ত ॥
দুর্লভ বসন্ত ঋতু পরম সুন্দর।
বিকশিত নানা পুষ্প গন্ধে মনোহর ॥
মলয়া শীতল বায়ু বহে মন্দ মন্দ।
ভ্রমরা ঝঙ্কার করে পিয়ে মকরন্দ ॥'

এই বর্ণনায় কবির শব্দ চয়ন এবং প্রকাশ ভঙ্গির কৃতিত্ব কিছু পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে। মনসার জন্মের অব্যবহিত পূর্বে মহাদেবের চিত্ত চাঞ্চল্যের পটভূমিতে একটি বসন্ত দৃশ্যের অবতারণাও কবিজনোচিত হয়েছে। বসন্তের উপাদান মলয় বায়ু, কোকিল ইত্যাদির প্রতি কবির একটি স্বাভাবিক দুর্বলতা ছিল। ঝড়ের বর্ণনায়ও কবি বলেছেন 'মলয়া শীতল বায়ু বহে ঘনেঘন'। কোকিলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অবশ্য সকল বাঙালি কবিরই মূলধন। আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ 'শরৎ' কবিতায় শরৎকালেও কোকিলকে বাদ দিতে পারেন নি। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাঙালি কবিদের কাব্যের বায়স ধ্বনির পরিবর্তে কোকিলের ধ্বনি শুনেই চিরকাল নায়ক নায়িকাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাসের পদাবলী, গোপীচন্দ্রের গান, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে অসংখ্য উদাহরণ এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ করবে। বিজয়গুপ্তের কাব্যেও,

'রজনী প্রভাতকালে কোকিলের ধ্বনি।'

কোকিলের প্রতি বিজয়গুপ্তের পক্ষপাতিত্বের চরম পরিচয়,

'এইত জ্যৈষ্ঠ মাসে কোকিলে গায় সারি।'

জ্যৈষ্ঠ মাসে কোকিলের গান আর কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়নি।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল: বিজয় গুপ্ত অপেক্ষাও মুকুন্দরামের কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের অধিক অনুগামী। প্রকৃতি

প্রেমের পরিচয়েও সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট তার ঋণ অপরিমিত। বাঙলার প্রথম যুগের কবিদের মতো মুকুন্দরামের কাব্যে রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রেরই প্রাধান্য। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ধার করা চিত্রগুলিকে উপমা, ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অলংকারের সাহায্যে কবি তাঁর কাব্যে রূপ উপস্থাপিত করেছেন। অবশ্য রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রেই সে চিত্রগুলির পরিপূর্ণ সার্থকতা। রূপ বর্ণনায় মুকুন্দরাম অবশ্য বিশেষ কোনো মৌলিকত্ব দেখাতে পারেন নি। পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদেব রচনায় অনুরূপ বর্ণনার প্রাচুর্য থাকায় অনেক সময় চিত্রগুলি পাঠকের নিকট অতি পরিচয়ে মাধুর্য্যহীন। কিন্তু অলংকার প্রয়োগে কবি চিত্রগুলির প্রাচীনত্ব ঢেকে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। শ্রীমন্তের উপাখ্যানে খুল্লনার অভিসার দৃশ্যে কবি খুল্লনার রূপের পরিচয় দিয়েছেন। খুল্লনা 'কুঞ্জর গামিনী' পদে পদে মত্তমরালের ধ্বনি তুলে সে স্বামী সম্ভাষণে এসেছে। তার,

'বদন শরত ইন্দু তাখে শোভে বিন্দু বিন্দু
সুধা মণ্ডলেতে যেন তারা।'

এ অংশেব সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যে বহু আলোচিত নারীরূপের সাদৃশ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। খুল্লনার রূপ বর্ণনায় অন্যস্থলে কবি দুই একটি নূতন ধরণের উপমার প্রয়োগ করেছেন,

'কদম্ব কোরক জিনি খুলনার স্তন'
'ক্ষীণ মধ্যা যেমন মধুকরা'

অথবা

'কলাপি-কলাপ জিনি খুল্লনার কেশ।'

এই চিত্রগুলিতে সৌন্দর্যের উপাদানগুলির ইঙ্গিত যদিও প্রাচীন তবু কদম্বকোরক এবং মধুকরীকে এই রূপ বর্ণনার উপমান রূপে ব্যবহার করায় কবির নিজস্ব দৃষ্টি শক্তির পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে দশরথের মৃগয়া দৃশ্যে কলাপীদিগের কলাপ দশরথকেও প্রিয়ার রতিশ্রম বিগলিত পুষ্প-শোভিত শিথিল কবরীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। অন্য এক স্থলে কবি সুন্দরীর

কবরীকে নীলগিরির সঙ্গে তুলনা করেছেন। তুলনাটিতে গতানুগতিকতার স্পর্শ বহু পরিমাণে মুক্ত।

শ্রীমন্তের উপাখ্যানের দুটি স্থানে কমলেকামিনীর রূপবর্ণনা আছে। এই বর্ণনায় কবি তাহার অলংকার জ্ঞান এবং ধ্রুপদী (classical) রূপ বর্ণনার প্রতি পক্ষপাতিত্বের চরম পরিচয় দিয়েছেন।

'রাজহংসরব জিনি চরণে নপূর ধ্বনি
দশ নখে দশ ইন্দু ভাসে।
কোকনদ দর্পহর বেষ্টিও জাবক কর
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে ॥

অধর বন্ধুকবন্ধু বদন শরত ইন্দু
কুরঙ্গি চন্দন বিন্দুপদ।
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দুর ফোঁটা
তনুরুচি ভুবন মোহন।'

শুধু তাই নয়,

'করিয়া তিমির মেলা ধরিয়া কুন্তল ছলা
বন্দী করিলা নবইন্দু।'

অলংকারের প্রয়োগে কুন্তলের সহিত তিমির রাশির তুলনার প্রাচীনত্ব ঢেকে দেবার প্রয়াসে কবি সফল হয়েছেন। বন্ধক পুষ্পের সহিত অধরের তুলনা নূতন নহে, কিন্তু 'অধর বন্ধুকবন্ধু' কথাটির ছন্দ মাধুর্য চিত্রটিকে অনেকাংশে নূতনত্ব দিয়েছে। একস্থানে ভক্তের দুর্গতি শ্রবণে রোষযুক্ত দেবীর আঁখির তুলনা।—

'প্রভাত অরুণ বিলোচনা।'

বিজয়গুপ্তের, 'কোপে রাঙা আঁখি যেন প্রভাতের রবি'র সঙ্গে তুলনায় মুকুন্দরামের বর্ণনায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অধিক পক্ষপাতিত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

কালকেতুর উপাখ্যানের প্রারম্ভে দেবদেবীর বন্দনায় কবি যে রূপবর্ণনার অবতারণা করেছেন, তাতেও ধ্রুপদী (classical) সাহিত্য

জ্ঞানেরই পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'খঞ্জনগঞ্জন আঁখি,' 'কুরঙ্গগঞ্জন বিলোচন,' অথবা রামরম্ভা জিনি উরু' এবং উরুযুগ করিকর' ইত্যাদি অলংকার ঝলকিত প্রাচীন চিত্রেরই ছন্দোবদ্ধ রূপ। ফুল্লরার নিকট ছদ্মবেশী দেবীর আগমন দৃশ্যে দেবীর রূপবর্ণনা আছে।

'জিনি মৃগরাজ ক্ষীণ তোর মাঝ
হিলয় মলয় বায়।'

মৃগরাজের সহিত নারীর ক্ষীণ মধ্যদেশের প্রাচীন উপমাটিকে 'হিলয় মলয় বায়' এই আতিশয্যপূর্ণ উক্তির সাহায্যে পাংক্তেয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রীমন্তের রূপবর্ণনায় কবির বাঙালি সুলভ কোমলতা ফুটে উঠেছে।

দীর্ঘ যেন শালশাখী বিকচ কমল আঁখি
কলকণ্ঠ জিনি চারু ভাষা।'

এই বর্ণনার মধ্যে একমাত্র শালবৃক্ষের দৈর্ঘ্য ছাড়া শ্রীমন্তের পুরুষত্ব ব্যঞ্জক আর কোনো তুলনা ব্যবহার করা হয়নি।

নারী সৌন্দর্য ছাড়াও অনেক রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে। চিত্রগুলি কবিত্ব সৃষ্টিতে খুব সার্থক না হলেও প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যের আলোচনায় মোটামুটি উল্লেখযোগ্য। ধনপতি সদাগরকে খুল্লনার প্রতি অনুরক্ত দেখে ঈর্ষাপরায়ণা লহণার উক্তি।—

'না বুঝিয়া বাস গন্ধ লুবধ ভ্রমর ধন্ধ
বৈসে যেন সিমুলের ফুলে।'

সিংহলরাজের সহিত শ্রীমন্তের যুদ্ধের বর্ণনায় রণহস্তীর আগমনকে কবি একটি সুন্দর উপমায় ভূষিত করেছেন,

'কপালে সিন্দুর ফোঁটা আইসে মাতঙ্গ ঘটা
সিন্দুরিয়া যেন কাদম্বিনী।'

কালকেতুর মৃগয়াদৃশ্যে এই উপমাটিই ভিন্ন ভাষায় আবার প্রযুক্ত হয়েছে,

'ভয়ঙ্কর শ্যামল দন্তুর করিবর।
নব জলধর যেন আইলা ছাড়িয়া অম্বর।'

বর্ণনার বিশদ ব্যবহারে এবং অলংকারের ঝংকারে প্রথম উপমাটি অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। কালকেতুর উপাখ্যানেই গুজরাট আক্রমণের বর্ণনায় কবি এই উপমাটি তৃতীয়বার ব্যবহার করেছেন।

'ভীষণ অতি বড় আইসে গজ ঘোড়
সিন্দুরে মণ্ডিত মাথা।
সিন্দুরিয়া যেন মেঘ আইসে অতিবেগ
গগন ছাড়ি কিবা য়েথা ।।'

বর্ণনা বৈশদ্যে যদিও এ বর্ণনাটি প্রথমটির সমকক্ষ তথাপি ভাষার সৌষম্য এবং অলংকারের প্রয়োগে প্রথম বর্ণনাটির শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রতিহতই আছে। হস্তীর সঙ্গে মেঘের বর্ণ এবং আকার সাদৃশ্য কালিদাসের চোখেও ধরা পড়েছিল। মেঘদূতের প্রথম অংশে তাই কবি আষাঢ়ের নব মেঘকে উৎখাত কেলিতে প্রমত্ত মাতঙ্গের রূপ দিয়েছিলেন।

কালকেতুর উপাখ্যানে আরও কয়েকটি রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের প্রয়োগ আছে। অধিকাংশই সাধারণ এবং মৌলিকত্ব বর্জিত। একটি বর্ণনা কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং কবিসুলভ প্রকাশভঙ্গির বিশেষত্বে আমাদের মনোযোগ আকষণ করতে পারে। গুজরাটে কালকেতু নির্মিত দেবীর দেউলের বর্ণনা,

'ধবল চামর শিরে ত্রিসক পতাকা।
রাকাপতি বে'ড়ে যেন বুলয়ে বলাকা ।।'

পূর্ণিমা চাঁদের চতুর্দিকে বলাকা শ্রেণীর ভ্রমণ ভাষায় ধরে রাখার কবিত্বময় প্রয়াস সার্থক হয়েছে। মেঘের কোলে বলাকা-মালিকার পরিচয় কালিদাসের কাব্যেই পাঠককে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু পূর্ণিমারাত্রির চন্দ্রের চারিদিকে বলাকা শ্রেণীর ভ্রমণের সৌন্দর্য বাঙালি কবি স্বয়ং আবিষ্কার করেছেন বলে মনে হয়। মুকুন্দরামের কাব্যে কতগুলি সহানুভূতিশীল এবং নির্বিকার প্রকৃতিচিত্রের উদাহরণ আছে। পূর্ববর্তী কবির অনুকরণে অনুরূপ প্রাণহীন বর্ণনা অনেক কবির কাব্যেই আছে কিন্তু দরদী হৃদয়ের স্পর্শে এবং ভাষার মাধুর্যে সে বর্ণনাগুলির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাতেই প্রকৃত কবিত্বের পরিচয়। মুকুন্দরামের

কাব্যে স্থানে স্থানে প্রকৃতি চিত্রে অনুভূতি আরোপের ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে। সিংহলে ভক্তের মুক্তির জন্য দেবীর জবতী বেশে সিংহলরাজের সহিত যুদ্ধ বর্ণনায় দেবীর রূপ,—

'রুচির বরণ নবজলধর জিনি।
সিন্দুর তিলক ভালে শোভে দিনমণি ।
পদভরে উথলিল সমুদ্রের নীর।
সূর্যের রথের ঘোড়া হইল অস্থির ॥'

দেবীর রুদ্র রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমুদ্রের নীর উথলে ওঠার মধ্যে সহানুভূতিশীল প্রকৃতি চিত্রের আভাস আছে, যদিও এ চিত্রটি মৌলিক নয়। পূর্ববর্তী সংস্কৃত এবং বাঙলা কাব্যে এ ধরণের বর্ণনা আছে। নির্বিকার নিসর্গ বর্ণনার স্থানগুলি বিরহিনী খুল্লনার মানসিক পটভূমিতে উপস্থাপিত হয়েছে। সবগুলিই বসন্ত বিরহের উদাহরণ।

'দিনে থাকি গৃহ কাজে পাঁচজনা সখী মাঝে
যামিনী আইসে মোর কাল।
জলে বা মন্দির পথে প্রবেশ করয়ে কত
হিমকর-কর শর-জাল ॥
দুঃসহ মদন বাণে সাপ ডংসে তবু জিনে
শীতল চন্দন হলাহলে।'

বৈষ্ণব পদাবলীর বহু অংশের সঙ্গে এই অংশটির ভাব সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। 'শীতল চন্দন হলাহলে' কথাটির মধ্যে 'গীতগোবিন্দ' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর প্রতিধ্বনি আছে। অন্য একটি অংশের ভাবে এবং ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট।

'বৈরি কোকিলের স্বর মোর তনু জরজর
বন যেন পোড়ে দাবানলে ॥
শুতিলে নলিনীদলে কলেবর মোর্ জলে
জল দিলে নাহি প্রতিকার।
বৈরি কুসুম-বাণ আকুল করিল প্রাণ
পতি বিনে জীবন অসার ॥'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে

'দেখি পল্লব শয়নে।
আঙ্গার রাশি সমানে।'

এবং

'অহোনিশি মদন মারে তার শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহ্য করে ॥'

মদনশর হইতে আত্মরক্ষার জন্য নলিনীদলের বর্মের উল্লেখ অবশ্য মুকুন্দরামের কাব্যে নেই। অন্য আর একটি স্থানে একই ভাবকে সুন্দরতর ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম পংক্তি কয়টি উদ্ধৃত উদাহরণগুলিরই ভাষান্তর। শেষ অংশে আছে,

'অশোক কিংশুক ফুল হইল লোচন শূল
কেতকী কুসুম কামদূত।
কুসুমের উপবন আকুল করয়ে মন
ঝাট নাশ যাউক বসন্ত ॥'

বৈষ্ণবসাহিত্যে বসন্ত এবং বর্ষা উভয় ঋতুকেই বিরহের পটভূমিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং বর্ষাবিরহই বোধ হয় অনুভূতির গভীরতায় শ্রেষ্ঠ। মুকুন্দরামের কাব্যে কিন্তু বর্ষাবিরহের ইঙ্গিতও নাই। বিরহের রাজ্যে কেবলমাত্র বসন্তেরই একাধিপত্য।

প্রকৃতিকে অনুভূতিশীল করে তোলার জন্য মুকুন্দরামের প্রচেষ্টা দুএকটি বর্ণনায়ই নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তরুলতার প্রতি খুল্লনার মৃদু ঈর্ষামিশ্রিত উক্তি এবং সারী শুক, কোকিল ও ভ্রমরের প্রতি কটু বাক্যের ব্যবহারের মধ্যে নিসর্গকে অনুভূতিশীল করে তোলার প্রয়াস আছে। এই দৃশ্যগুলিরও অবতারণা বসন্তের পটভূমিতেই করা হয়েছে,

'লতায়ে বেড়িত রামা দেখিয়া অশোক।
খুল্লনা বলেন তরু তুমি বড় লোক ॥
সই সই বলি রামা কোলে কৈল লতা।
স্বরূপে কহিবে সই তপ কৈলে কোথা ॥
আমা হইতে তোমার জনম বটে ভাল।
তোমার সোহাগে সই বন কৈলা আলো ॥'

কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতির প্রতি সখীভাবের উদাহরণের যে পরিচয় আছে এখানের সে সখীভাবেরই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু অনুভূতি এবং কবিত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে এর কোনো তুলনাই চলে না। তবুও মহাকবির অতি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আছে বলেই এ বিষয়টি উল্লিখিত হল।

বসন্তঋতুর প্রতি কবির পক্ষপাতিত্বের প্রচুর নিদর্শন উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে আছে। ঋতুবর্ণনায়ও মুকুন্দরামের কাব্যে বসন্তেরই প্রাধান্য—আয়তন এবং রসসৃষ্টি উভয় দিক থেকেই। লহণা কর্তৃক ছাগ রক্ষণে নিযুক্ত সপত্নী খুল্লনার কাতর উক্তিটি একটি বারমাস্যার আকারে প্রকাশিত। ঋতুবর্ণনার চেয়ে ব্যবহারিকতার পরিচয়ই তার মধ্যে প্রবল। বর্ষার দুঃখ—

আষাঢ়ে পূরিল্ল মহী নব মেঘে জল।
ছাগল চরাতে প্রভু নাহি পাই স্থল॥...

শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥'

ব্যবহারিকতার প্রাবল্য এবং বর্ণনার দৈন্যে বর্ষাঋতুর কোন স্পষ্ট মূর্তি প্রকাশিত হয়নি। তবে আক্ষেপের সুরটি শুধু উল্লেখযোগ্য। এই বারমাসিয়ার বসন্তবর্ণনার স্থানটিই বোধ হয় সবাপেক্ষা সুন্দর,

'মধুমাসে মারুত-মলয় মন্দমন্দ।
মালতীয়ে মধুকর পীয়ে মকরন্দ॥
বনিতা-পুরুষ-অঙ্গ পীড়িত মদনে।
খুল্লনার অঙ্গ পোড়ে উদর দাহনে॥'

এই বর্ণনায়ও ব্যবহারিকতাই মূল সুর। অন্যস্থলে ব্যবহারিকতাকে উত্তীর্ণ হয়ে বসন্তবর্ণনাই প্রধান স্থান অধিকার করেছে,

'লোহিত পল্লবগণ রামার হরয়ে মন
দেখি মনে ভাবেন খুল্লনা।
বসন্ত আসিয়া কিবা অটবীর কৈল্ল শোভা
ভালে দিয়া সিন্দুর অর্চনা॥...

মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে কুসুম পড়য়ে বনে
অঞ্চলেতে ধরেন খুল্লনা।'

এই বর্ণনার মধ্যে আত্মময়তা (subjective reference) য় ক্ষীণ ব্যবহারিকতাটিতেও অনেকাংশে অনুভূতির স্পর্শ লেগেছে। আর একটু গভীরতা মণ্ডিত হলে এ বর্ণনা আত্মলীন দৃষ্টিতে পরিণত হতে পারত। বসন্ত এসে যেরূপ অটবীপ্রিয়ার ভালে সিন্দুব রচনা করে দিয়েছে, আমার প্রিয়তম এসেও কি সেরূপ আমাকে সোহাগে ভরে দেবেন—এতখানি অব্যক্ত সম্ভাবনা পশ্চাতে আছে বলেই বর্ণনাটি কবিত্বের স্পর্শ পেয়েছে। প্রকৃতির প্রতি খুল্লনার এই দৃষ্টি হৃদয়েব অনুভূতির রঙে রাঙানো। শ্রীমন্তকে প্রলোভনে বন্দী করে সিংহলে রাখবার জন্য সুশীলা কর্তৃক সিংহলের আনন্দময় বারমাসের বর্ণনারও একটি বারমাসিয়া স্থান পেয়েছে। প্রচুব ব্যবহারিকতার মধ্যে স্থানে স্থানে কবিত্বেব ক্ষণিক দ্যুতি সে বর্ণনার একমাত্র বিশেষত্ব। কালকেতুর উপাখ্যানের প্রথম অংশে হরপার্বতীর বিবাহ-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করবার জন্য মদন বসন্ত বায়ুব সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন।

'সঙ্গে লৈল্য সহচর বসন্তমারুত ॥
ফুলময় ধনু ফুলময় পঞ্চবাণ।
মধুকর কোকিল করএ কলগান ॥'

বসন্ত এস্থানে তাহার চিবচরিত রূপেই উপস্থাপিত উপরন্তু শিবেব মানসিক চাঞ্চল্যের পটভূমিতে বসন্তদৃশ্যের অবতারণা কবির মৌলিক চিন্তাপ্রসূত নয়। কালিদাসের কাব্য থেকে ধাব কবা। ছদ্মবেশী দেবীর নিকট ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ বর্ণানায়ও ব্যবহারিকতাই প্রধান সুর, ঋতু বর্ণনার উপাদানগুলি অন্তরালবর্তী।

'পুণ্যকর্ম বৈশাখেতে খরতর খরা।
তঁরুতল নাহি মোর করিতে পসরা ॥'

অথবা,

'মাঘে কুজ্ঝটিকা প্রভু মৃগয়াতে জায়।
আন্ধারে লুকায় মৃগ দেখিতে না পায় ॥'

ইত্যাদি প্রকট ব্যবহারিকতারই উদাহরণ।

শ্রীমন্ত-উপাখ্যানে ঋতুবর্ণনা ব্যতীত মাত্র তিনটি প্রকৃতি বর্ণনার উল্লেখযোগ্য। তিনটি দুইবার করে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি ঝড়ের বর্ণনা। ধনপতি এবং শ্রীমন্ত উভয়ের সিংহল যাত্রার পথেই একটি করে ঝড়ের দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনায় কবি তাঁর সনাতন বাঙালিত্ব প্রমাণ করেছেন।

'ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুরদুর॥'

বিজয়গুপ্তের মতো 'মলয়াশীতল বায়ু' না বহালেও, মুকুন্দরামের এ বর্ণনায় ভীতিসঞ্চার করবার মতো কোনো উপাদান নাই। কেবলমাত্র প্রথম পংক্তিটির কবিদৃষ্টি এবং প্রকাশভঙ্গির বিশেষত্ব কবির যশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

দ্বিতীয় প্রকৃতি চিত্রটি কালীদহ বর্ণনায় প্রযুক্ত হয়েছে কমলে কামিনীমূর্তি দর্শনের অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে। একই সময়ে ষড়ঋতুর একই সময়ে ষড়ঋতুর একত্র সমাবেশের সাহায্যে এটি মনোরম করবার চেষ্টা করা হয়েছে। 'কমল পরাগগৌর' ভ্রমরের ঝংকারে কোকিল কুলকে 'গীতসমাহিত মন' এবং চিত্রনির্মিত করে অঙ্কিত করার মধ্যে কল্পনার অবাধ বিচরণের পরিচয় আছে।

তৃতীয় এবং শেষ দৃশ্যটি সমুদ্রের উপর ভাসমান কাননের বর্ণনা। এ-বর্ণনায় কবির বসন্তের প্রতি পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পুনরায় প্রতিফলিত। কাননের লতাপুষ্প ইত্যাদি উপাদানের অধিকাংশই বসন্ত দৃশ্য থেকে সংগৃহীত। এই বর্ণনায় কেবলমাত্র ভ্রমরই 'পরাগগৌর' নয়,

'ক্ষণে উড়ে ক্ষণে বৈসে মত্ত মধুকর।
পরাগে ধূসর লতা-তরু কলেবর॥

কবির অনুভূতি এবং কল্পনার রঙেও এই দৃশ্যের ভ্রমর এবং লতা-তরু রঙীন হয়ে উঠেছে।

কালকেতুর উপাখ্যানে কোনো কবিত্বপূর্ণ প্রকৃতি বর্ণনা নেই। সৃষ্টি-বর্ণনায় এক স্থানে উদয়গিরি মেরু পর্বত এবং মন্দার প্রমুখ

পর্বতগণের সংস্থান সূর্য এবং গ্রহতারাগণের ভ্রমণের নিয়ম এবং গঙ্গার গতি ইত্যাদির পরিচয় দিয়ে একটি প্রকৃতিচিত্র উপস্থাপনের মহা-জাগতিক প্রকৃতি বর্ণনার সে প্রয়াস কিন্তু কবিত্বের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেন নি। নীলাম্বরের পুষ্পচয়ন দৃশ্যে অনেক প্রকার ফুলের নাম করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতিবর্ণনায় ক্ষীণতম গৌরবও সেখানে নেই। কালকেতুর রাজত্বকালে কলিঙ্গে ঝড়বৃষ্টির একটি বর্ণনা আছে। সে বর্ণনাও বিশেষত্ব হীন এবং একটি গ্রন্থের কলেবরের মধ্যেই পুনরুক্তি দোষে রসস্বাদ-বর্জিত।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর :

মুকুন্দরাম অপেক্ষাও ভারতচন্দ্র সংস্কৃতকাব্য এবং অলংকারের অধিক অনুসারী। নানাপ্রকার সংস্কৃত ছন্দকেই যে শুধু ভারতচন্দ্র বাঙলায় পাংক্তেয় করেছেন তাই নয়, বহুবিধ সংস্কৃত অলংকার এবং তৎসমশব্দের ঝংকার অনেক সময় সাধারণ পাঠক সমাজের কাছে তাঁর কাব্যকে কিছু পরিমাণে দুর্লভ করে তুলেছে। ভারতচন্দ্র যে-যুগের কবি সে-যুগে বঙ্গভাষার 'অলংকার বাহুল্যে স্বভাব স্বরূপ ঢাকা পড়িয়াছে'। এই যুগধর্ম প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ভারতচন্দ্রেরই কাব্যে। এ-যুগের সব বিশেষত্বগুলির ভারতচন্দ্রই প্রধানতম প্রতিনিধি।

রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের সাহায্যে নারীসৌন্দর্য বর্ণনায় এ যুগ-ধর্মেরই অভিব্যক্তি। উৎপ্রেক্ষা ব্যতিরেক ইত্যাদির অলংকারের সাহায্যে কালিদাস যে নারীসৌন্দর্যকে অপূর্ব মাধুর্যময় সংযমের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ভারতচন্দ্র অতিশয়োক্তি বক্রোক্তি ইত্যাদিতে সেগুলিকে রূপদিতে গিয়ে অনেক সময় কল্পনারকুহক জালে ফেলে প্রায় হাস্যস্পদ করে তুলেছেন। 'বুদ্ধি সাগর মন্থন করিয়া' রূপ বর্ণনার উৎপত্তি হতে পারে না। মুকুন্দরামের বর্ণনা।

'জিনীমৃগরাজ ক্ষীণ তোর মাঝ
হিলয় মলয় বায়।

এবং

'ছাড়ি মকরন্দে তোর মুখগন্ধে
কত শত ধায় অলি।'

ইত্যাদিতে যে আতিশয্যের আভাস ছিল, ভারতচন্দ্রে সেগুলিরই উগ্র আত্মপ্রকাশ। অন্নদার রূপবর্ণনা—

'কোটি শশী জিনি মুখ কমলের গন্ধ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধু লোভে অন্ধ॥…
… … …
কথায় পঞ্চমস্বর শিখিবার আশে।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারিপাশে॥
কঙ্কন ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥'

এই বর্ণনায় কবির পাণ্ডিত্যের পরিচয় যতই থাকুক একঝাঁক কোকিল ভ্রমর এবং খঞ্জনের মধ্যস্থিত সুন্দরীর রূপটি পাঠকের চোখে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আসে। বিদ্যার রূপবর্ণনায়ও এইপ্রকার আতিশয্যের পরিচয় আছে।—

'ভ্রমর ঝঙ্কারে শিখে কঙ্কন ঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চমস্বর ভাষে কোকিলারে॥'

রূপবর্ণনার প্রথম অংশে—

'শারদ পার্বন সীধুবরানন পঙ্কজ কানন মেদিনী।
কুঞ্জর গামিনী, কুঞ্জবিলাসিনী, লোচন খঞ্জন গামিণী॥

ইত্যাদি পংক্তিগুলি সংস্কৃত দেবীবর্ণনার সাদৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। সুন্দরী নারীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য এস্থানে অলংকারে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে আতিশয্যের পরম পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি ছাড়াও ভারতচন্দ্রের' কাব্যে সৌন্দর্য-বর্ণনার বহুল ব্যবহার আছে। সংস্কৃত এবং প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের সনাতন প্রাকৃতিক উপাদানগুলি সে বর্ণনার উপজীব্য। মুখচন্দ্র, কর এবং করতলপদ্ম, মৃণালবাহু, 'কমলকোরক কদম্বনিন্দক' বক্ষস্থল

কিছুরই অভাব নেই। তবে সব বর্ণনাতেই আতিশয্য এবং অলংকারের প্রয়োগের প্রশ্রয় আছে। ছদ্মবেশী অন্নদা-পাটনীর নৌকায় আরোহণ করে,

'বসিল নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥'

বহুব্যবহৃত একটি উপমাকে অলংকারের সাহায্যে নূতন রূপ দেবার এ চেষ্টা পাঠকের চিত্তকে কিছু পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে সমধর্মী একটি চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল। পদ্মের উপমেয় সেস্থানে নারীর মুখমণ্ডল,

'অঙ্গ ডুবাইয়া মুখ ভাসাইয়া জলে।
সরোবর শোভে যেন শতশতদলে॥'

বৈষ্ণবসাহিত্যে নায়িকাকে তড়িতের সহিত তুলনার উদাহরণ অজস্র স্থানে আছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাও,

'তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।'

শুধু তাই নয়, বিদ্যার রূপ তড়িৎকেও জয় করেছে,

'রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ॥'

ব্যতিরেক অলংকারের সাহায্যে এস্থানে বিদ্যার রূপকে উজ্জ্বলতর করবার প্রয়াস পাঠককে ক্ষণিকের জন্যও উচ্চকিত করে তোলে। বিদ্যার রূপের একটি বর্ণনা কালিদাস অনুসারী,

'আলুথালু লাজে কবরী খসি।
জলদের আড়ে লুকায় শশী॥'

"বিক্রমোর্বশী" নাটকে অন্ধকারের বুক থেকে জেগে ওঠা চন্দ্র রাজা পুরুরবাকে কুন্তলদাম অপসারিত করে প্রকাশিত প্রিয়ামুখের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। এস্থানে সে চিত্র-সৌন্দর্যকেই অন্যরূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

শুধু নায়িকাই নয় ভারতচন্দ্রের নায়কের উপমানও তড়িৎ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মেঘ।

'বরণ কালিম ছাঁদে বৃষ্টিজলে মেঘ কাঁদে
তড়িৎ লুটায় পায় ধরার আঁচলে।'

অন্যত্র সুন্দরের মুখমণ্ডলের তুলনা,

'বদনমণ্ডল চাঁদ নিরমল ঈষৎ গোঁপের রেখা।
বিকচ কমলে যেন কুতূহলে ভ্রমর পাঁতির দেখা॥'

অলংকার বিচারে এই তুলনাটি সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু তুলনাটির অন্তবর্তী আনুপাতিক দৃশ্যগুলির সম্বন্ধে সুষ্ঠুতার মধ্যে 'গোঁপ' কথাটি যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে, চিত্র এবং চিত্রিত বস্তুর ভাবসাম্য রক্ষা করতে না পেরে যেন পংক্তি দুটির ভাষা লজ্জায় অধোবদন।

বিদ্যা এবং সুন্দরের যুগলরূপকে কবি নানা উপমায় ভূষিত করেছেন।

'বিপরীত বিপরীত কি উপমা কব।
উর্ধ্বে কুমুদিনী হেটে কুমুদ বান্ধব॥'

কুমুদ এবং চন্দ্রের প্রীতির সহিত নায়ক-নায়িকার প্রেমের তুলনা নূতন নয়। বহুবার এ বিষয়টি আলোচিতও হয়েছে। কিন্তু এই সন্ধানে বিলম্ব হওয়া এবং ভূমিকা স্বরূপ প্রথম পংক্তিটির ব্যবহার চিত্রটিকে অলংকারশোভিত করেছে বটে কিন্তু ভাবগাম্ভীর্যের হানি করেছে বলে মনে হয়। অন্যত্র নায়ক সুন্দর,

'তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল।'
নলিনী যেন মত্ত করী ধরিল॥'

এই উপমাটি কালিদাসের নিকট হইতে ধার করা। মহাদেবের ক্রোধবহ্নি থেকে মুকুলিতাক্ষী পার্বতীকে হিমালয় যখন সরিয়ে দূরে নিয়ে আসছিলেন তখন কবির মনে হয়েছিল।

'সুরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং'

নলিনীর সহিত তুলনায় পার্বতীর মতো বিদ্যার কোমলতাও ফুটে উঠেছে প্রেমন্মোত্ত সুন্দরকে মত্ত করীর সহিত তুলনাও সুষ্ঠুতার পরিচায়ক কিন্তু সুরগজের সঙ্গে তুলনায় হিমালয়ের বিশালতা যেমন সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়েছিল সুন্দরের মধ্যে রূপের মধ্যে তেমন

বিশালতার সৌন্দর্য না থাকায় ইঙ্গিত (suggstion)-এর দিক দিয়ে ভারতচন্দ্রের উপমাটি তেমন সার্থক হয়নি; আর বর্ণনার বৈশিষ্ট্যের বিচারে দুটি উপমার তো কোন তুলনাই চলতে পারে না।' ব্যাসের সঙ্গে বিবদমান মহাদেবের রুদ্ররূপ ভারতচন্দ্র শুধু এঁকেছেন ধ্বন্যাত্মক শব্দের সাহায্যে,

'উর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা জর জর।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝরঝর॥
গর গর গজে ফণী জিহি লকলক্।
অর্ধ শশী কোটি সূর্য অগ্নি ধক্‌ধক্॥'

এটা রুদ্ররূপের বর্ণনার খুব উচ্চাঙ্গের উদাহরণ নয়, তবুও অনুরূপ ক্ষেত্রে অন্য কবিদের বিফলতার পরিপ্রেক্ষিতে এ বর্ণনাটি শুধু পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি লাভের অধিকারী।

সৌন্দর্যবর্ণনা ব্যতীত যে সকল রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রের উদাহরণ ভারতচন্দ্রের কাব্যে আছে, তাহাদের অধিকাংশ নিতান্ত মামুলী এবং সাধারণ এবং পূর্ববর্তী কাব্যে বহুল ব্যবহারে মলিন। বিদ্যার গর্ভসঞ্চারের ভাষা,

'উদর আকাশে শুত চাঁদের উদয়।'

এই তুলনাটির আকস্মিকতা পাঠকের মনকে ক্ষণিকেব জন্য স্তম্ভিত করে দেয়। অন্যস্থলে জরতীবেশী অন্নদার রূপ,

'ঝাঁকর মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধুলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি॥'

যে কেতকী কুসুমের সহিত আমাদের বর্ষাবেদনার সংস্কৃতি সংযুক্ত হয়ে আছে, তাকে এ ধরনের একটি উপমায় ব্যবহার করার জন্য কবির বিরুদ্ধে পাঠক মনের প্রতিবাদে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে।

'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে একটি নির্বিকার প্রকৃতি বর্ণনা আছে। বর্ণনাটি গতানুগতিক এবং উচ্চাঙ্গের কবিত্বের স্পর্শ বর্জিত। চন্দ্রমণ্ডল হইতে গরল বর্ষণ, মন্দাবায়ুতে বজ্রের জ্বালা, কোকিলের স্বরে সুতীক্ষ্ম তীর ইত্যাদির সংস্থানেই সেই প্রকৃতি চিত্রটি পরিসমাপ্ত। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সহানুভূতিশীল প্রকৃতি দৃশ্যগুলি তুলনায় সুন্দর। বিদ্যা এবং

সুন্দরের মিলনের প্রথম রাত্রির পটভূমিতে একটি সহানুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্রের বর্ণনা করা হয়েছে।

'কোকিল কোকিলা মুখে মুখ আরোপিয়া।
কুহু কুহু রব ধরে মদনে মাতিয়া॥
মুখে মুখে মধুকর মধুকর বঁধূ।
গুন্‌গুন্‌ গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু॥
চন্দ্রের অমৃত পিয়া মাতিয়া চকোর।
চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর॥'

প্রকৃতির এই মিলন দৃশ্য বিদ্যাসুন্দরের মিলনের আগমনীসূচক। মিলন-রজনীতে প্রকৃতিকে মিলনমুখর করে দেখবার চেষ্টা পূর্ববর্তী কবিদের ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সহানুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে এমন একটি দিক আছে, যাব সন্ধান সমগ্র পূববর্তী বাঙলা সাহিত্যে খুব চোখে পড়েনি। বিদ্যার কাছ থেকে সুন্দরের বিদায় গ্রহণেব বর্ণনা।—

'আসি বলি বাসায় বিদায় হৈল রায়।
কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায়॥

নায়িকার বিচ্ছেদকে প্রকৃতির সহানুভূতিসম্পন্ন বিচ্ছেদচিত্রে আরও করুণ করে তোলার চেষ্টা পূর্ববর্তী বাঙলা সাহিত্যে বোধহয় নেই। ভারতচন্দ্রের কবিত্বের এটি একটি বিশেষ দিক। অন্যস্থলে অভিমানিনী বিদ্যার প্রতি সুন্দরের উক্তি।—

'ছলকরি কহে কবি হের যে উদিত রবি
বিফলে রজনী গেল রামা।
তোর ক্রোধানল লয়ে চন্দ্র আইল সূর্য হয়ে
হের দেখ পোড়াইছে আমা॥'

বিদ্যার ক্রোধনলকে কবি জ্বলন্ত সূর্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে মানব মনের সঙ্গে প্রকৃতির সহানুভূতিসূচক একাত্মতা ফুটিয়ে তুলেছেন। নারী-সৌন্দর্য বর্ণনার মতো, প্রকৃতিচিত্র বর্ণনায়ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে আতিশয্যের প্রয়াস আছে। অধিকাংশ প্রকৃতি বর্ণনাই প্রায় সমধর্মী কোকিলের গান, ভ্রমরের ঝংকার, সরোবরে পদ্ম, ষড়্‌ঋতু ইত্যাদির

সমাবেশে তারা অলংকার-ভারাক্রান্ত। 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থের প্রথম দিকে হর-গৌরীর কাহিনী বর্ণনায় কবি হিমালয়ের একটি চিত্র পরিবেশন করেছেন। কালিদাসের 'কুমার সম্ভব' হয়তো তাহাকে এই চিত্র অঙ্কনে প্রলুব্ধ করেছিল কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁর বর্ণনা সামান্যতা দোষ-দুষ্ট। হিমালয়ের মহিমাণ্ডিত রূপ প্রকৃতি সে-বর্ণনায় ধরা পড়েনি। বাঙালি কবির দৃষ্ট চিরন্তন প্রাকৃতিক দৃশ্য দ্বারাই কবি হিমালয়কে সজ্জিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কোকিল এবং ভ্রমরও সে বর্ণনারও প্রধান উপাদান।—

'কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে মুনির মানস হরে।

প্রকৃতি বর্ণনার এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের কাব্যে একটি বিশেষ দিকের সন্ধান আছে। আধুনিক কালেরও খুব বেশি সংখ্যক কবি সে বিশেষ ভঙ্গির গর্ব করতে পারেন না। প্রাচীন এবং মধ্য-যুগের বাঙলাসাহিত্যে সে ভঙ্গিটি অন্য কোথাও নেই। স্থানে স্থানে ভারতচন্দ্র শুধু ছন্দ ও শব্দের ঐশ্বর্যে কোনো মহিমান্বিত চিত্র অঙ্কন করেছেন। রুদ্ররূপধারী শিবের জটায় প্রবাহিত গঙ্গার বর্ণনা।—

'লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল, টলট্টল, কলক্কল তরঙ্গা।।'

এইস্থানে বর্ণনা নয়, শুধু ব্যঞ্জনা দ্বারা কবি গঙ্গার একটি অপরূপ রূপ দিয়েছেন 'ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে—ছলচ্ছল, টলট্টল, কলক্কল তরঙ্গা এই ছত্রটিতে তরঙ্গের তিনটি গুণ নির্দেশ করা হইয়াছে, ছলচ্ছল জলের প্রবাহ-ব্যঞ্জক, টলটল জলের নির্মলতা ব্যঞ্জক, কলক্কল জলের নিক্কন-ব্যঞ্জক, গঙ্গাতরঙ্গের এইরূপ সংক্ষিপ্ত সুন্দর বর্ণনা বোধ হয় আর কোন কবি দিতে পারেন নাই।' এখানে ভারতচন্দ্র সত্যই 'ভাষার তাজমহল।'

বিজয়গুপ্ত এবং মুকুন্দরামের মতো ভারতচন্দ্রও বসন্ত ঋতুরই পূজারী। অন্যান্য ঋতুর বর্ণনা তাঁহার গ্রন্থে অল্পই আছে। শিবের পঞ্চতপের সময় বিভিন্ন মাসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে প্রকৃতিচিত্র উপস্থাপনের প্রয়াস অত্যন্ত ক্ষীণ।—

'বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।'

এই পংক্তিটি প্রবাদ বাক্যের সম্মান পেয়েছে। সুন্দরের স্বদেশ-গমনের প্রস্তাবে বিদ্যার উক্তিতে একটি বারমাসিয়া বর্ণনা করা হয়েছে।—

'কাল হয় একালের বিরহ হে।
কোকিলের কলধ্বনি, ভ্রমরের গণগণি
প্রলয় মলয় গন্ধ বহ হে॥
বিজলি জলের ছাট, মত্ত ময়ূরের নাট
মণ্ডুকের কৌতুক দুঃসহ হে॥'

বারমাসিয়ার এই ভূমিকাটিতে বিভিন্ন ঋতুর প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গী পরিচয় আছে। বর্ষা এবং বসন্তকে কবি বিরহের ঋতুরূপেই দেখেছেন। অন্যান্য বাঙালি কবিদের কাব্যের মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গির এই বিশেষত্বের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বসন্ত ব্যতীত এই বারমাসিয়াটির অন্যান্য ঋতু বর্ণনা সাধারণ পর্যায়ের। শ্রাবণ মাসের বর্ণনাটি অবশ্য সুন্দর,

'শ্রাবণে রজনী দিন এক উপক্রম।
কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম॥'

এই বর্ণনায় কবিত্ব এবং দৃষ্টি শক্তির পরিচয় আছে। বসন্ত ঋতু বিরহের ডালা নিয়েই এ বর্ণনায় উপস্থিত হয়েছে,

'বার মাস মধ্যে মাস বিষম ফালগুন।
মলয় পবন জ্বালে বিরহ আগুন॥

শিবের ধ্যানভঙ্গের আখ্যানে কালিদাস এবং মুকুন্দরামের ন্যায় ভারতচন্দ্রও বসন্তের পটভূমি সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই বসন্ত বর্ণনা গতানুগতিক। উচ্চাঙ্গের কবিত্ব এতে নেই। কাশীতে অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠানের সময় যে বসন্ত চিত্র আঁকা হয়েছে তাই বোধ হয় ভারতচন্দ্রের কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বসন্তচিত্র,

'কলকোকিল অলিকুল বকুলফুলে।
বসিল অন্নপূর্ণা মণি দেউলে॥
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢলঢল উছলে কূলে।...

কুসুমে পুনপুন ভ্রমর গুনগুন
মদন দিল গুণ ধনুক ছলে।'

কতকগুলি তরল শব্দ-বিন্যাসের দ্বারা এই পংক্তি কটিতে যে আনন্দময় উচ্ছলতার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, তা ভারতচন্দ্রের 'ভাষার তাজমহল' আখ্যাকেই গৌরবান্বিত করেছে। এ বর্ণনার শেষাংশে একটি কাবত্বপূর্ণ পংক্তি আছে,

'তরুগণ প্রফুল্ল কুসুম ছলে হাসে।'

কুসুমছলে তরুর আনন্দ প্রকাশ এবং কুহুধ্বনি ছলে অরণ্য রানীর বসন্ত দয়িতের আবাহন-গানের সহিত পাঠক কালিদাসের কাব্যেই পরিচিত হয়েছেন।

রামায়ণ-মহাভারত

রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি সাহিত্যের ইতিহাসে সাধারণত অনুবাদসাহিত্য বলে উল্লিখিত হয়ে থাকে। কিন্তু কাব্যগুলি যদিও মূল সংস্কৃত কাহিনীকে অনেকাংশে অবলম্বন করে থাকে, তবু এগুলি কোনোক্রমেই অনুবাদের পর্যায়ে পড়ে না। মূল কাহিনী থেকে এদের কাহিনী অংশ পরিবর্তিত, সম্প্রসারিত, এমন কি অংশবিশেষ পরিত্যক্ত বা অনেক নূতন কাহিনী সংযুক্ত হয়ে একটি নূতন আকার ধারণ করেছে। তাতে আঞ্চলিক বিশেষত্বগুলি বিশেষভাবে পরিস্ফুট। যে কবি এই বিশেষত্বগুলির কাব্যময় রূপ দিতে যতটা সক্ষম হয়েছেন ততটা স্থায়ী আসনই তার প্রাপ্য হয়েছে। কাব্য হিসেবে মহাভারত প্রাচীন, এমন কি বাংলাতেও "মহাভারত" অবলম্বনেই প্রথম নূতন কাব্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়েছিল। তবু পঞ্চদশ শতাব্দীর কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কাশীদাসী মহাভারত বাঙালি গ্রহণ করেছে। অন্য কাব্য থেকে গ্রহণীয় অংশগুলিও এ দুজনের কাব্যে সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণঃ—কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালির পরম আদরের সামগ্রী। বহুদিন ধরে এই গ্রন্থ বাঙালীর হাসি-কান্নার উপকরণ জুগিয়েছে। কাহিনী অংশ সংস্কৃত রামায়ণের অনুসারী হলেও,

কৃত্তিবাস গ্রন্থ রচনায় বহুস্থানে প্রচুর স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। বাঙালি কবির লেখনীর ছাপ এ গ্রন্থে স্পষ্ট আকারেই দেখা দিয়েছে। মূল রামায়ণে রামের বজ্রকঠিন ভুজদ্বয়ের উল্লেখ আছে কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামের,

'আজানুলম্বিত দীর্ঘ-ভুজ সুললিত'

এবং তিনি ফুলধনু হাতে কাননে ঘুরে বেড়ান। বাঙলার ভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্ম এবং শাক্তধর্মেরও অনেক প্রভাব কৃত্তিবাসী রামায়ণকে মূল রামায়ণ থেকে বিভিন্নতা দান করেছে। সেগুলি বর্তমান রচনাব বিষয় বহির্ভূত।

রূপবর্ণনার প্রাকৃতিক উপাদান সংগ্রহে কবির বাঙালীত্ব বিশেষ করে বৈষ্ণবত্ব প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। রাম ও সীতার রূপের তুলনা কবি সমধর্মী প্রকৃতিচিত্র থেকেই সংগ্রহ করেছেন। পুরুষত্বব্যঞ্জক কোনো রূপ বর্ণনা রামের আকৃতিকে গৌরবদান করেনি। সীতার মতোই তাহার চামর জিনিয়া চিকুর এবং মুখে চন্দ্রেব দ্যুতি। সীতার রূপবর্ণনায়, মরাল গমন, তিলফুল নাসিকা, হরিণ নয়ন এবং হিঙ্গুল বরণ অঙ্গুলির তুলনাও রামায়ণের বহুস্থানে আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের সকলপ্রকার রূপবর্ণনার উপাদানই রামায়ণে উপস্থিত। বৈষ্ণব কবিদের শিরীষ কুসুম কৃত্তিবাসের কাব্যে ব্যঞ্জনা এবং রূপ পরিবর্তন করে যূঁথি ফুল হয়ে উঠেছে,

'নির্মল কোমল অঙ্গ যেন যূঁথিফুল।'

জানকীর রূপের ছটায় বিজুলীর সাদৃশ্যটিও বাদ পড়েনি,

'জানকীর রূপে তথা পড়িছে বিজুলী।'

নারীমুখের শতদল-সুলভ সৌন্দর্য একটি অভিনব চিত্রের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সরোবরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত নারীদের তুলনা,

'অঙ্গ ডুবাইয়া মুখ ভাসাইয়া জলে।
সরোবর শোভে যেন শত শতদলে॥

বন্দিনী সীতার রূপবর্ণনায় একটি সুন্দর চিত্রের সাহায্যে কবি তাকে চন্দ্রমার সঙ্গে তুলনা করেছেন।—

'গায় মলা পড়িয়াছে মলিন দুর্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীন কলা।।
দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ।

এই অংশটিতে কালিদাসের কলামাত্র-শেষ চন্দ্র এবং কোনো কোনো বৈষ্ণব কবির সঙ্গে সাদৃশ্য সূচিত হয়েছে। বিবাহ সভায় রাম-সীতার যুগল মূর্তিব তুলনায় কবি চন্দ্র ও রোহিণীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। চিত্রটি অবশ্য কবিকে আবিষ্কার করতে হয়নি, রোহিণী ও চন্দ্রের সম্পর্কের ইঙ্গিত বহু প্রাচীন। বনগমনের সময় রামসীতার যুগলরূপের তুলনা বৈষ্ণব সাহিত্যের সাদৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়।—

'অগ্রে রাম যান, পাছে শ্রীরাম রমণী।
সজল জলদ সহ যেন সৌদামিনী।।'

রূপবর্ণনার দ্বারা ভীষণত্ব ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে কবি সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে বাঙালি কবিদের বিফলতা সনাতন। বাবণের রাজসভায় অঙ্গদের প্রবেশ বর্ণনা।—

'প্রকাণ্ড শরীর তার মন্দ মন্দ গতি।
পূর্বাচল হৈতে যেন এল দিনপতি।।
আকাশে দেউটি যেন দুই চক্ষু জ্বলে।'

এই বর্ণনায় বিরাটত্বের অতি সামান্য আভাস থাকলেও ভীষণত্বের কোনো পবিচয় নেই। অন্যত্র রাবণের হাসির তুলনা,

'দশমুখ মেলিয়া রাবণরাজা হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে।।'

কেতকী কুসুমের সহিত রাবণের দন্তপংক্তির যতই বর্ণসাদৃশ্য থাকুক না কেন, বর্ষা-বেদনার সংস্মৃতি (association)র সহিত যুক্ত হয়ে কেতকী কুসুমের মধ্যে যে-কোমলতা আরোপিত হয়ে গিয়েছে, তা আমাদের মন থেকে সমস্ত ভীষণতার ছায়া দূর করে দেয়। ভীষণ-দর্শন রাবণের হাসি তাই সার্থক কবিত্বরূপ লাভ করতে পারেনি। একস্থানে রামচন্দ্রের অশ্রুবর্ষণের সঙ্গে একটি সুন্দর চিত্রের সাদৃশ্যের অবতারণা করে কবি রামের উদার হৃদয়ের বিরাটত্ব ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা করেছেন। গ্রন্থের প্রথম অংশের চাচর-চিকুরশোভিত এবং

চন্দ্রমাদ্যুতি বিশিষ্ট রামের রূপ বর্ণনার সহিত এই অংশটির প্রভেদ প্রচুর,

'শ্রীরামের সর্বাঙ্গ তিতিল নেত্রনীরে।
ভাগিরথী বহে যেন হিমালয়ো পরে।'

চিত্র সৌন্দর্য এবং অর্থময় ইঙ্গিত এই বর্ণনাটিকে কবিত্ব মণ্ডিত করেছে।

রূপবর্ণনা ব্যতীত অজস্র রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের সন্ধান রামায়ণে আছে। বাণবর্ষণের সহিত বর্ষামেঘের ঝরন অথবা নিক্ষিপ্ত তারকার গতির তুলনাও আছে অগণিত স্থানে। নয়ন জলের সহিত শ্রাবণ মেঘেব বর্ষণের সাদৃশ্যের উল্লেখ বহুবার আছে,

'নেত্রনীর ঝরে যেন শ্রাবণের ধারা।'

লক্ষ্মণের রক্তাক্ত অঙ্গের ভীষণতাকে কবি একটি উপমার সাহায্যে অন্য বাঙ্গালি কবিদের মতোই কমনীয় করে তুলেছেন,

'লক্ষণের অঙ্গ যেন বক্ত পদ্মমালা।'

যুদ্ধক্ষেত্রের রক্তপ্রবাহকে ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গাব উচ্ছলতার সঙ্গে তুলনায় অনুরূপ কোমলতাই প্রকাশ পেয়েছে,

'বক্তময় হৈল সকল যুদ্ধস্থল।
ভাদ্রমাসে গঙ্গা যেন করে টলমল॥

সীতাহরণের সময় সীতার ছিন্ন হারের তুলনায় কৃত্তিবাস মূল রামায়ণেরই অনুকরণ করেছেন,

'ছিঁড়িয়া ফেলেন মণিমুক্তার সে ঝরা।
হিমালয় শৈলে যেন বহে গঙ্গাধারা॥'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং অন্যান্য কাব্যে এই উপমাটি অনুকরণের উল্লেখ যথাস্থানে করা হয়েছে।

মূল রামায়ণে সহানুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্র একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল, যথাস্থানে তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কিন্তু সহানুভূতিশীল নিসর্গবর্ণনা প্রায় অনুপস্থিত। দু-একটি বর্ণনা যাও আছে, সেগুলিও নিতান্ত অপরিণত। সীতার বনবাসের সংবাদে প্রকৃতির সহানুভূতি জ্ঞাপন,

'নদী স্রোতে ছাড়ে, লোকে ছাড়িল আহার।
দিবস দুপুর হৈল ঘোর অন্ধকার ॥
সূর্যের কিরণ ছাড়ে পৃথিবী মণ্ডল।
সীতার বিদায় দেখি বৃক্ষ ছাড়ে ফল ॥'

সীতার বিরহে রামচন্দ্রের নিকট মাল্যবান গিরির প্রাকৃতিক শোভা নির্বিকার রূপে উপস্থিত হয়েছিল। সে বর্ণনাটির কবিত্বও অপরিণত। অন্যত্র রামচন্দ্রের উক্তিতে নিসর্গের নির্বিকার রূপ,

'ভ্রমর ঝঙ্কার আর কোকিলের ধ্বনি।
শুনিলে হইত জ্ঞান দংশে যেন ফণী ॥

নিসর্গের অনুভূতিশীলতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় অন্যপ্রকার উপায়ও স্থানে স্থানে অবলম্বন করা হয়েছে। কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ যাত্রার সময় সমস্ত প্রকৃতির মনে একটি গভীর আশঙ্কা সঞ্চারিত করে কবি তাকে অনুভূতিশীল করে তুলেছেন।—

'আকাশের চন্দ্র খসে বায়ু মন্দ গতি।
মেঘে রক্ত বরিষয় কাঁপে বসুমতী ॥
...সাগর উথলে।'

মূল রামায়ণে প্রকৃতিবর্ণনার গতানুগতিকতার আলোচনা আমরা আগেই করেছি। কিন্তু সে-বর্ণনায় একটি আভরণ বিলাসের পরিচয় (decorative character) ছিল; প্রকৃতির নিরাভরণ রূপের পরিচয়ও স্থানে স্থানে আভাসিত হয়ে উঠেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রকৃতি-বর্ণনাও গতানুগতিক; উপরন্তু তাতে প্রকৃতির নিছক নিরাভরণ রূপের কোনো আভাস নেই। বিশেষ করে অরণ্য দৃশ্যগুলি যেন বাঙলার বৃক্ষপুষ্পাদি শোভিত উদ্যান দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। দণ্ডকবনের পথের বর্ণনা,—

'ফুল্ল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত।
ময়ূরের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত ॥
নানাপক্ষী কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর ॥

সুন্দর কাণ্ডের যে স্থানে মূল রামায়ণে একটি সমুদ্র বর্ণনা আছে,

কৃত্তিবাসও সেস্থানে একটি সমুদ্র বর্ণনার অবতারণ করেছেন, কিন্তু মূল রামায়ণের বৈশদ্য (details) এবং আভরণ-সজ্জা (decorative-ness) সে বর্ণনায় নেই। উপরন্তু বর্ণনায় কোনো বিরাটত্বের ইঙ্গিতও অনুপস্থিত।

ঋতুবর্ণনার সংস্থান হিসাবে কৃত্তিবাস বহুলাংশে মূল রামায়ণের অনুকরণই করেছেন। রামের বিরহের পটভূমিতে বর্ষা শরৎ ইত্যাদির বর্ণনা মূল রামায়ণেও আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও মোটামুটি তাকেই অনুসরণ করা হয়েছে। তবে মূল রামায়ণের কবি ঋতুবর্ণনায় যে কবিত্ব দেখিয়েছেন ভারতীয় সাহিত্যে তথা বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা বিরল। কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই বর্ণনাগুলি সাধারণ এবং গতানুগতিক। বর্ষাকালে সীতা-বিরহের দুঃখ এবং কপিসৈন্যের অসুবিধার কথাই কৃত্তিবাস বেশি করে ভেবেছেন—বষাবর্ণনাব তেমন কোনো প্রয়াস নেই। বর্ণনাগুলিতে মঙ্গলকাব্য সুলভ ব্যবহাবিকতাব স্পর্শ লেগেছে।

'চতুর্দিকে জলস্থল সব একাকাব।
কেমনে পাইবে কপি সৈন্য আগুসার ॥
জলধর নিরন্তর বরিষে আকাশে।
জলমগ্না ধরণী ; ধরণীধর ভাসে ॥'

বর্ষাবিরহ মানব-মনে বেদনার যে শাশ্বত গভীর রাগিনী বাজিয়ে তোলে, তার পরিপূর্ণ ইঙ্গিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে আশা করা যায় না। তবু সে বর্ণনায় যে-গভীরতা বৈষ্ণবকবিরা আয়ত্ত করেছিলেন, কৃত্তিবাস সেখানেও পৌছাতে পারেন নি। বর্ণনায় ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতিচিত্রও আছে,

'সজল জলদেশোভে বিদ্যুৎ যেমন।
জানকী আমার কোলে ছিলেন তেমন ॥'

মূল রামায়ণেও মেঘের কোলে বিদ্যুৎ দেখে রামের রাবণের ক্রোড়ে অপহ্রিয়মানা সীতার সাদৃশ্য মনে পড়েছিল।

কৃত্তিবাসের শরৎ বর্ণনাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মূল রামায়ণের মতো বিশদ নয়, গভীরও নয়।

'ভেকের নিনাদ গেল মেঘের গর্জন।
নির্মল চন্দ্রমা তারা প্রকাশ গগন ॥'

এই ক্ষুদ্র স্বল্প প্রয়াস ছাড়া উল্লেখ করবার মতো আর কোনো অংশ শরৎ-বর্ণনায় নেই। বিরহীচিত্তের পটভূমিতেই এই শরৎ-বর্ণনার অবতারণা। কাজেই স্থানে স্থানে এই বর্ণনা ব্যবহারিকতার স্পর্শেও মলিন।

অন্য কোনো ঋতু-বর্ণনা রামায়ণে নেই। বসন্ত ঋতুর উপাদান কোকিল, পুষ্প ইত্যাদির উল্লেখ বহুস্থানে আছে কিন্তু বসন্তদৃশ্য বর্ণনার স্বতন্ত্র কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের সাত সহস্র বর্ষ মধুচন্দ্র যাপনের বর্ণনায় একটি ষড়ঋতুব চিত্র আছে। কিন্তু সে-অংশ ঋতু বর্ণনার গৌরব-দীপ্তি লাভ করেনি।

কাশীরামদাসের মহাভারত ঃ—ভারতচন্দ্রের যুগের কাব্যে ভাবের চেয়ে ভাষা চাতুর্যের, সরলতার সৌন্দর্য অপেক্ষা অলংকারযুক্ত চিত্র ব্যবহারের যে চরমত্ব দেখা গিয়েছিল তার প্রথম উদ্যম মুকুন্দরামের কাব্যেই বীজাকারে নিহিত ছিল। কাশীরামদাসের রচনায় সে উদ্যমের বিকাশ ঘটেছে। বর্ণনায়, বিশেষ করে রূপ বর্ণনায় কাশীরামও ভারতচন্দ্রসুলভ আতিশয্যের আভাস দিয়েছেন। দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনার প্রকৃতিচিত্র,

'নেত্রযুগ মীন, দেখিয়া হরিণ লাজে দোঁহে গেল বন।
সুচারু ভ্রূলতা দেখি পায় ব্যথা মদনের শরাসন ॥···
কণ্ঠ দেখি কম্বু প্রবেশিল অম্বু অগাধ অম্বুরি মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল ভুজ দেখি ব্যাল প্রবেশিল বিলে লাজে ॥'

অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী রূপের বর্ণনা,

'কোকনদ জিনি পদ মনোহর গতি।···
যার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিবৃন্দ।
লাখে লাখে পড়ে ঝাঁকে পেয়ে মধুগন্ধ ॥'

বর্ণনার এই আতিশয্যে ভারতচন্দ্রের আভাস সূচিত। পূর্ববর্তী কবিদের মতো সাধারণ রূপবর্ণনাও কাশীরামদাসের কাব্যে স্থান

পেয়েছে। নারীদের শিরীষ পুষ্পসুলভ কোমলতার সাদৃশ্য তাকেও প্রলুব্ধ করেছিল।

'শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।'

অন্যত্র বৈষ্ণব কবিদের মতো নায়ক নায়িকার যুগলরূপ বর্ণনায় মেঘ ও বিদ্যুতের চিত্রটিকে কবি ব্যবহার করেছেন,

'বিদ্যুৎ বরণী ভদ্রা পার্থজলধর।
বিদ্যুতের প্রায় পশে মেঘের ভিতর॥'

গতানুগতিক রূপবর্ণনা যথা কুরঙ্গনয়ন, কদলীউরু, তিলফুল নাসিকা ইত্যাদির অভাবও কাশীরামদাসের কাব্যে নেই। রূপবর্ণনার সাহায্যে পুরুষের বিরাটত্ব ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসও আছে। প্রথম দর্শনে হিড়িম্বার চোখে ভীমের রূপ,

'কিবা সুমেরুর চূড়া যেন শালদ্রুম কোড়া
'শশীমুখ পঙ্কজ নয়ন।'

কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধদৃশ্যে কর্ণের বাণে অর্জুনের কিরীট কাটা যাবার একটি সুন্দর উপমায় ভূষিত করে কবি অর্জুনের রূপের বিরাটত্বের আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন।

'গিরি হতে চূড়া পড়ে খসি।'

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের বিরাটত্ব ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াসটিও কিছু পরিমাণে উল্লেখযোগ্য,

'ঢাক ঢোল শব্দে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
মেঘবর্ণ শীর্ষ তার পরশে আকাশ।
রবি শশী দুই চক্ষু অতি সুপ্রকাশ॥
মুখ তাঁর বৈশ্বানর দন্ত তারাগণ।'

কিন্তু প্রকৃতির বিরাট বস্তুনিচয়ের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের চিত্র অঙ্কন অবশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়নি। বিরাটের মধ্যে যে রহস্যময়তা আছে, কবির ভাষায় সে রহস্যময়তার আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। অন্যান্য রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনার প্রচুর নিদর্শন কাশীরামদাসের কাব্যে আছে কিন্তু অধিকাংশ চিত্রই প্রাচীন। ক্রোধে কম্পিত দেহকে কদলীপত্রের কম্পনের সঙ্গে তুলনা, অবিরত বাণ বর্ষণকে বর্ষার মেঘ

বর্ষণের সাদৃশ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা—এগুলিতে মৌলিকত্ব নেই। একটি উপমায় নয়নের ধারাকে মেঘবর্ষণ এবং বৈষ্ণব কবিদের মতো রোমাঞ্চিত দেহকে কদম্বপুষ্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

'বারিজ নয়নযুগে বহে বারি যেন মেঘে
পুলকে কদম্বপুষ্প অঙ্গ।'

বাণবর্ষণের অন্তরালে বীরের অস্পষ্ট মূর্তিকে কবি একটি সুন্দর উপমায় রূপ দিয়েছেন,

'এত বলি ক্রুব অস্ত্র বরিষয়ে বীরবং।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদয়ে যেন গিরিবর।'

এই চিত্রটিতে যুদ্ধরত বীরদের পর্বতপ্রমাণ বিরাটত্বও সূচিত হয়েছে। মূল মহাভারতের অনুকরণে নলোপাখ্যানের মধ্যে কবি অতিশয়োক্তির সাহায্যে রথচক্রের ধ্বনিকে মেঘমন্দ্রের সহিত তুলনা করেছেন।

'আকাশে আইসে রথ মেঘের গর্জনে।
মেঘ অনুমানে নৃত্য করে শিখিগণে॥
তৃষ্ণার্ত চাতক সব করে কলরব।
ঊর্ধ্বমুখ করি চাহে জলাকাঙ্ক্ষা সব॥'

কালিদাসের কাব্যেও অনুরূপ অতিশয়োক্তি আছে। মেঘমন্দ্রের অনুকারক একস্থলে রথঘর্ঘর অন্যস্থলে শঙ্খ। ভীম ও ভীষণার যুদ্ধে উভয়ের নখাঘাত ক্ষত দেহকে কবি উপমা ভূষিত করেছেন।-

'অপূর্ব হইল শোভা পর্বত মণ্ডলে।
অশোক কিংশুক যেন বসন্তের কালে॥'

এই উপমায় পর্বতের সঙ্গে তুলনায় যোদ্ধদ্বয়ের বিরাটত্ব সূচিত হলেও অশোক এবং কিংশুকের সহিত আমাদের বসন্তবেদনা অথবা বসন্তের বিলাস-আকাঙ্ক্ষার যে সংস্মৃতি যুক্ত হয়ে আছে তার সম্পূর্ণতা নেই বলে পর্বতের বিরাটত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কালিদাসের কাব্যে যুদ্ধছিন্ন ক্ষত্রিয়দের মস্তকের সহিত শিশিরছিন্ন পদ্মদলের তুলনা আছে। মূল রামায়ণেও রুধির রাত্রি প্রচ্ছন্ন যুদ্ধস্থলকে মধুমাসের পলাশকুসুম

সংচ্ছন্না ধরণীর সাদৃশ্য দান করা হয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও অনুরূপ একটি চিত্র আছে।—

'সর্বাঙ্গ বিদীর্ণ বালি তবু নাহি হটে।
অশোক কিংশুক যেন বসন্তেতে ফুটে॥'

বালির দেহকে পর্বতের সহিত তুলনা না করায় এই উপমাটি কাশীরামদাসের উপমা থেকেও কোমল হয়ে পড়েছে।

ভীষণ বস্তু অথবা চিত্রকে কোমল অথবা সুন্দব প্রকৃতিচিত্রের সঙ্গে তুলনার উদাহরণ কাশীরামের কাব্যে প্রচুর। শরবর্ষণ সমাকীর্ণ আকাশকে কবি শরতের হংস-সমাকুল আকাশের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অন্যত্র,

'শোনিত হইল নীর নৌকা কলেবর।
রথচক্র ভাসে যেন রাজহংস বর॥'

অন্যান্য প্রকৃতিচিত্রের মধ্যে শরতের মেঘের নিষ্ফল গর্জন কবির চোখে ধরা পড়েছিল,

'মুখে মাত্র বল শক্তি নাহি কাজে।
শরতের মেঘ যাহা নিষ্ফল গরজে॥'

অনুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনা কাশীরামদাসের মহাভারতে অনুপস্থিত। প্রথমাংশে লক্ষ্মীর সমুদ্র থেকে উত্থানের সময় সমস্ত প্রকৃতি আনন্দ জ্ঞাপন করেছিল নিতান্তই স্থূলভাবে,

'স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি সমুদ্র আকাশ।
দরশনে সবাকার হইল উল্লাস॥'

অন্যত্র মহাভাবত কথা শ্রবণের অন্তে প্রকৃতিরাণী প্রসন্ন দৃষ্টি দান করেছিলেন।—

'সুগন্ধি পবন বহে ঝরে মকরন্দ।'
ভারত সম্পূর্ণ হৈল দেবের আনন্দ॥'

প্রকৃতি বর্ণনায় কাশীরামদাসের কাব্যে গতানুগতিকতাতেই পরিপূর্ণ। অরণ্যের সমস্ত ভীষণতা কোকিল-ভ্রমর মুখরিত এবং সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধে আকুল উদ্যান চিত্রেই পরিণত হয়েছে। মাঝে মাঝে তরল শব্দ

ঝংকার ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই বর্ণনাগুলিতে নেই।

বসন্ত বর্ণনার উপাদান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকলেও, প্রকৃত ঋতু বর্ণনার অতি অল্প উদাহরণই এই কাব্যে স্থান পেয়েছে। বর্ণনার বিশেষত্ব কেবল শব্দ ঝংকারে।—

'নানা পুষ্পে মধুপান করিছে ভ্রমর।
কোকিল ঝঙ্কার করে বসন্ত কিঙ্কর ॥'

এইরূপ দুই একটি পংক্তি ব্যতীত ঋতুবর্ণনার কোন প্রয়াস কাশীরামের কাব্যকে অলংকৃত করে নাই।

অন্যান্য অনুবাদঃ রামায়ণ মহাভারতের বহুতর বাঙালি কবি আছেন, তাছাড়াও ভাগবত ইত্যাদির কিছু কিছু অনুবাদ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয়ে কোনো নূতনত্ব প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া ও-কাব্যগুলির প্রভাবও অন্যতর সাহিত্য তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্য পাঠকদের উপর পড়েনি। বরঞ্চ অন্যান্য রামায়ণ-মহাভারতের যে-অংশগুলি পাঠককে মুগ্ধ করেছে সে-অংশগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারতে সংশ্লিষ্ট তাদের অংশরূপে গণ্য হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ঐগুলি নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা পরিহার করা হয়েছে। যে কাব্যগুলি সংস্কৃতের মূলানুগ অনুবাদ সেগুলির আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন।

(৫) গ্রামীণ সাহিত্য

পূর্ববঙ্গ গীতিকাঃ—অন্যান্য সাহিত্যের প্রকৃতিপ্রেমের গতানুগতিকতা এবং প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনে আড়ম্বরপূর্ণ সমারোহ দেখতে দেখতে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; পল্লী-গীতিকাগুলি সেই বিদ্রোহী মনের জন্য শান্তি বহন করে আনে। প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে আমাদের ধর্মমূলক সাহিত্যগুলির প্রকৃতিপ্রেম অভিব্যক্ত। পল্লী-কবিরা সংস্কৃত সাহিত্যে অনভিজ্ঞ হওয়াতে কোনো কোনো সময়ে ভাষা ব্যবহারে অমার্জিত হলেও ভাবের প্রকাশে একটি নিজস্ব পথ

অবলম্বন করেছিলেন। প্রকৃতি প্রেমের পরিচয়ে তাঁরা অবশ্য নূতন দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কার করতে পারেন নি। কিন্তু প্রকৃতিকে অবলম্বন করে রূপবর্ণনা এবং প্রকৃতি চিত্র অঙ্কনের ভঙ্গিটি তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তার কারণ সাধু সাহিত্যের মতো গ্রামীণ সাহিত্যে পূর্বাচরিত কোনো সংস্কার ছিল না। কোনো বিশেষ রীতির দাসত্ব থেকে তাঁরা মুক্ত।

প্রথমত রূপবর্ণনা। পল্লী-গীতিকার রূপবর্ণনার নৈসর্গিক উপাদানগুলি অন্যান্য সাহিত্য থেকে নূতন এবং বহুল ব্যবহারে মলিন নয়। সেগুলি গ্রাম হলেও কবিত্বপূর্ণ সাধু সাহিত্যে নারীর কুন্তলের তুলনা প্রধানত মাঝে মাঝে কুন্তল মেঘের সাদৃশ্য পেয়েছে। পল্লী গীতিকায় মেঘই কুন্তলের উপমান,

'মেঘের সমান কেশ তার, তারার সম আঁখি।

আঁখির সহিত তারার তুলনায় আঁখির স্নিগ্ধতা এবং সুদূর দৃষ্টির ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়েছে। সাধু সাহিত্যে খঞ্জন অথবা মৃগ কিংবা নীলোৎপলের সাহায্যে আঁখির সৌন্দর্যকে রূপ দেওয়া হয়েছে; পল্লী-গীতিকায় আঁখির তুলনায় একটি গ্রাম্য ফুলের প্রাধান্য।—

'জিনিয়া অপরাজিতা শোভে দুই আঁখি।'

অথবা

চইক্ষেতে অপরাজিতা গায়ে চাম্পাফুল।'

চম্পক-পুষ্পের সঙ্গে দেহলাবণ্যের তুলনা অবশ্য সাধু সাহিত্যেও আছে। কদলী উরু এবং কমল চরণের বর্ণনা পল্লীগীতিকায় অনুপস্থিত। সুন্দরীর চরণ সৌন্দর্যের ভাষা,

'আষাঢ় মাস্যা বাঁশের কেরুল মাটি ফাট্যা উঠে।
সেইমত পাও দুখানি গজন্দমে হাটে॥'

সাধু সাহিত্যে অধরের তুলনা বিম্ব ফলটি গ্রাম্য ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি পেয়েছে,

'সিন্দুরে রাঙ্গিয়া ঠুঁট তেলাকুচ ফল।'

মাঝে মাঝে নারীর যৌবনরূপ, তাহার কমনীয়তা এবং নারী পুরুষের সম্পর্ককে সরস সুন্দর চিত্রসাদৃশ্যের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা

দেখা যায়। চিত্রগুলিতে যদিও অনুকরণের ক্ষীণ পবিচয় আছে, তবু প্রকাশ ভঙ্গির গৌরবে তাদের মধ্যে নূতনত্বের সঞ্চার হয়েছে। পূর্ববঙ্গ গীতিকায় কমলার কাহিনীতে কমলার যৌবনরূপের ভাষা,

> 'আশ্বিন মাসেতে যেন পদ্মের কলি।
> বসনে ঢাকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি।।'

কঙ্ক ও লীলার কাহিনীতে লীলার রূপ বর্ণনার প্রকৃতিচিত্রের সাদৃশ্যগুলি কবিত্বপূর্ণ এবং প্রকাশ ভঙ্গির সরলতায় অপূব মাধুর্য-মণ্ডিত। লীলার যৌবনোচ্ছল রূপের চিত্র,

> 'শাউনিয়া নদী যেমন কূলে কূলে পানি।'

তাহার দৈহিক লাবণ্য চাঁদের সুষমার ইঙ্গিত পেয়েছে একটি অপরূপ চিত্রের মধ্য দিয়ে।--

> 'ভাদ্রমাসের চান্নি যেমন দেখায় গাঙের তলা।
> বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা।।'

এই চিত্রটির মৌলিকত্ব এবং কবিত্বগৌরব বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। লীলার মুখচন্দ্রের উপর বায়ু চঞ্চল কুন্তল দামের তুলনার চিত্রটি যদিও ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে বহুবার সাধু সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে, তবু একজন গ্রামীণ কবির ভাষায় এই চিত্রটি নূতন করে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

> 'বর্ষাতিয়া চান্দে যেমন ক্ষণে আবে ঘিরে।'

লীলার নয়নের তুলনায় কবি বিদ্যাপতি-সুলভ একটি চিত্রের প্রয়োগ করেছেন,

> 'উপরে যোর ভুরু নীচে নয়ন তারা।
> মধু লোভে পুষ্পে যেমন বৈসাছে ভ্রমরা।।'

অন্যত্র—

> আক্ষির তারা যে কন্যার অতি মনোহর।
> পদ্মফুলের মাঝে যেন রসিক ভ্রমর।।'

কিন্তু এই অনুকৃত চিত্রের পাশেই পল্লী কবির নিজস্ব চিত্রটিও রয়েছে। তুলনায় দ্বিতীয় চিত্রটিই হয়তো শ্রেষ্ঠ। কজ্জল রঞ্জিত নায়িকার আঁখি,

'বর্ষাকাল্যা তারা যেমন মেঘের উপর ভাসে।'

কালিদাসের কাব্যের সহকারতরুর প্রতি লতিকার একান্ত নির্ভরের উপমাটি গ্রামীণ কবিদেরও প্রলুব্ধ করেছিল। নায়কের প্রতি নায়িকার উক্তিতে সেই চিত্রটি ব্যবহৃত হয়েছে। কঙ্ক ও লীলার উপাখ্যানে,

'তুমি হও তরুরে বন্ধু আমি হই লতা
বেইরা রাখুম যুগল চরণ ছাইড়া যাইবা কোথা ॥'

কঙ্ক ও লীলার উপাখ্যানেই বিরহে ক্ষীণ নায়িকার রূপের তুলনায় মৌলিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সাধু সাহিত্যে অনুরূপ চিত্র বর্ণনায় কেউ বলেছেন, কলামাত্র-শেষ চন্দ্র; কেউ বলেছেন, হিম কমলিনী। গ্রামীণ কবির তুলনাটি স্বতন্ত্র অথচ কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টির পরিচয়ে এদের সমকক্ষ।

'বৈকালীর রাঙ্গা ধনু মেঘেতে লুকায় ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু শয্যাতে শুকায় ॥'

পরিজনবেষ্টিত নায়কের তুলনায় তারকামণ্ডলের মধ্যস্থিত চন্দ্রের তুলনা সংস্কৃতসাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত। বাঙলা কাব্যেও এই তুলনাটির অভাব নেই। "মহুয়া"র উপাখ্যানে নায়কের সৌন্দর্যবর্ণনায় কবি এই উপমাটির প্রয়োগ করেছেন,

'সভা কইরিয়া বইস্যা আছে ঠাকুর নদ্যার চান।
আসমানে তারার মধ্যে পূর্ণমাসীর চান ॥'

নারী এবং পুরুষের পরস্পরের আকর্ষণকে পুষ্প এবং ভ্রমরের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রকাশের প্রয়াস পল্লী-গীতিকারও বহুস্থানে আছে।

'পল্লী-গীতিকা'র রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রগুলি মাঝে মাঝে সুন্দর উপমার সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। মহুয়ার উপখ্যানে আছে।—

'নাহি আমার পিতা মাতা গর্ভসুদর ভাই।
স্বতের হেওলা অইয়া ভাসিয়া বেড়াই ॥'

চণ্ডীদাসের কাব্যে এই উপমাটি অন্য ভাষায় প্রযুক্ত হয়েছিল।

পরিজনহীনা রমনীর একাকীত্ব বুঝাইবার জন্য পল্লীগীতিকার কবিরা অন্য আরও একটি উপমাও ব্যবহার করেছেন।—

'আসমানের মেঘ যেন ভাসিয়া বেড়াই ॥'

অন্যান্য সাহিত্যে নারীর ক্রোধ অথবা ভয়ের কম্পনকে নব-কদলীপত্রের কম্পনের সঙ্গে তুলনা করাই একটা রীতিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পল্লীকবিদের অনুরূপ উপমাটি সেই রীতি লঙ্ঘন করেছে। কঙ্ক ও লীলার উপাখ্যানে,

'বেতের ডোগার মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
অঙ্গুলী নির্দেশে লীলা দিল দেখাইয়া ॥'

বেতসশাখার কম্পনের চিত্রটি অবশ্য পল্লী কবির আবিষ্কার নহে, কিন্তু বহু ব্যবহারে এই চিত্রটি স্বাভাবিক দীপ্তি হারিয়ে ফেলেনি। পারাবত-দম্পতীর যুগল প্রেমও পল্লী কবিদের চোখে ধরা পড়েছিল,

'কৈতরা কৈতরী যেমন খোপেতে বসিয়া।
বাস করে মুখে মুখ মিলাইয়া ॥'

আক্ষেপোক্তির সাহায্যে রূপকাত্মক প্রকৃতি-চিত্রের অবতারণা পল্লীগীতিকার বহুস্থানে আছে কিন্তু সেগুলির স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন নেই।

সমস্ত "মৈমনসিংহ গীতিকা"র মধ্যে মাত্র দুই একটি ভাবানুষঙ্গী নিসর্গচিত্র আছে। "মইষাল বন্ধ"-পালার নায়ক বর্ষার প্রকৃতির মধ্যে তাহার প্রিয়তমার রূপের তুলনা খুঁজে পেয়েছেন। প্রধানত রূপ বর্ণনাই এই ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি চিত্রের উদ্দেশ্য।—

'আসমানে ফুটে তারা ছিন্ন ভিন্ন দেখি।
মৈষাল ভাবে এইমত কন্যার দুইটি আঁখি ॥
'আসমান জুড়্যা কালা মেঘ উড়্যা উড়্যা যায়।
নীলাম্বর পর্‌য়া কন্যা জলের ঘাটে যায়।
নদীতে উঠে খৈয়া ঢেউ লীলায়ারি বাতাসে।
মৈষাল শুইয়া ভাবে কন্যার দীঘল লম্বাকেশে ॥'

অনুভূতিশীল প্রকৃতিবর্ণনা "মৈমনসিংহগীতিকা"য় অজস্র। নায়িকার বিরহে প্রকৃতির সহানুভূতি জ্ঞাপন, নায়কের বাঁশী শুনে নদীর উজান

বহা কিংবা নায়িকার আক্ষেপোক্তিকে অবলম্বন করে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অনুভূতির আরোপ ইত্যাদির কথা ছেড়ে দিলেও, নাটকীয় ভঙ্গিতে এক প্রকার অনুভূতিশীল নিসর্গের অবতারণা এই গ্রামীণ কবিদের বিশেষত্ব। মৈমনসিংহগীতিকার প্রায় সমস্তগুলি কাহিনী বিষাদান্ত এবং নায়িকার মৃত্যুতেই উপাখ্যানগুলির পরিণতি। যে কাহিনীগুলির পরিণতি মৃত্যুতে, তাদের শেষাংশে, নায়িকার মৃত্যুর ঠিক পূর্বে সমস্ত প্রকৃতি নায়িকাব বিক্ষুব্ধ চিত্তের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করেছে—নায়িকার জীবনের বিফল কাহিনীর বেদনাকে কবি মানব মনের সীমা ছাড়িয়ে প্রকৃতির মনেও সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। মলুয়ার উপাখ্যানে মলুয়ার মৃত্যু দৃশ্যে প্রকৃতি ঝড়ের মধ্য দিয়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ঝড়ের বর্ণনাটি বিশেষত্বহীন হলেও অনুভূতি আরোপটি সার্থক।—

'পূবেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া উঠে দেওয়া।
এই সাগবের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া॥…

পূবেতে গর্জিয়া দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
কইবা গেল সুন্দর কন্যা মন পবনের নাও।'

'দেওয়ানা ভাবনা'র কাহিনীতেও নায়িকার বিষপানের রাত্রিতে সমস্ত প্রকৃতি মেঘে মেঘে মুখ ঢেকে আশঙ্কাকুল হৃদয়ে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছিল।

'নিশি রাইত মেঘে আন্ধা আসমানে নাই তারা।'

'ধোপারপাট'-উপাখ্যানে নায়িকা কাঞ্চনের জলমগ্ন হয়ে আত্ম-হত্যার দৃশ্যে দূর আকাশের তারাও শিউরে উঠেছিল।

'তারা হইল নিমিঝিমি রাত্রি নিশাকালে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা সেই না নদীর জলে॥'

'মহুয়া' ও 'কাঞ্চনমালা'র কাহিনীতে অনুরূপ অনুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্রগুলি সুন্দর। মহুয়ার নিকটে হোমরাবেদিয়ার নদের চাঁদকে বধ করিবার আদেশ শুধু মহুয়ার হৃদয়কেই আকস্মিক বেদনায়

পঙ্গু করে ফেলে নি, চন্দ্র তারকা শোভিত রজনী পর্যন্ত সে বেদনায় বিষাদের ঘন অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে।

'ডুবিল আসমানের তারা চান্দেনা যায় দেখা।
সুনালী চন্নীর রাইত আবে পড়ল ঢাকা ॥'

'কাঞ্চনমালা'র উপাখ্যানে ফুলকুমারের নিকট নায়িকার জীবনের কাহিনী বর্ণনার সময়ও অনুরূপ একটি প্রকৃতিচিত্রের অবতারণ করা হয়েছে। প্রথম জীবনের কাহিনী সুখের—সে কাহিনী বর্ণনার সময়, 'আসমানে জ্বলে তারা', কিন্তু যখন দুঃখের কাহিনী আরম্ভ হল, তখন আকাশে তারার উৎসব শেষ হয়ে গিয়েছে, আকাশ ঘন বর্ষণে অশ্রুপাত করেছে।

'আসমানেতে দেওয়া ডাকে মেঘে জল ঝরে।
জন্মকথা কইতে কন্যা কান্দিয়া যে মরে ॥'

ঋতু-বর্ণনায় মৈমনসিংহ-গীতিকাগুলিতে বর্ষাঋতুরই প্রাধান্য। যে স্নিগ্ধ এবং কোমল পল্লীবালিকাদের কাহিনী এই গীতিকাগুলির উপজীব্য, বর্ষার পটভূমি তাদের চরিত্রকে একটি সজল কারুণ্য দান করেছে সন্দেহ নেই, বিশেষত প্রায় প্রত্যেকটি উপাখ্যানই বিষাদপূর্ণ এবং বিষাদপূর্ণ উপাখ্যানে বর্ষাঋতুর উপস্থাপন সার্থক হয়েছে। বর্ষা ছাড়া বসন্ত ঋতুর দুটি-একটি বিক্ষিপ্ত বর্ণনাও গীতিকাগুলির মধ্যে আছে। ঋতু-বর্ণনার উপাদান তাদের মধ্যে তেমন কিছু নেই। প্রকাশ-ভঙ্গির বিশিষ্টতা সাধারণভাবে গতানুগতিক।

'দক্ষিণের হাওয়া বয় কুকিল করে রা।
আমের বউলে বৈস্যা গুঞ্জে ভ্রমরা ॥'

এই প্রকারের ক্ষুদ্র বর্ণনার সাহায্যেই অধিকাংশ সময় বসন্ত ঋতুকে চিত্রিত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে বৈষ্ণবকবি-সুলভ বসন্ত-বিরহ বর্ণনাও আছে।

'দারুণ ফালগুন মাস গাছে নানান ফুল।
মালঞ্চ ভরিয়া ফুটে মালতী বকুল ॥
মধুলোভে যাওরে উড়ে ভ্রমরা ভ্রমরী।
বহুদিন নাহি শুনি বঁধুর বাঁশরী ॥'

বর্ষা প্রধানত বিরহের ঋতু রূপেই অঙ্কিত হয়েছে। মত্ত দাদুরী এবং ময়ূরের নাচের কোনো পরিচয় অবশ্য এই বর্ষা-বর্ণনাগুলির মধ্যে নেই। স্বল্প উপাদানের সাহায্যে বর্ষার স্নিগ্ধ রূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসেই এরা সার্থক। "মলুয়া"র কাহিনীতে নায়ক বিনোদের মাতা পুত্রের বিচ্ছেদে বর্ষাঋতুকে অশ্রুজলের মধ্য দিয়েই বরণ করে নিয়েছেন। সে বর্ষা-বিচ্ছেদের বর্ণনা,

'কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় সঙ্গে আসে।
জমীনে পড়িল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে॥
গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিঙ্কি ঠাডা পড়ে।
অভাগী জননী দেখ ঘরে পুইড়্যা মরে॥'

দাদুরীর হর্ষ এবং ময়ূরীর নৃত্যের পরিবর্তে কুড়ার ঘনঘন ডাক, গ্রামীণ কবিদের সংস্কার-হীনতা এবং বাস্তবের প্রতি আকর্ষণের পরিচায়ক। "মলুয়া"র উপাখ্যানে নায়কনায়িকার বর্ষা-বিরহও আছে কিন্তু বর্ণনার দিক থেকে সে অংশগুলির মূল্য খুব বেশী নয়।—

'মেঘ ডাকে গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে রইয়া।
সোয়ামীর কথা ভাবে খালি ঘরে শুইয়া॥'

শুধু বিরহ নয়, মলুয়ার অনুরাগের পালায়ও বর্ষা ঋতু প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্ষা বিরহের মতো, তাহার অনুরাগের পটভূমিব বর্ষাও ব্যাকুলতাপূর্ণ।

'আসমানে থাকিয়া দেওয়া ডাকছ তুমি কারে।
ঐ না আষাঢ়ের পানি বইছে শতধারে॥
গাঙ ভাসে নদী ভাসে শুকনায় না ধরে পানি।
এমন রাতে কোথায় গেলা কিছুই না জানি ।'

জ্ঞানদাসের নায়িকার পূর্বরাগে একদিন বর্ষা রজনীতে নায়ককে স্বপ্ন-দর্শনের একটি পদ আলোচিত হয়েছে। মহুয়ার কাহিনীতেও বর্ষার ঘন মেঘ গর্জনের মধ্যে নায়িকার স্বপ্নে অকস্মাৎ নায়কের আবির্ভাব ঘটেছিল।

'ঘুমাইয়া কানের কাছে দেওয়ার গরজন।
ভিন দেশী অতিথির মুখ দেখয়ে স্বপন॥'

"ধোপার পাট" নামক গীতিকায় বর্ষাভিসারও বর্ণিত হয়েছে। নায়িকার উক্তিতে নায়কের বর্ষাভিসারের দুঃখ মূর্ত হয়ে উঠেছে।—

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর বাইরে কেন ভিজ।
ঘরের পাছে মানের পাতা কাইট্যা মাথায় ধর ॥'

অন্যত্র অভিসারাকাঙ্ক্ষী নায়িকার গভীর আক্ষেপ,

'কাইট্যা গেছে কালা মেঘ চান্দের উদয়।
এই পথেতে যাইতে গেলে কুলমানের ভয় ॥'

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় চণ্ডীদাসের 'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা' এবং 'কহিও বঁধূরে নতি কহিও বঁধূরে! গমন বিরোধী হৈল পাপ শশধরে।' ইত্যাদি বৈষ্ণব পদ দুইটির সহিত এই অংশগুলির সাদৃশ্য নির্দেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই অংশ দুইটিকে চণ্ডীদাসের পদের গ্রামীণ সংস্করণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'কঙ্ক এবং লীলা'র উপাখ্যানে নায়িকার ছয় মাসের দুঃখ বর্ণনার একটি অংশ আছে। অন্যান্য মাসের দুঃখে ঋতু-বর্ণনার চেষ্টা ক্ষীণ কিন্তু আষাঢ় শ্রাবণে বিরহ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ঋতু-বর্ণনার চেষ্টাও রূপ পেয়েছে। এই বর্ণনায় মাঝে মাঝে চিরাচরিত সংস্কারের প্রশ্রয় আছে। ময়ূর-ময়ূরী, কদম্বপুষ্প, চাতক ইত্যাদিও বর্ণনায় ভিড় করে এসেছে তবে বর্ণনার ধারাটি গ্রামীণ সরলতারই পূর্ণ—

'কাল মেঘে সাজ করে ঢাকিয়া গগন।
ময়ূরে ময়ূরী নাচে ধরিয়া পেখম ॥'

এই কাব্যগুলিতে মাঝে মাঝে মানবত্ব-আরোপের চেষ্টাও আছে।

'হাতেতে সোনার ঝাড়ি বর্ষা নামি আসে।'

অথবা

'শ্রাবণ আসিল সাথে জলের পসরা।'

ইত্যাদি পংক্তিগুলি এ উক্তির সমর্থক।

ঋতু-বর্ণনা ব্যতীত অন্যান্য প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে মৈমনসিংহ গীতিকায় একটি প্রভাত বেলার বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। মানবত্ব আরোপের মধ্য দিয়ে প্রভাত বেলার সূর্যের পূর্বাচলে উদয়কে কবিত্বপূর্ণ করে তোলা হয়েছে।

'পূব সায়রে লাইম্যা ভানুরে ভোরর ছান করে।
ঐ না রথে উঠ্যা ভানু যাইবাইন নিজপুরে ॥
দুধের বরণ ঘোড়া গোটা আগুন বরণ পাখা।
আরে বাতাসের আগে ছুটে ঘোড়া নাই সে যায় দেখা ॥'

ঋগবেদে বর্ণিত সূর্যের মানবত্ব-আরোপের অনুকরণেই এ মানবত্ব আরোপটি সার্থক। সূর্যরশ্মির সহিত অগ্নিবর্ণ অশ্বের তুলনা পর্যন্ত বাদ যায় নি। শুধু তাই নয়, উষা এবং সূর্যের মিলনকে প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের রূপ দিয়ে ঋগবেদের কবিদের মতই গ্রামীণ কবি মানবত্ব আরোপকে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর করে দিয়েছেন,

উষার সঙ্গে অইব মিলন পূব পাহাড়ের পথে।'

মানবত্ব আরোপের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি চিত্র-অঙ্কনে এই গ্রামীণ কবিরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। একটি ঝড়ের বর্ণনা,

'শিবের পিঙ্গল জটা আসমানেতে খেলে।
কুন্দিয়া তোফান আসে দরিয়াব জলে ॥'

এই বর্ণনায় ঝঞ্ঝাকে রুদ্ররূপী শিবের আকৃতি দান করে কবি আপনার দৃষ্টিব বিশেষত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতির রুদ্ররূপের প্রতি যে কবি অন্ধ ছিলেন না, ঝড়ের আভাসসূচক পিঙ্গল মেঘের মধ্যে রুদ্র রূপী শিবের জটার সাদৃশ্য দর্শনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মুকুন্দরামেব কাব্যেও একস্থানে ঝড়ের মেঘকে চিকুরেব সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল।

'ঈশানে উরিলা মেঘ সঘন চিকুরে।'

কিন্তু ঝড়ের রুদ্ররূপ বর্ণনায পল্লীকবিব পংক্তিটি শ্রেষ্ঠ একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। আনুমানিক কালে রবীন্দ্রনাথও ঝড়ের তাণ্ডবের মধ্যে রুদ্ররূপীর স্পর্শসন্ধান লাভ কবেছেন।—

'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু মুখেতুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ ॥'

'কাফেন চোরা' পালায় একটি রাত্রির বর্ণনা যে কোন কবির ঈর্ষার সামগ্রী। একজন গ্রামীণ কবি এমন সুন্দর চিত্রসৌন্দর্য এবং প্রকাশভঙ্গীর কমনীয়তা কি করে আয়ত্ব করেছেন ভাবলে অবাক হতে হয়। বর্ণনাটি কন্যাযাত্রার—

'জোন পহরগ্যা (১) রাইৎরে ওরে দোলা যায়রে চলি।
মুঠ ক্ষরি মারের মেলা (২) বৈল ফুলের কলি॥
দোলা যায় বায়রে দোলা আষ্ট বেডার (৩) কাঁধে।
দোলার ভুতর (৪) নয়া বউয়ে গুড়ি গুডি কাঁদে॥
মা বাপের মনত পড়ে আর ছোড ভাইয়ের মুখ।
ঝিঁঝিঁ পোগর (৫) ডাকশুনি কাঁপি উডের বুক॥'

জ্যোৎস্না রাত্রির চাঁদিনীর সঙ্গে মুঠো মুঠো বেলফুলের কলির সাদৃশ্যটি অভিনব। ছন্দের বিলম্বিত ভঙ্গিতে জ্যোৎস্না রাত্রির আবেশ আছে। সর্বোপরি, এমন রাত্রিতে বনপথে গমন, বিচ্ছেদের স্মৃতি এবং ঝিঁঝিঁ পোকার উদাস সুর মিলে নববধূর মনে অস্পষ্ট আশঙ্কার সৃষ্টি, সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে।

অল্প কথায় প্রভাত এবং সন্ধ্যার সংক্ষিপ্ত সুন্দর বর্ণনা পূর্ববঙ্গ গীতিকায় অজস্র। চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত 'ভেলুয়া'র পালায় একটি প্রভাত বর্ণনা,

'পূব আকাশ লাল হৈয়্যাছে, পাইখ পহলে (১) গায়।
তেল ফুরান্যা বাতির মতন তারা নিপি যায়॥

অন্যত্র

'গায়ে পড়িল রৈদর ছড়া (২) চালে ডাকিলা কাউয়া।

এই বর্ণনাগুলিতে কবির দৃশ্য নির্বাচনের রুচির অনবদ্য। প্রথম বর্ণনাটির উপমায় গভীর কবি-দৃষ্টির পরিচয়ও আছে। প্রভাত বর্ণনায় বায়সধ্বনির উল্লেখ পল্লী-কবির সংস্কারহীনতার পরিচায়ক।

সন্ধ্যার বর্ণনায়ও পল্লী-কবিগণ নির্বাচনরুচির পরিচয় দিয়েছেন।

(১) জ্যোৎস্না প্রহর (২) ছুড়িয়া মারিতেছে (৩) বেহারা (৪) ভিতর (৫) পোকার।

'সন্ধ্যা গুজরিয়া যায় ঝিলিমিলি পথ।
এই গ্রাম ছাড়িয়া সাধু চলিল অন্যত॥
সাঁজালের (৩) ধূমা উঠ্যা বাঁশবনেতে উড়ে।
...   .
উইড়্যা আইসে কাউয়া কুলী (৪) আপন বাসায়।
সন্ধ্যার আন্ধাইরে গ্রামের পথ না দেখা যায়॥

অথবা

'গাছের আগত অল্প অল্প রৈদর ছড়া আছে।'

এই বর্ণনাগুলির মধ্যে কবি-চক্ষু-সম্পন্ন ব্যক্তির নির্বাচন ক্ষমতা অভিব্যক্ত। বর্ণনাগুলি গতানুগতিকতা বর্জিত। বাঁশবনের শিরে সন্ধ্যায় ধোঁয়া এবং বৃক্ষশীর্ষে রৌদ্রের মৃদু ছটা কবির সন্ধ্যাদৃশ্যগুলিকে স্বাভাবিক সজীবতা দান করেছে।

বাঙলা সাহিত্যের প্রধান ধারাগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে এবং আপনাদের আতিশয্যময় প্রকাশভঙ্গীর মধ্য দিয়ে যে রাজকীয় সমারোহ তার বাইরে অন্তরের নিভৃতকুঞ্জে এই পল্লীকবিদের লীলা বিলাস। উচ্চাঙ্গের তত্ত্বপূর্ণ সঙ্গীত মাধুরী সৃষ্টির প্রতিভা এঁদের হয়তো ছিল না। এঁদের কণ্ঠে শুধু মেঠো বাঁশীর উদাস সুর। এই সুর বাঙলা সাহিত্যে একটি নূতন অধ্যায় রচনা করেছে।

(১) পাখী ইত্যাদি (২) রৌদ্রের ছটা (৩) সন্ধ্যাবেলার (৪) কোকিল।

আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ

বাঙলা সাহিত্যে রুচি এবং সাহিত্যিক আদর্শের অধোগতি আরম্ভ হয়েছিল ভারতচন্দ্রের পূর্বেই। প্রতিভাবলে ভারতচন্দ্র সেই নিম্ন রুচি এবং আদর্শের সাহায্যেই কাব্যের রাজ্যে 'ভাষার তাজমহল' রচনা করে গিয়েছিলেন। ভাষার পারিপাট্য এবং অলংকার বাহুল্য ভারতচন্দ্রের রচনায়ই চরমত্ব লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যেও অনুরূপ রুচি-বিকৃতি এবং সাহিত্যাদর্শের অবনতি ঘটেছিল। বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ থেকে ভাষার মুনসিয়ানা বা ছন্দের কারিগরীর দিকেই কবিদের নজর সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় রামপ্রসাদের শ্যামা-সংগীতে সরল অনাড়ম্বর ভাষা এবং গ্রামীণ অলংকার ইত্যাদির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল। রামপ্রসাদ এবং ভারতচন্দ্রের পর, প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে এক দল সাহিত্যিক কবি, আখড়াই, টপ্পা, শ্যামা-সংগীত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সাহিত্যের পিপাসা নিবৃত্তির চেষ্টা করেছিলেন। এঁরা একধারে ভারতচন্দ্রের অলংকার-বহুল ভাষা এবং রামপ্রসাদের সরল ভক্তি উচ্ছলিত আবেগকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু বিষয়বস্তুর প্রাচীনত্বের জন্য এবং উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক প্রতিভার দৈন্যে এ যুগের সাহিত্য পরীক্ষার গণ্ডি (experiment) ছাড়িয়ে প্রকৃত সাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদের রচনারীতির এই বিশেষত্বগুলির সংমিশ্রণ সার্থক হয়েছিল দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে। অর্ধ শতাব্দীর কিছু বেশি কাল ধরে সাহিত্যের রাজ্যে এরূপ দীনতার পর ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য সৃষ্টিতে প্রথম একটা যুগ পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা গেল। এই পরিবর্তনের সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল সাহিত্যসৃষ্টি এবং সাহিত্য উপভোগের আদর্শে কতগুলি দীর্ঘস্থায়ী নিয়মের পরিবর্তনের সাহায্যে। ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদের রচনারীতির যে ধারা দুটি দাশরথি রায়ে এসে মিলিত হয়েছিল,

ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে সে দুটি ধারার মিলিত স্রোত তো বর্তমান আছেই, উপরন্তু একটি সম্পূর্ণ নূতন ধারার আভাসও সূচিত হয়েছে। সেজন্য ঈশ্বরচন্দ্রকে বাঙলা সাহিত্যে সন্ধিযুগের কবি বলা হয়েছে। অবশ্য ঈশ্বরগুপ্তকে 'কবি' বলে আখ্যা দিতে অনেকের হয়তো আপত্তি থাকতে পারে। "কবিওয়ালা"দের একজন সংস্কৃত প্রতীক রূপেই তাঁর বিশেষ সিদ্ধি। কিন্তু একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, চিরন্তন কবিত্বেব কতগুলি আধুনিক উপাদান তার কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সে উপাদানগুলি পরবর্তী "কবি"বা সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। পশ্চিমেব সভ্যতার সংঘর্ষ, মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ও ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দেশে অরাজকতা, আশঙ্কিত অবস্থা মানুষকে কিছু পরিমাণে কল্পনাবিলাস পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। বস্তুতান্ত্রিকতা (realism) সে যুগেই সূচনা হয়েছিল। ঈশ্ববচন্দ্রের কাব্যে সেই বাস্তব ধর্মের আভাস বাঙলাসাহিত্যে নূতন সংযোজিত একটি উপাদান।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যে ভাবপ্রকাশের একমাত্র বাহন ছিল পদ্য। গদ্যরচনার যে যৎসামান্য নিদর্শন পূর্ববর্তীকালে পাওয়া যায়, তা তখনও ভাব প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হয়ে ওঠেনি। উনবিংশ শতাব্দীব সূচনা থেকেই প্রধানত বিদেশীয়দের চেষ্টায় দৈনন্দিন প্রয়োজনের উপযোগী একটি বাঙলা গদ্য রচনারীতি সৃষ্টির সূচনা হল। এব ফলে গদ্যে এবং পদ্যে প্রকাশযোগ্য বিষয়-বস্তুর মধ্যে একটা প্রভেদও গড়ে উঠতে লাগল। দৈনন্দিন সাধারণ প্রয়োজন এবং তথ্য ইত্যাদি প্রকাশের ভাষার বাহন হয়ে উঠল গদ্য। আর দৈনন্দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত রসসৃষ্টির জন্য পদ্যই হয়ে উঠল একক বাহন। গদ্য এবং পদ্যের এই সীমারেখা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পদ্য সাধারণভাবে ব্যবহারিতাকে পরিহার করে চলেছে কিন্তু গদ্য বসসৃষ্টির সীমানা ডিঙিয়ে পদ্যের রাজ্যে শীঘ্রই অনুপ্রবেশ করেছিল।

ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু ছিল ধর্ম।

কোনো কাহিনীকে অবলম্বন করে দেব অথবা দেবীর মাহাত্ম্যপ্রচার কিংবা গীতিকবিতা অথবা গানের সাহায্যে কোনো বিশিষ্ট ধর্মমতের দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণই সাহিত্যের মূল উপজীব্য ছিল। বৈষ্ণব-কবিতায় এই ধর্মমতের সুর ছাপিয়ে ক্ষণে ক্ষণে প্রেমলীলা প্রধান হয়ে উঠেছিল বলেই তাতে নূতনত্বের সন্ধান ছিল, কিন্তু এই নূতনত্বও বহুল ব্যবহারে মলিন হয়ে এসেছিল। কবিওয়ালা এবং টপ্পা প্রভৃতি গীতরচয়িতাদের মধ্যে অনেকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার আড়ালে পার্থিব প্রেমের মহিমাকীর্তন করবার চেষ্টা করলেও রাধাকৃষ্ণপ্রেমের সংস্মৃতি (association) বা বৈষ্ণব কবিতার রীতিনীতি (convention)টি তারা পরিত্যাগ করতে পারেন নি। কবিতা বা গানে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় থেকে কাব্যে বর্ণিত বিষয়বস্তু গতানুগতিক পথ পরিহার করে একটা বৈচিত্র্যের সন্ধান পেল। দেশ-প্রেম, প্রচলিত সামাজিক নিয়মকানুনের প্রতি ব্যঙ্গময় দৃষ্টি, বাস্তবধর্মী ঋতুবর্ণনা ইত্যাদি কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠল। ঈশ্বরচন্দ্রের লেখনীতে এই পরিবর্তনের প্রথম সূচনা। তিনি "কবি" নামের অধিকারী হোন বা না হোন তিনি এক হিসাবে যুগ-প্রবর্তক।

ঈশ্বরগুপ্ত ঃ—ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাবের পূব পর্যন্ত বাঙলাকাব্যে প্রকৃতিপ্রেমের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করেছে মূলত পটভূমিরূপে। নায়ক-নায়িকার বিরহ এবং মিলন দৃশ্যাদির পশ্চাতে থেকে শুধু সহানুভূতিপূর্ণ অথবা নির্বিকার দৃষ্টি দান করেই তার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। রূপবর্ণনায় প্রকৃতির অবতারণাও বহুব্যবহারে তার প্রাচীন দীপ্তি হারিয়ে ফেলেছিল। মাঝে মাঝে বারমাসিয়া ইত্যাদির বিশেষ রীতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতি-বর্ণনার যে ক্ষীণ প্রচেষ্টা দেখা যেত, সেখানেও প্রকৃতি উপস্থিত হত নায়ক-নায়িকার দুঃখ-সুখের নিয়ামক রূপে। উপরন্তু সে-প্রকৃতি কবিদের নিজের চোখে দেখা প্রকৃতি নয়। চোখের সম্মুখে প্রসারিত প্রকৃতিকে হয় তাঁরা নিজের রূপ বিলাসী মনের ছাঁচে ফেলে বর্ণাঢ্য

বা decorative করে তুলেছেন, নয় প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছেন চোখে সংস্কারের মায়াঞ্জন লিপ্ত করে। প্রাচীন বা আধুনিক-পূর্ব বাঙলাসাহিত্যে প্রকৃতির নিছক রূপটি দেখবার প্রয়াস (ইংরেজিতে যাকে বলে nature for nature's sake) নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে কোনো প্রতিভাশালী কবির কাব্যে শুধু এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সূচিত হয়েছে। ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে সাদা চোখে দেখা প্রকৃতিবর্ণনার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, প্রকৃতিকে বিষয়বস্তু করে যে কাব্যরচনা সম্ভব তা তখনও পর্যন্ত বাঙলাসাহিত্যের কবিরা জানতেন না, এবিষয়েও পথ প্রদর্শকের সম্মান ঈশ্বরচন্দ্রেরই প্রাপ্য। কাজেই শুধু বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রেই নয়, প্রকৃতিপ্রেমের বিশেষ ক্ষেত্রেও ঈশ্বরচন্দ্র একটি নূতনত্বের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র শুধু পথের ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন, উচ্চাঙ্গের কবি প্রতিভার সাহায্যে সাহিত্যকে নূতন রীতিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। প্রকৃতির প্রতি তিনি সংস্কারহীন চোখে দৃষ্টিদান করেছিলেন সত্যি, কিন্তু প্রকৃতিবর্ণনায় অনুভূতির স্পর্শ সঞ্চার করতে পারেন নি। ঈশ্বরচন্দ্র যে নূতনত্বের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, পরবর্তী বাঙালি কবিদের কাব্যে সে-ধারা ক্রমোন্নতির পথ-পরিক্রমা করে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রকৃতি-প্রেমের নূতনতম এবং গভীরতম রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রকৃতিবর্ণনা বা বিভিন্ন ঋতুচিত্র অঙ্কনের সময় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত চোখ মেলে প্রকৃতির দিকে চেয়েছিলেন তার অনেক প্রমাণ আছে। এ বর্ণনাগুলির মধ্যে বাস্তব চিত্রের পরিচয়ও আছে অগণিত স্থানে। সন্ধ্যার অস্তগামী রবির চিত্র,

'ঈষৎ আরক্ত ছবি, প্রভাহীন কর।
অধোভাগে যান যেন, জলের ভিতর॥'

অথবা,

'তরুশাখা স্নিগ্ধ হয় এই সন্ধ্যাকালে।
ভঙ্গী করি গীত গায় পবনের তালে॥'

'রজনী'-শীর্ষক কবিতায়,

'প্রহর হইলে গত নিদ্রাগত সব।
ক্রমে সব স্তব্ধ হয়, নাহি শব্দরব॥

ভূমিতল সুশীতল তাপ নাহি আর।
তৃণপত্রে শোভা করে নীহারের হার ।।'

ইত্যাদি বর্ণনায় নিজের চোখে দেখে প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা প্রতিফলিত। ঋতুবর্ণনায়ও এই চেষ্টার পরিচয় অসামান্য নয়,

'ফুটিফাটা হল ঘাট   চেলাকাঠ যেন মাঠ
হাট বাট সকল সমান।'

বর্ষা বর্ণনায়,

'ঘনঘোর অন্ধকার   দৃষ্টিরোধ সবাকার
বৃষ্টি জল পূর্ণ সৃষ্টি পাত্র।
লুক্কায়িত বিকর্তন   অনুদ্দেশ জ্যোতিগণ
জোনাকী পোকার দৃষ্টি মাত্র ।।'

ইত্যাদি বর্ণনাগুলিতে এ-সত্যই প্রকাশিত হয়েছে যে, কবি চিরাচরিত সংস্কারের চোখে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। নিজে চোখ মেলে পরিপার্শ্ব থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। হেমন্ত বর্ণনায় কবির ভাষা,

'ইহা হেরে মত্ত অলি স্বভাবের বশে।
সুখেতে মূলার ফুলে উড়ে গিয়া বসে ।।'

পূর্ববর্তী বাঙলা এবং সংস্কৃত কাব্যে এত ফুলের নাম থাকা সত্ত্বেও মূলার ফুলের প্রতি কবির পক্ষপাতিত্ব সংস্কারহীনতারই পরিচায়ক। এই সংস্কারহীনতার চরম পরিচয় তিনি দিয়েছেন উপমা এবং মানবত্ব আরোপের ক্ষেত্রে আধুনিকতার আমদানী করে,

'শ্যামল তৃণের পরে   নীহার বিহার করে
সাটিনের চুমকি যেন সাজে ।।'

বর্ষা-রাজকে তিনি আধুনিক মানবত্ব আরোপে ভূষিত করেছেন,

'বারির বসন পরা   লুটাইয়া পড়ে ধরা
বাতাসেতে উড়ে যায় কোঁচা ।।'
সেফালিকা প্রস্ফুটিত   অতিশয় সুশোভিত
জরির লপেটা লতা পায়।'

এই বর্ণনাগুলিতে অবশ্য আনুপাতিক সম্বন্ধহীনতায় কবিত্ব গৌরব

অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সংস্কারমুক্ত চোখে দেখা হলেও উপরোক্ত উদাহরণগুলি যে কবিত্ব পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি, তার কারণ ঈশ্বরচন্দ্রের অনুভূতির যথেষ্ট গভীরতা ছিল না। এ ছাড়াও রচনারীতির কতগুলি সহজাত দোষ কাব্যের সহজ বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার প্রথমটি ব্যবহারিকতা। ব্যবহারিকতাধর্মী বর্ণনায় ঈশ্বর গুপ্ত বাঙালি কবিদের মধ্যে শীর্ষতম। তাঁর ঋতুবর্ণনার মূল সুর ব্যবহারিকতা। গ্রীষ্মে সূর্যের প্রখর তাপে মানুষ এবং প্রকৃতির কি কষ্ট, গ্রীষ্ম-দগ্ধ জগৎকে বর্ষা কিভাবে স্নিগ্ধ করে তোলে, শরতের আগমনী বিরহী স্বামী এবং স্ত্রীর মনে মিলনের কি আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত করে, কি করে প্রাণী জগৎ শীতের হাড়ে কাঁপন-লাগানো ঠাণ্ডায় জাবন যাপন করে, বসন্তের আগমন তাদের জন্য কি ব্যবহারিক আনন্দ এবং ব্যথা বয়ে আনে, এ বর্ণনাই ঈশ্বর-গুপ্তের ঋতুচিত্রে প্রধান হয়ে উঠেছে। দু-একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে,

গ্রীষ্মে,

'হায় হায় কি করিব রাম রাম রাম।
কতবা মুছিব আব শরীরের ঘাম ॥'

বর্ষায়,

'গৃহস্থের কান্নাকাটি রান্নাঘরে এসে,
হাসিয়া ভাতের হাঁড়ি জলে যায় ভেসে ॥'

অনুরূপ উদাহরণ তার সব ঋতুবর্ণনাকেই ভারাক্রান্ত করেছে। এ বর্ণনাগুলি কবিতাবাজ্যের বহিরাঙ্গণেই অপেক্ষা করে আছে। অন্তরঙ্গ আশ্রয় লাভ করতে পারেনি। ব্যবহারিকতার চরম পরিচয় 'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য' শীর্ষক একটি কবিতাতে আছে। এ ব্যবহারিকতা মাঝে মাঝে কবিওয়ালাসুলভ রসিকতা বা রঙ্গপ্রিয়তায় আত্মপ্রকাশ করেছে,

'নারিকেল শুকাইল হয়ে জল হারা।
বেতাল হইয়া তাল শাঁসে যায় মারা ॥'
কাঁঠাল হইল জ্যেঠা এঁচড়ে পাকিয়া।'

অন্যত্র গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ইংরেজ সাহেবদের অসুবিধা বর্ণনা করা হয়েছে,

'ও গড ও গড বলি টবেতে উলিয়া।
মনোহর হাঁসা মূর্তি কামিজ খুলিয়া ॥
ব্র্যাণ্ডিজল খায় তবু ঠাণ্ডি নাহি করে।
কেবল চাইস ভরা আইসের পরে ॥
শুকায়েছে বিবিদের মুখশতদল।'

শরতে প্রবাসী স্বামী গৃহে ফিরে এসেছেন, বিরহী দয়িতার তাই অপার আনন্দ,

'ভিজে চুল ভিজে খোঁপা মুখে করে কত চোপা
পুত্রে বলে পতির উদ্দেশে।
এসেছে অমুক রায় জিজ্ঞাসা করিয়া আয়
বাবা কেন এলোনাক দেশে ॥'

অনুপ্রাস, যমক এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির যত্রতত্র ব্যবহার ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যের একটি প্রধান বিক্ষেপ বলে গণ্য হবে। ভারতচন্দ্রের যুগ থেকেই অলংকার ব্যবহারে অনিয়ম বা অনাচার প্রকাশ পাচ্ছিল। কবিওয়ালাদের যথেচ্ছপ্রয়োগে অলংকারগুলি মলিন হয়ে উঠেছিল। অনুপ্রাস, যমক এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারে ঈশ্বরচন্দ্র কবিওয়ালাদেরই সমগোত্রীয়। শরৎ বর্ণনার একটি পংক্তি,

'তুষার সুসার করে উষার তুষার।'

এই পংক্তিতে অনুপ্রাস ব্যবহারের যতই মুনসীয়ানা থাক, প্রকৃত কবিত্ব নেই। অন্যত্র বর্ষা বর্ণনায়,

'সুধাবৃষ্টি প্রায় বৃষ্টি রিষ্টি করে দূর।
করি দৃষ্টি পরিতুষ্টি জগতে প্রচুর ॥'

এ অংশে কবির বক্তব্য অলংকারের ভারে অকবিত্বের পঙ্কে মজ্জমান।

"ঝড়" নামক কবিতায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের বহুল ব্যবহারে ঝড়ের রুদ্র রূপ প্রকাশের চেষ্টা প্রতিফলিত।—

'ঝন্‌ঝন্‌ সন্‌সন্‌ সমীরণ হাকিছে।
গুড গুড় ডুড় ডুড ঘনকুল ডাকিছে॥' '

আবার,

'ঝন্‌ঝন্‌ করে রণ যেন তোপ দাগিছে।
পড়ে জল অবিরল মুক্তা ফল ঝরিছে॥
তড়তড় তড়বড় কি যে রব করিছে।'

যে উদ্দেশ্যে কবি এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন, তা যে ব্যর্থ হয়েছে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে ঈশ্বরচন্দ্র সর্বত্রই সংস্কারবর্জনের পরিচয় দিতে পেরেছেন তাই নয়, মাঝে মাঝে সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতের কাহিনীও তাঁর কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেছে। ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় যদি তিনি এই সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি এবং সংস্কারহীনতার পরিচয় দিতেন, তবে অভিযোগের হয়তো কিছু কারণ থাকত না। কিন্তু একটি কবিতার ক্ষুদ্র কলেবরের মধ্যেই প্রথম দিকে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে এবং প্রাচীন বাঙালি কবিদের প্রদর্শিত পথে প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপ করেছেন। পরক্ষণেই চরম ব্যবহারিকতা বা কবিওয়ালাসুলভ রঙ্গপ্রিয়তার ক্ষেত্রে নেমে এসেছেন। বিষয় এবং রচনারীতির এই আকস্মিক সুরপরিবর্তন তার কাব্যে আকস্মিক লঘুসুর বা anticlimax এনে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি বর্ষাকাব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমাংশে বর্ষাকে দিগ্বিজয়ী চিত্রিত করা হয়েছে। গ্রীষ্মের সহিত যুদ্ধে তিনি ত্রিভুবন অধিকার করেছেন,

'গগণের সিংহাসনে বসিলেন হৃষ্ট মনে
তিমিরের মুকুট মাথায়।
পবন প্রবল অতি পূর্বদিকে করে গতি
দিবানিশি চামর ঢুলায়॥'

কবিতার পরবর্তী অংশে,

'লোকে বলে, একি কাল উড়িয়া স্বর্গের চাল
ভেঙ্গে পড়ে আকাশের খুঁটি।'

এই ব্যবহারিকতার মধ্যে কবিওয়ালাদের মতো রঙ্গপ্রিয়তা আত্মপ্রকাশ করেছে।—

'শয্যায় ভার্যার প্রায় ছারপোকা উঠে গায়
প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন।'

কবিতার প্রথমাংশে বর্ষার যে গম্ভীর মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছিল, তার এরূপ দুর্দশা দেখে কবিত্বলোভী পাঠকের মনে তীব্র অভিযোগ সঞ্চিত হয়ে ওঠে।

রূপবর্ণনায় এবং রূপকাত্মক নিসর্গচিত্রে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত এবং প্রাচীন বাঙলার কবিদেরই অনুগামী,

'যে চাঁপার ফুল তব অঙ্গুলি দেখিয়া।
কটুগন্ধ সার করে নীরস হইয়া॥'

অথবা,

'রম্ভাতরু উরু শোভা করিবারে চায়।
আপনার গুরুভার ভাবেতে জানায়।'

ইত্যাদি ভারতচন্দ্রসুলভ রূপবর্ণনা ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে। অন্য রূপের রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রও ঈশ্বরগুপ্তে বিরল নয়।

'কদম্ব কুসুম অনু
পুলকে পূরিত তনু।'

অথবা,

পূর্ণিমার নিশা হলে আপনি টানিবে কোলে
চকোর চাঁদের সুধা প্রভাতে কি পায়;

ইত্যাদি প্রকৃতিচিত্রে প্রাচীন বাঙলার কবিদের, বিশেষ করে বাঙলার বৈষ্ণবকবিদের, সুর ধ্বনিত। উদ্ধৃত উদাহরণগুলি বাদ দিলেও কবি যে প্রকৃতি বর্ণনায় এবং প্রকৃতি থেকে কাব্যের উপাদান সংগ্রহে প্রাচীন পন্থী ছিলেন সে কথা প্রমাণ করার মতো বহু উপাদান তাঁর কাব্যে আছে।

ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে মাঝে মাঝে প্রকৃতি দর্শনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি কর্তাকে স্মরণ করার প্রচেষ্টা আছে। পৃথিবীর নানা দিকে নানা

শোভা সম্পদ্ তাঁহাকে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন এক বিরাট্ পুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে কিন্তু প্রাণের সাড়া এবং অনুভূতির যথেষ্ট গভীরতা না থাকায় তাঁর এই-সচেতনতা শুধু সংবাদবাহী হয়ে আছে। হৃদয়ের গভীরে এ বিশ্বাসের মূল প্রোথিত হয়নি। বিশেষত এইরূপ বর্ণনায় ঈশ্বরচন্দ্র পরিপূর্ণ ভাবেই প্রাচীন-পন্থী।—

'নদী নদ আগমন ওহে বন উপবন
ওহে ভাই জীবগণ, আছ সমুদয়।
হয়েছি কাতর অতি স্বভাবে চঞ্চল মতি
করিহে সবার প্রতি বিহিত বিনয়॥
আমি তো স্বয়ম্ভূ নই অবশ্যই কৃত হই
কর্তা কই, কর্তা বই, ক্রিয়া নাহি হয়।
মনেতে জেনেছি এই তোমাদের কর্তা যেই
আমার নির্মাতা সেই, বিভুবিশ্বময়॥'

এখানে প্রকৃতি কবির প্রাণে বিভূবিশ্বময়ের অস্তিত্বের অনুভূতি জাগিয়ে তোলেনি, আপনার অতি সাধারণ বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে কবি সেই অস্তিত্ব সপ্রমান করতে ব্যস্ত।

ঈশ্বরগুপ্তের প্রকৃতিপ্রেমের একটি বিশেষ দিক ফুটে উঠেছে, প্রকৃতির মধ্যে নীতিসন্ধানে। প্রকৃতিচিত্রের মধ্য থেকে মানবের উপযোগী উপদেশ আবিষ্কার করার বহু উদাহরণ ইংরেজী সাহিত্যে রয়েছে। কবি Wordsworth প্রকৃতির মধ্যে Law এবং Orderএর সন্ধান পেয়েছিলেন এবং মানুষকে সেই Law এবং Order হইতে শিক্ষালাভ কববার উপদেশ দিয়েছিলেন। কবি Arnold মানবজীবনের অনিত্যতা এবং প্রকৃতির অমর স্থিতির তুলনা করে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমান করেছিলেন। কবি Longfellow-র কাব্যেও মানবজীবন ও প্রকৃতির মধ্যে এই বৈসাদৃশ্যের বা Contrast-এর ইঙ্গিত আছে। কবি ঈশ্বরগুপ্তও প্রকৃতি থেকে শিক্ষালাভ করতে ব্যাকুল।—

'নিশাকরে গুরু করি শিষ্য হও তার।
স্বরূপ স্বভাব লাভ হইবে তোমার॥'

কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির নিকট শিক্ষা ইংরেজ কবিদের থেকে ভিন্ন

ধরণের। ইংরেজ কবিরা যেখানে প্রকৃতি এবং মানবের বৈসাদৃশ্যের উপর জোর দিয়েছেন ঈশ্বরগুপ্ত সেখানে সাদৃশ্যকেই বড়ো করে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। Arnold রচিত Sohrab and Rustum কবিতার শেষাংশে অবশ্য Oxus নদীর গতির সহিত মানবজীবনের গতির সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে কিন্তু সে বর্ণনা অনেকটা সহানুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্রের পর্যায়ে পড়ে। নীতিমূলক (Moralising) প্রচেষ্টা সে-বর্ণনায় প্রাধান্য পায়নি। তবু সাধারণভাবে বলা চলে, ইংরেজ-কবিরা মানবজীবনের অনিত্যতা এবং প্রকৃতির স্থায়ীত্বের তুলনা করেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত 'সকলি অনিত্য' কবিতায় প্রকৃতির অনিত্যতা থেকেই উপদেশ সংগ্রহ করেছেন,

'ক্ষণপরে কুসুমের কেশর বিরল।
হত যশ নাহি রস খসে পড়ে দল ।।
শুকাইয়া ধরার হৃদয়ে দেয় ধারা।
অলিবৃন্দ নিরানন্দ মকরন্দ হারা ।।

'চন্দ্র শিক্ষা' কবিতার চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে শরীরের বিকারের কথা স্মরণ করেছেন। কিন্তু অমাকলার যেরূপ ক্ষয় নেই, আত্মাও সেরূপ অবিনশ্বর। 'সূর্য শিক্ষা' কবিতায়,

প্রতি জলে রবি ছবি যেরূপ প্রকার।
সেইরূপ দেহ ঘটে আত্মার সঞ্চার ।।'

প্রকৃতি থেকে এই নীতি বা উপদেশ সংগ্রহের প্রয়াস কিন্তু কোথাও অনুভূতির সুরে বাঁধা হয়নি, অনেকস্থলেই রূপকাত্মক নিসর্গের রূপ গ্রহণ করে শুষ্ক কঠিন তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। কাব্যের সরসতা নেই বলে পাঠকের মনের মধ্যে এর অনুকরণ স্বল্পস্থায়ী।

সুতরাং দেখা যায় যে, ঈশ্বরগুপ্তের প্রকৃতি প্রেমে অনেক নূতনত্বের ইঙ্গিত থাকলেও অপরিণত কবিপ্রতিভা এবং অনুভূতির অভাবের জন্য তিনি সে নতুনত্বগুলিকে কবিত্বে সমুজ্জ্বল করে তুলতে পারেন নি। সে নূতনত্বগুলির কাব্যময় রূপ দেখবার জন্য বাঙালি পাঠককে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

মধুসূদন দত্ত : ঈশ্বর গুপ্তের পর বাঙলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিল মধুসূদনের বহুমুখী কাব্য-প্রতিভা। কিন্তু প্রকৃতি প্রেমের ক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্ত যে নূতনত্বের ইঙ্গিত বহন করে এনেছিলেন, মধুসূদন সেই ইঙ্গিত গ্রহণ করেন নি। কারণ বোধ হয় মধুসূদনের প্রতিভার ঐশ্বর্যময় দূরত্ব। মধুসূদন যদিও উনবিংশ-শতাব্দীর বাঙলা দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবু তাঁর মানসিক বিচরণের ক্ষেত্র ছিল Virgil এর যুগের গ্রীস এবং Milton যুগের ইংলণ্ড। Classical সুরই মধুসূদনের কাব্যের প্রধান সুর। কাজেই যুগধর্মের ফলে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে যে সমস্ত বিশেষত্ব মধুসূদনের কাব্যে আশা করা যেত সেগুলির তিনি ব্যবহার করেন নি। প্রকৃতি-প্রেমের ক্ষেত্রে কবি প্রাচীন রীতিরই অনুগামী। চতুর্দশপদী কবিতার অনেকগুলি কবিতা প্রাকৃতিক বস্তুকে অবলম্বন করেই লেখা। 'কপোতাক্ষী নদী, 'সায়ংকালের তারা', 'ছায়াপথ' ইত্যাদি নামগুলি থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু কবিতাগুলির ভাব সম্পদ্ এবং প্রকাশভঙ্গি আধুনিক কাল থেকে বহুদূরে অবস্থিত।

রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রই মধুসূদনের কাব্যের প্রধান আলংকারিক অবলম্বন। মেঘনাদ, তিলোত্তমা, বীরাঙ্গণা ইত্যাদি কাব্যের ছত্রে ছত্রে উপমা বিক্ষিপ্ত রয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই প্রকৃতিচিত্র থেকে সংগৃহীত। উপমা প্রয়োগে কবি মাঝে মাঝে বাচনভঙ্গির কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কিন্তু চিত্রগুলি প্রায়ই পূর্ববর্তী কবিদের কাব্য থেকে ধার করা। স্থানে স্থানে নূতন ছন্দ এবং ভাষার গাম্ভীর্যে চিত্রগুলির প্রাচীনত্ব কিছু পরিমাণেও অবলুপ্ত হয়েছে। কতকগুলি প্রকৃতিচিত্র মধুসূদনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, বারবার সেগুলির ব্যবহার করে তিনি সেগুলির প্রতি চরম পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কপোত-কপোতীর যুগল-প্রেম তাদের অন্যতম। মেঘনাদ বধ কাব্যের সীতা ও সরমার কথোকথনের মধ্যে এ-চিত্রটি আছে,

> 'ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী তীরে,
> কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চড়ে
> বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ;

অথবা বীরাঙ্গণা কাব্যে জয়দ্রথের নিকট লিখিত পত্রে দুঃশলার উক্তি,

'কপোত-মিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে !'

ইত্যাদি ছাড়াও আরও অগণিত স্থানে এই চিত্রটি ব্যবহৃত হয়েছে। সূর্যের প্রতি পঙ্কজের অনুরাগও মধুসূদনের কবিদৃষ্টিতে মাধুর্য মণ্ডিত হয়েছিল।—

'লঙ্কার পঙ্কজরবি যাবে অস্তাচলে।'

এই অমর পংক্তিটিই তাহার প্রমাণ। যুদ্ধরত সৈনিকদের মধ্যে কোনো বীরের উদ্ধত পদক্ষেপকে মধুসূদন বহুবার নলবনে করীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। চক্রবাক দম্পতীর প্রেম, মেঘদয়িতের প্রতি চাতকের আহ্বান, মেঘদর্শনে ময়ূরীর উল্লাস নৃত্য ইত্যাদি বহু পুরাতন চিত্র মধুসূদনের কাব্যে ভাষান্তর গ্রহণ করেছে। এই সকল চিত্র প্রয়োগে কবি বর্ণাঢ্য (decorative) বর্ণনাকেই বিশেষ করে অবলম্বন করেছেন।

সৌন্দর্য-বর্ণনায়ও কবি প্রাচীনপন্থী। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে বিশ্বের সমস্ত সুষমা তিল তিল করে আহরণ করে তিলোত্তমার দৈহিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। মধুসূদনের ভাষায় সে রূপের বর্ণনা,

'পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্মা রাঙা পা দুখানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষা রসরাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরুদেশে আসি করিল বসতি
সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাজা ;
...শোভিল তাহাতে
মেখলা, গগনে, মরি ছায়াপথ যথা।'

শুধু তাই নয় বক্ষস্থলের সাদৃশ্য দিকে দাড়িম্ব এবং কদম্বের মধ্যে বিবাদ বেঁধে গেল ; অবশেষে মেরু শৃঙ্গকারে তিলোত্তমার বক্ষ সৌন্দর্য সৃষ্টি হল।

'জ্বলে যে তারা-রতন উষার ললাটে
তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে
গড়াইলা চক্ষুর্দ্বয়,

এই রূপবর্ণনায় "ছায়াপথ মেখলা" ব্যতীত সমস্ত সৌন্দর্যের উপাদান প্রাচীন অথবা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের নায়িকাদের থেকে ধার করা। উষা অথবা গোধূলির ললাটে একটি নিশুতি তারকার দীপ্তি মধুসূদনের কাব্যে অপরূপ কবি দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। একাধিক স্থানে তিনি এই চিত্রটি ব্যবহার করেছেন। সৌন্দর্যবর্ণনায় স্থানে স্থানে কবি প্রাচীন উপাদানের সাহায্য গ্রহণ করেও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। ইন্দ্রজিৎ নিধনে গমনোদ্যত লক্ষ্মণের সম্মুখে জটাজুট-বিভূষিত শিবের রূপ,

'জটাজুট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর যেন লেখা, শারদ নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘ মুখে যেন।'

মেঘনাদের

মৃত্যুর প্রভাতে প্রমীলার সজ্জার চিত্ররূপ,

'নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ
কুসুম, প্রমীলাসতী, সুবাসিত জলে
স্নানি পীনপয়োধরা বিনানিলা বেণী।
শোভিল মুকুতা পাঁতি সে চিকণ কেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনবলী মাঝে
শরদে!'

এই চিত্রে প্রমীলার কুসুম কোমল দেহ-লাবণ্যের ইঙ্গিত সুন্দর রূপে ফুটে উঠেছে। অন্যত্র নারী সৌন্দর্যকে উপমান করে সাঙ্গরূপকের সাহায্যে কবি রাবণের রাজসভায় শোকাশ্রুনয়না বীরবাহু মাতার আগমন বর্ণনা করেছেন।

'শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন

নিশ্বাস প্রলয় বায়ু ; অশ্রুবারি ধারা
আসার ; জীমূতমন হাহাকার রব।'

সৌন্দর্য স্বভাবতই কোমল। কিন্তু তারও যে একটি রুদ্ররূপ থাকতে পারে তার প্রথম পরিচয় এবং সাফল্য মধুসূদনের কাব্যেই সূচিত হয়েছিল। যুদ্ধবেশে সজ্জিতা প্রমীলার রূপ,

'কিরীট ছটা কবরী উপরি—
হায়রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী শিরে
ইন্দ্রচাপ।...
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল
রবির পরিধি বহন বাঁধিয়া নয়নে !'

এবং

'নাদিল দানব বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনী-যূথ যথা-মত্ত মধু কালে।'

রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রের উদাহরণও মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যে আছে,

'মানস সকাশে শোভে কৈলাস শিখরে
আভাময়, তার শিরে ভবের ভবন,
শিখিপুচ্ছ চূড়া যেন মাধবের শিরে !
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর ; স্বর্ণফুলশ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীতধড়া যেন !
নির্ঝর-ঝরিত-বারিরাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ !'

এই বর্ণনায় হিমালয়ের বিরাটত্বের আভাস অত্যন্ত ক্ষীণ। যে কবির লেখনী প্রকৃতির রুদ্ররূপ বর্ণনায় পারদর্শিতা ছিল, হিমালয়ের চিত্র অঙ্কনে তাঁহার বাঙালিকবিসুলভ দীনতা বাঙলা কাব্যে প্রকৃতির রুদ্ররূপের আপেক্ষিক অনুপস্থিতিরই পরিচায়ক। রূপকাত্মকতা এবং প্রকৃতি বর্ণনার কবিত্বে সৃষ্টিতে অবশ্য এই অংশটির গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়।

প্রাচীন সাহিত্যের মতোই মধুসূদনের কাব্যে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান মানবত্ব আরোপকে অবলম্বন করেই অনুভূতিশীল হয়ে উঠেছে।

অনুভূতিশীল রূপ দেবার জন্য এই উপাদানগুলিকে প্রাণবান্ করে তোলার ক্ষেত্রে মধুসূদনেরও স্বকীয় কোনো বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নেই। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের প্রাচীন সাহিত্যপাঠের সাক্ষাৎ পুরস্কার হিসাবেই তিনি এগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সমুদ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে অতীতকালেই তাকে জলদলপতি রূপে কল্পনার মধ্য দিয়েই। মধুসূদনের কাব্যেও সমুদ্র প্রাণবান্। সমুদ্রের প্রতি রাবণের আক্ষেপযুক্ত তিরস্কার,

'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
হে প্রচেতঃ,

এই উক্তিতে সমুদ্র অনুভূতিশীল রূপ পরিগ্রহ করেছে। অন্যত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ যোদ্ধবেশে সজ্জিত রাবণ সৈন্যদের ক্রুদ্ধ পদক্ষেপের সঙ্গে সমুদ্র সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছে—

'টলিল কনকলঙ্কা বীর পদভরে ,
গর্জিলা বারীশ রোষে।'

শুধু তাই নয় Illiad এর সমুদ্র দেবী Thetis এবং Milton এর Comus এর সমুদ্রদেবীর অনুকরণে সমুদ্রপত্নী বারুণীর কল্পনা করে এবং সমুদ্রের আকস্মিক চাঞ্চল্যকে তার মনে সঞ্চারিত করে দিয়ে মানবত্ব আরোপের সাহায্যে মধুসূদন সমুদ্রের সহানুভূতিশীলতাকে কবিত্ব মণ্ডিত করেছেন। কিন্তু এ সার্থকতায় কেবলমাত্র ভাষান্তরের গৌরবই মধুসূদনের প্রাপ্য—কল্পনার মৌলিকত্ব তাঁর নয়।

একাকিনী শোকাকুলা অশোক-বনে বন্দিনী সীতার নিকট সরমাকে উপস্থিত করবার আগে কবি সমস্ত প্রকৃতিকে সহানুভূতির রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন। বর্ণনার ভাষায় কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে

'স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া,
উচ্ছাসে বিলাপী যথা! নড়িছে বিষাদে
মর্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম
পড়েছে তরু মূলে, যেন তরু তাপি মনস্তাপে
ফেলিয়াছে খুলি সাজ!'

মায়াদেবীর অনুরোধে কমলা যখন লঙ্কার উপর থেকে তাঁর অনুগ্রহ রশ্মি সংবরণ করিলেন তখন সমস্ত প্রকৃতি লঙ্কার এই ভাগ্যবিপর্যয়ে সহানুভূতি জানিয়েছিল,

'গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল ; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা ;
কল্লোলিলা জলপতি ; কাঁপিলা বসুধা
আক্ষেপে',

চিরাচরিত রীতির প্রশ্রয় থাকলেও এই বর্ণনাটির বিষাদের সুরে কবিত্বময় আন্তরিকতাও আছে।

বীরাঙ্গণা-কাব্যে সহানুভূতিশীল এবং নির্বিকার প্রকৃতিচিত্রের অনেকগুলি উদাহরণ আছে। শকুন্তলার বিরহী হৃদয়ের পটভূমিতে প্রকৃতিকে কবি অনুভূতির রঙে রঙিন করে তুলেছেন। দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণীর পত্রে দ্বারকানাথের জন্মদিনের প্রকৃতির উন্মত্ত আনন্দ প্রকাশকে রুক্মিণীর কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেছেন। তিলোত্তমাসম্ভবা কাব্যেও পরাজিত দেবকুলের আশ্রয়স্থল বিন্ধ্যপবতে ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলমীর আগমনে প্রকৃতি আনন্দমুখরা হয়ে উঠেছে।

ব্রজাঙ্গণাকাব্যের বিষয়বস্তু বৈষ্ণবকবিতা থেকে ধার করা। কিন্তু তবু রীতির (Convention)-র দিক থেকে মধুসূদন কিছু কিছু নূতনত্বের সন্ধান দিয়েছেন। এই নূতনত্বের মধ্যে প্রধান রাধিকার সখীহীনতা। দু একটি কবিতা ছাড়া রাধিকার আক্ষেপ প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে সম্বোধন করেই প্রকাশিত হয়েছে। সমস্ত প্রকৃতি যেন রাধিকার মনে প্রবেশ করে সখীস্থান অধিকার করেছে। যমুনা-তট, ময়ূরী, পৃথিবী, প্রতিধ্বনি, ঊষা, মলয়-মারুত ইত্যাদি কবিতাগুলি এ উক্তির পরিপোষক। কিন্তু প্রকৃতির সখীস্থান গ্রহণের মধ্য দিয়ে যদিও প্রকৃতি-সুন্দরী অনুভূতির অধিকারিণী হয়ে উঠেছেন, তবু কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে শকুন্তলার নিবিড় যোগাযোগের মতো কোনো গভীর দৃষ্টি মধুসূদনের কাব্যকে গৌরবান্বিত করে নি। ব্রজাঙ্গণা কাব্যে নির্বিকার প্রকৃতি চিত্রও আছে। প্রকৃতির মধ্যে যে চিরন্তন

মিলনলীলা অভিনীত হয়ে চলেছে, তার সঙ্গে নিজের অবস্থা তুলনা করে রাধিকার বিরহী হৃদয় গভীর ক্রন্দনে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সাগর সোহাগিণী যমুনা, ঋতুপতি রূপসী ধরণী প্রকৃতির দিকে তাই রাধিকার মাৎসর্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির প্রতি সখীভাবেব উদাহরণ মেঘনাদবধ কাব্যেও আছে। সরমার নিকট সীতার উক্তি,

'বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভুবা
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীতশুনি কোকিলের ধ্বনি !'

কিন্তু ব্রজাঙ্গণা কাব্যেরই মতোই এই সখী-সম্পর্ক বহুলাংশে বাহ্যিক, উপবন দুহিতা শকুন্তলার মতো সীতা অরণ্যের সহিত আত্মিক সমৃদ্ধ স্থাপন করিতে পারেন নি।

ঋতু বর্ণনার পরিচয় মধুসূদনের কাব্যে ক্ষীণ। মেঘ, ময়ূর, চাতক, চাতকী, মলয় পবন, পুষ্পস্তবক ইত্যাদি ঋতুবর্ণনার চিরাচরিত উপাদানগুলি মধুসূদনের কাব্যে বহুস্থানে স্থাপিত হয়েছে কিন্তু প্রকৃত ঋতুবর্ণনার প্রয়াস প্রায় নেই। কতকগুলি খণ্ড কবিতার নামাকরণে ঋতুবর্ণনার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু কবিতায় বর্ণিত বিষয়বস্তু এবং ভাব সে ইঙ্গিতকে সার্থক করে তোলেনি। 'আশ্বিনমাস,' 'বসন্তে' 'একটি পাখীব প্রতি' ইত্যাদি কবিতাগুলি এর প্রমাণ। প্রকৃতিচিত্র বর্ণনায়ও মধুসূদন মুখ্যত প্রাচীনপন্থী এবং সজ্জাবিলাসী (decorative)। সরমার নিকট সীতার তপোবন বর্ণনায় এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। শিখী, কোকিল এবং পুষ্পসম্ভার নিয়ে প্রকৃতি তার চিরাচরিতরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে,

'অতিথি আসিত নিত্য করভ-করভী,
মৃগশিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণঅঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহবা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনু, ঘনবরশিরে ;
হিংসক জীব যত।'

বনবাসী সীতার জীবনের অপরিমিত সুখের দিনগুলিকে বর্ণনা করার জন্য যে যে উপাদানের প্রয়োজন, কবি যেন সেগুলির উল্লেখ মাত্র করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। সযত্ন-সজ্জিত কৃত্রিম পুষ্প স্তবকের সজ্জা আছে কিন্তু সৌরভ নেই। এই বর্ণনায় মধুসূদনের আরও একটি বিফলতা প্রতিফলিত। অরণ্যের ভয়ানক রূপটির প্রতি কবি প্রায় নির্বিকার। ভীষণ দণ্ডকবন যেন পক্ষীকূজন-মুখরিত, পুষ্পভারা-নত একটি উদ্যানে পরিণত হয়েছে।

পাশ্চাত্য কবি Milton প্রভৃতির অনুকরণে মধুসূদন পাতালপুরীর একটি বর্ণনা মেঘনাদবধের অষ্টমসর্গে সন্নিবিষ্ট করেছেন—সে বর্ণনায়ও প্রেতপুরীর ভীষণতা এবং অদেখা রাজ্যের রহস্যময়তা রূপ পায়নি। তবে প্রকৃতির রুদ্র রূপ বর্ণনায় কিছু পরিমাণ সফলতার দাবী বোধহয় আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে একমাত্র মধুসূদনেরই অগ্রগণ্য। গম্ভীর শব্দ সমাবেশ এবং ছন্দের বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রকৃতির ভীষণতা মধুসূদনের কাব্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধরা পড়েছে। ইন্দ্রের আদেশে প্রভঞ্জনের কারারুদ্ধ বায়ুদলকে মুক্তিদান এবং তাদের পরাক্রমে উৎথিত প্রলয় ঝঞ্ঝার বর্ণনা।—

'শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথাঅম্বরাশি, যবে ভাঙ্গে আচম্বিতে
জাঙাল। কাঁপিল মহী; গর্জ্জিল জলধি!
তুঙ্গ শৃঙ্গ ধরাকারে তরঙ্গ আবলী
কল্লোলিল, বায়ু সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি!
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত, হাসিল
ক্ষণপ্রভা; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।'

অনুরূপ আরও দু-একটি ঝঞ্ঝার বর্ণনা মেঘনাদবধ কাব্যে আছে। কিন্তু বীর রসাত্মক কাব্য সৃষ্টি করতে গিয়ে হয়তো বা নিজের অজ্ঞাতে তাঁর মধুসূদন প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় মেঘনাদবধকে করুণরসাত্মক করে তুলেছেন, 'সপ্তদিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে' যেরূপ এই অমর কাব্যের মূল সুর। প্রকৃতিবর্ণনায়ও সেরূপ প্রকৃতির রুদ্ররূপকে

অতিক্রম করে প্রকৃতির শান্তরূপই তাঁর কাব্যে প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির শান্তরূপ বর্ণনায় মধুসূদনের প্রতিভার পরিচয়, মেঘনাদবধের দ্বিতীয়সর্গের প্রারম্ভে একটি প্রশান্ত সমাহিত গোধূলি দৃশ্যের বর্ণনাতে প্রকাশ পেয়েছে।—

'অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে! ফুটিলা কুমুদী
মুদিলা সরসে আঁখি বিরষ বদনা
নলিনী; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে,
গোষ্ঠগৃহে গাভীবৃন্দ ধায় হাম্বারবে।
আইলা সুচারু তারা শশিসহ হাসি,
শর্ব্বরী, সুগন্ধ-বহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন কোন ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।'

হেমচন্দ্রঃ হেমচন্দ্রের কাব্যে প্রকৃতিবর্ণনার স্থান প্রচুর, এমনকি প্রকৃতিবর্ণনায় তাঁর কাব্য ভারাক্রান্ত একথা বললেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতিচিত্র বর্ণনার বিন্দুমাত্র সুযোগকেও হেমচন্দ্র অবহেলা করেননি। কিন্তু প্রতিভার ধ্রুপদী (classical) ধর্মহেতু তাঁর কাব্যে বর্ণিত প্রকৃতি সংস্কারযুক্ত হতে পারেনি। হেমচন্দ্রের প্রকৃতি-প্রেম প্রধানত চিরচরিত রীতির প্রশ্রয়ের একটি অখণ্ড ইতিহাস। ইংরেজ কবি বা কাব্যের অনুসরণে তিনি যেস্থানে প্রকৃতির প্রতি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করবার প্রয়াস করেছেন সব স্থানে তাঁর এই সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি প্রকৃতিপ্রেমের স্ফুরণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংস্কৃত অথবা প্রাচীন বাঙলা কাব্যে প্রকৃতির প্রতি যতপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা এ পর্যন্ত করা হয়েছে, হেমচন্দ্রের কাব্যে কোনোটিরই অভাব নেই। বীরবাহুকাব্যে প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের নিদর্শন আছে একটি প্রভাত-বর্ণনায়।—

'যামিনী পোহায়ে যায় ভূষাপরি উষা ধায়
আগে ভাগে ছুটে গিয়ে পথশয্যা করিছে।

অরুণে করিয়া সঙ্গে অলক্ত লেপিয়া অঙ্গে
দুই ধারে রাঙা রাঙা ঘণগুলি থুইছে ॥
সুধাকরে কোলে করি শ্বেতসাটী দিয়া ধীরি
মধুমাখা মুখ তার ভালকরে ঢাকিছে।'

এই বর্ণনার মানবত্ব-আরোপ শিশুসুলভ সরলতায় পূর্ণ, গভীর কবিদৃষ্টি এই বর্ণনাকে উদ্বুদ্ধ করেনি। এ বর্ণনাটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হেমচন্দ্রের সমগ্র কাব্যে, বিশেষ করে বৃত্রসংহার কাব্যে রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের অভাব নেই। কালিদাস-প্রযুক্ত অনেক প্রাকৃতিক উপমা হেমচন্দ্র ব্যবহার করেছেন তবে কালিদাসের উপমার ব্যাপকত্ব এবং গভীর ব্যঞ্জনা এগুলিতে নেই।

'করীতে হেলায় শুণ্ড উপাড়িয়া তরুকাণ্ড
দশনেতে লতিকা ধরিল।'

হেমলতা হরণে বীরবাহুর এই খেদোক্তির মধ্যে হেমলতার লতিকা সুলভ কমনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত আছে সত্য কিন্তু কালিদাসের অনুরূপ উপমাটির মধ্যে হস্তীর দন্তলগ্ন কমলের সহিত পার্বতীর তুলনায় যে আনুপাতিক সম্বন্ধের সুষ্ঠুতা প্রকাশিত হয়েছিল এখানে তার পরিচয় নেই। এই চিত্রটি বিভিন্ন ভাষায় হেমচন্দ্রের কাব্যে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। বৃত্রসংহার কাব্যে দেব ও দানব সৈন্যদলকে পরস্পরের সম্মুখীন করে তাদের উত্তাল বিক্ষোভকে হেমচন্দ্র একটি উপমার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন,

'মিলিল দুদল,—দুই মহানদ—
মিলে যেন রঙ্গে ফুটিয়া উন্মদ—,
ফেন রাশি রাশি তরঙ্গে তরঙ্গে
ছুটে কোলাহলি দুই নদ অঙ্গে
দুনদ বিস্তার সমূহ জুড়ি।'

এই উপমাটিও কালিদাসগন্ধী। বিবাহ বেশে সজ্জিত শিবানুগামী শোভাযাত্রাকে অভ্যর্থনার জন্য সপারিষদ হিমালয় যখন তোরণ-দ্বারের নিকট অগ্রসর হলেন তখন কবির ভাষায়—

'বর্গাবুভৌ দেবমহীধরাণাং দ্বারে পুরস্তোঘাটিতাপিধানে।
সমীয়তুর্দুরবিসর্পিঘোষৌ ভিন্নৈকসেতু পয়সামিবৌঘৌ ॥'

—নগরের তোরণ-দ্বার উন্মোচিত হলে দুই দিক থেকে দুই দল এসে পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। বহুদূর পর্যন্ত বিসর্পিত উভয়দলের ঘনরোল শুনে মনে হল যেন দুটি প্রবল জলোচ্ছ্বাস একই সেতু ভগ্ন করে সম্মিলিত হয়েছে। হেমচন্দ্রের উপমাটি কালিদাসের মতো সার্থক নয় একথা বলাই বাহুল্য। দুটি নদী পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হয় একে অন্যের অঙ্গে মিশে যাবার জন্য—পরস্পরের ধ্বংসাকাঙ্ক্ষায় নয়। কাজেই হেমচন্দ্রের উপমার দুই নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে কোলাকুলির বর্ণনা সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। উপমা প্রয়োগে হেমচন্দ্র মাঝে মাঝে হোমার সুলভ (Homeric) রীতির অনুসরণ করেছেন। Homeric রীতির সহিত কালিদাসের উপমা প্রয়োগের রীতির বিভিন্নতা আছে। কালিদাসের উপমাগুলি সাধারণত ভাষার দিক দিয়ে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাদের অর্থের মধ্যে আছে গভীর ব্যঞ্জনা এবং স্থিতিস্থাপকতা। Homeric উপমাগুলি কিন্তু দীর্ঘ। উপমানের বৈশদ্যে (Details)র দ্বারা একটি চিত্রকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা এই উপমাগুলির প্রধান বিশেষত্ব। উপমানের এই বিশদ বর্ণনা (Details)-গুলি কিন্তু অর্থহীন নয়। Details-এর সাহায্যে অঙ্কিত চিত্রটি উপমেয়ের সহিত উপমানের আপাতসাদৃশ্য ছাড়াও অন্য কিছুর ইঙ্গিত দেয়। হেমচন্দ্রের উপমাগুলি পরিপূর্ণভাবে Homeric না হলেও, Homeric রীতির আভাসে ধন্য।

'দেখিলা দানব রাজ গরিমার ছটা
ঐন্দ্রিলার মুখপদ্মে—যথা সে পঙ্কজ
সূর্যের কিরণ মালা, অরুণ যখন
অরুণ-সান্দনে চাপি নিলাম্বর পথে
আনন্দে চালায় রথ; মৃদু কলস্বরে
জাগায় মানবে সুখে বিহঙ্গিণী-ব্রজ।'

এই উপমাটিতে ঐন্দ্রিলার মুখের গরিমার ছটার সহিত পঙ্কজে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মির তুলনাই প্রধান বক্তব্য বিষয়। পরবর্তী অংশের

বিহঙ্গমকুজন প্রভৃতি details উপমাটির পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়, তবু এই চিত্রগুলি উপমাটিকে একটি বৃহত্তর সার্থকতা দান করেছে। এইরূপ Homeric ধর্মী উপমাব সংখ্যা হেমচন্দ্রের কাব্যে নিতান্ত অল্প নয়। উপরোক্ত শ্রেণীর উপমাগুলি ছাড়াও অন্য ধরনের প্রচুর উপমা হেমচন্দ্রের কাব্যকে অলংকৃত করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা প্রাচীন চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করলেও প্রকাশভঙ্গির গৌরব এদের প্রাপ্য। বৃত্রের নিকট ইন্দ্রপ্রিয়ার গর্বোন্নত ভঙ্গির ভাষা,

যেন রাজহংসী পদ্মবন লুঠি
মৃণাল আহারে তুষ্ট স্বচ্ছ সরোবরে
চঞ্চুতে পঙ্কজ শোভা পক্ষ সাপটিয়া
মধ্যহ্রদে স্থির হয়ে গ্রীবা উচ্চ করে।'

মৃণাল আহারে তুষ্ট রাজহংসীর সহিত বন্দিনী ঐন্দ্রিলাব সাদৃশ্যটি বেশি দূর বিস্তৃত না হওয়াতে স্থিতিস্থাপকতায় এই উপমাটি চিত্র-গৌরবের অনেক পশ্চাতে পড়ে আছে। বৃত্রাসুরের সভায় নৈমিষ-অরণ্য থেকে প্রত্যাগত দূত ভীষণের মৃত্যু সংবাদ বহন করে এনেছে। কিন্তু সে সংবাদ নিবেদন করতে দূতের বাসনা,

'হইল জডতা পূর্ণ কম্পাবিরহিত—
যথা নব-কিশলয় বরষার নীরে
আর্দ্র তনু, বিলম্বিত তরুর শাখায়।'

এই চিত্রটিতে কবিদৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতার পরিচয় আছে।

প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত সৌন্দর্যের উপাদানগুলিতে হেমচন্দ্র সংস্কারমুক্তমনের পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁর কাব্যের বা আবেষ্টনী (setting) হয়তো এইজন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। বৃত্রসংহারকাব্যে ইন্দুবালার রূপ.বর্ণনায় কবি কালিদাস প্রযুক্ত একটি উপমার সাহায্য গ্রহণ করেছেন.

'আবদ্ধ কুন্তল পড়েছে গ্রীবা উরস পরে ;
যেন মেঘমালা বায়ুতে চঞ্চল অর্ধাবৃত শশধরে।'

কালিদাসের অনুরূপ উপমাটিতে সৌন্দর্য প্রকাশের অবলম্বন ছিল ভাষানুসঙ্গী 'প্রকৃতি, এস্থানে সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে রূপকাত্মক দৃষ্টির সাহায্যে।

হেমচন্দ্রের সহানুভূতিশীল অথবা নির্বিকার প্রকৃতিচিত্রগুলিও গতানুগতিকতা বীরবাহুকাব্যে হেমলতা ও বীরবাহুর গ্রীষ্ম-উপবনে আগমনের আনন্দে কবি সমস্ত প্রকৃতিকে অনুভূতিশীল করে চিত্রিত করেছেন। চিত্রগুলিতে নূতনত্বের পরিচয় নেই, এমনকি প্রকাশভঙ্গিও সংস্কারমুক্ত নয়। একস্থানে বীরবাহুর বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রতি প্রকৃতি চিরাচরিত রীতিতেই নির্বিকার দৃষ্টিপাত করেছে। বৃত্রসংহার-কাব্যে দধীচির তনুত্যাগে সমস্ত তপোবন প্রকৃতি অনুভূতি সজল চক্ষে গভীর বেদনা প্রকাশ করেছে।—

মুনি শোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি, স্নিগ্ধ নভস্থল,
সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছ্বাস
বনলতা তরুকুল শোক-অবনত।'

অন্যত্র বন্দিনী শচীর স্বর্গে আগমনে সমস্ত নন্দন কানন আনন্দ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সেই আনন্দোন্মত্ততা গতানুগতিক রীতিতেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতি বর্ণনায় হেমচন্দ্রের কাব্যে শান্ত রসেরই প্রাধান্য। রুদ্র-রূপ বর্ণনায় খুব অল্প স্থানেই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বৃত্রসংহার কাব্যে পরাজিত দেবগণের আবাস স্থল পাতালের দু-একটি বর্ণনা আছে কিন্তু সেগুলি ঠিক প্রকৃতিবর্ণনা নয় বলে আমাদের আলোচনার গণ্ডির বাইরে। স্বর্গদৃশ্য বর্ণনায় কবি প্রকৃতি বর্ণনার চিরাচরিত রীতির উপর বর্ণ প্রলেপ দিয়ে বর্ণবহুল (decorative) করে তুলেছেন। স্বর্গের সে বর্ণনায় আতিশয্য আছে কিন্তু রহস্যময়তা নেই। শূন্য থেকে ধরণীর সৌন্দর্য দর্শনের একটি বর্ণনাও বৃত্রসংহারে আছে। কিন্তু সেই বর্ণনাতে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব নেই।' প্রকৃতি চিত্র অঙ্কনে কবির প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বৃত্রসংহার কাব্যে দধীচির আশ্রমের অরণ্য পরিবেশের বর্ণনায়। সে বর্ণনায় একাধারে প্রশান্ত

প্রকৃতিচিত্র, অরণ্যের রহস্যময় বর্ণনা এবং ভীষণতার ভাভাস প্রকাশিত। প্রথমাংশে প্রকৃতির শান্তরূপ মানবত্ব আরোপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে,

…বিশাল বিস্তৃত
রম্য সে অরণ্যদেশ! সন্ধ্যায় তিমির,
গাঢতর স্নেহে যেন দিয়া আলিঙ্গণ
আদরে ধরেছে সুখে অটবী সখীরে।'

কিন্তু সে অরণ্যে সর্বত্রই এই পরিপূর্ণ শান্তির চিত্র নে, ভীষণতাও আছে।

'কোথা শান্তি স্থির ভাব কোথা ভয়ংকর'

সে ভীষণতার ভাষা,

'বিকট তক্ষকনাদ ভল্লুক চীৎকার
পেচকের ঘোর ধ্বনি, কেশরি গর্জন,
ভয়াতুর বিহঙ্গের পক্ষের নিস্বন,
শাখাচ্যুত পল্লবের শব্দ মৃদতর,
পবনের স্বন্ স্বন্ সুঘোর নিশ্বাস।'

বিবিধ অনুকার শব্দগুলি একটি রহস্যের অনুভূতি সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। রোমাঞ্চকর ভীষণতায় সে রহস্যময়তায় পরিসমাপ্তি,

'কোথাও আবার শাখা জটা ভয়ংকর
নিশাচর যেন ঘোর ঘন অন্ধকারে
প্রসারণ করে কর!'

কবি ঈশ্বরগুপ্তের ন্যায় হেমচন্দ্রকেও প্রকৃতি মাঝে মাঝে স্রষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই স্মরণের পশ্চাতে কোনো অনুভূতি লব্ধ সত্য নাই, স্রষ্টাকে স্মরণ করতে হবে বলেই যেন কবি চিরাচরিত বর্ণনা থেকে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছেন। প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব তাঁর অনুভবের সীমার প্রবেশ করেনি। চিন্তাতরঙ্গিণীতে,

'মহিমার ধ্বজা লয়ে   বিমানে বিরাজ হয়ে
চারিদিকে তারাগণ ধায়।

সাজিয়া মোহন সাজে বসিয়া ভবের মাঝে
শশধর তাঁর গুণ গায়।'

অনুভূতির সঞ্জিবনী-স্পর্শে উপরোক্ত অংশটির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি।

প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে নীতি সংগ্রহের চেষ্টাও হেমচন্দ্রের কাব্যে আছে। এই নীতিসংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজ কবিদের অপেক্ষা ঈশ্বরগুপ্তেরই বেশি অনুসরণ করেছেন অর্থাৎ প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তনের উপরেই তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। আর প্রায় সর্বত্রই তাঁহার এই নীতিসংগ্রহে যেন রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রই প্রধান চিন্তাতরঙ্গিণীতে আছে।—

'...যেন মধ্যাহ্নের প্রখর মিহির।
বৈকালে লুকায় আড়ে যেন সুগভীর॥
বিঘোর আঁধার নয় এ ভব ভিতরে।
সুখ যাহা দেখ তাহা মুহূর্তের তরে॥'

অথবা জীবন-মরীচিকা কবিতায় তিনি প্রভাতের কুহেলিকাময় অরুণোদয়, কুসুমিত তরুচয়ের গন্ধ বিতরণ এবং বিহঙ্গকুলের মধুময় কলগীতি ইত্যাদির সহিত মানবের জীবনে প্রভাতের স্বপ্নময় আশা এবং কামনার তুলনা করেছেন কিন্তু জীবন-মধ্যাহ্নে,

'না থাকে কুহেলি অন্ধ না থাকে কুসুম-গন্ধ,
না ডাকে বিহঙ্গকুল সমীরণ ঝংকারে।
এইরূপে ক্রমে যত শৈশব যৌবন গত
মনোমত সাধ তত ভাঙ্গে চিত্ত বিকারে॥'

এই বর্ণনায় প্রকৃতির মধ্যে রূপকাত্মকতার পরিচয়ই বেশি. নীতিটা যেন তত প্রধান হয়ে ওঠেনি।

গীতি-কবিতা রচয়িতা হিসাবে হেমচন্দ্রের প্রচুর খ্যাতি। প্রকৃতপক্ষে হেমচন্দ্রের গীতি-কবিতায় প্রকৃতিপ্রেমের নূতন একটি ধারার আভাস ছিল। কবি ঈশ্বরগুপ্ত চেষ্টা করেছিলেন চোখ মেলে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করতে, আর হেমচন্দ্রের কাব্যে ছিল মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিত,

হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি.
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী ;'

এই সুরটি বাঙলা সাহিত্যে নূতন সন্দেহ নেই। ইংরেজি রোমান্টিক কবি Wordsworth, Shelley প্রভৃতিব সহিত পরিচয়ের ফলে হেমচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রকৃতিচিত্রের সঙ্গে আপনার মনের ভাব সমন্বিত না করতে পারলে প্রকৃত প্রকৃতি-কাব্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা সফল হয় না। তাঁর অনেক গীতি-কবিতা এই সমন্বয় প্রয়াসের ইতিহাস। 'যমুনা তটে' অথবা 'দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে', ইত্যাদি কবিতাগুলি তার প্রমাণ আছে। কবিতাগুলিব মধ্যে আত্মলীনতাব (subjectivity) ইঙ্গিতও স্থানে স্থানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রকৃতিপ্রেমেব ধারায় কবি অনেকটা Wordsworth পন্থী। প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সময় কবির মনে পশ্চাৎপট সর্বদাই মনুষ্য জীবনের কথা লগ্ন হয়ে আছে। কাজেই মানবজীবনেব সঙ্গে প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ বা দৃশ্যের সাদৃশ্য বা পার্থক্যই তাঁর কাব্যে প্রধান অংশ জুড়ে আছে।

কিন্তু প্রকৃতিচিত্রের মধ্যে কবির নিজের মনের ভাব থাকা চাই এই কথাটাকে যেন হেমচন্দ্র অত্যন্ত স্থূলভাবে বুঝেছিলেন। এই সত্যটিকে অন্তব দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন নি তাই অনেক স্থলে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে আপনার মনের ভার সমন্বিত করতে গিয়ে বহুলাংশে ব্যর্থতা নিয়ে ফিরেছেন। প্রকৃতিচিত্রের সঙ্গে নিজস্ব ভাবগুলিকে বাইরে থেকে জুড়ে দিয়েছেন মাত্র, অন্তরে অন্তরে তাঁদের মিলন ঘটেনি। সরোবরে ভাসমান একটি পদ্মের মৃণালকে দেখে তাব সঙ্গে কবির মনে যে ভাবের উদয় হল তার সঙ্গে তিনি নিজের কিছু চিন্তা যেন জুড়ে দিলেন।

'সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি,
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি।

অদৃষ্টের নিবন্ধন ভাবিয়া ব্যাকুল মন
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি।'

এটা প্রকৃতিকে নিজের মনের অন্তর ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা নয়, এ যেন নিজের মনের ভাবগুলিকে প্রকৃতির কিছু দৃশ্যের মধ্য থেকে উদাহরণরূপে খুঁজে বের করা। বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে কবির আপনার অন্তর্লোকে অভিসার সফল হয়নি—ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি চিত্রই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে।

প্রকৃত প্রকৃতিকাব্য রচনায় হেমচন্দ্রের বিফলতার আর একটি কারণ তাঁর সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি। ঈশ্বর গুপ্তও মাঝে মাঝে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁর অপরিণত কবিপ্রতিভা সে দৃষ্টিকে কাব্যরসে অভিষিক্ত করে তুলতে পারে নি। হেমচন্দ্রের কবি প্রতিভা ছিল, একটা মেজাজ (mood) নিয়ে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয় এ ধারণাও ছিল। কিন্তু যে-দৃষ্টিতে তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন, তার মধ্যে সরসতা (freshness) ছিল না। প্রাচীন কবিদের প্রদর্শিত গতানুগতিক পথেই তিনি প্রকৃতি বর্ণনার প্রয়াস করেছেন। প্রতিভার ধ্রুপদী (classical) ধর্ম হয়ত এর কারণ। কিন্তু প্রকৃতিচিত্রে কাব্যে সমন্বিত করার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নিলেও তাঁর গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না। হেমচন্দ্রের ব্যর্থতা নবীনচন্দ্র ও বিহারীলালের মধ্য দিয়া যে পরিণতি লাভ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পৌঁছেছে। তাঁর কাব্য এই পথ পরিক্রমার একটি অন্যতম প্রধান সোপান।

নবীনচন্দ্র : নবীনচন্দ্রও প্রধানত মহাকাব্য (Epic) রচনায় আপনার প্রতিভার প্রকাশ করেছেন। কিন্তু হেমচন্দ্র অপেক্ষা তাঁর রচনায় সরসতা (freshness) বেশি ছিল। কাজেই তাঁর রচনার মধ্যে মাঝে মাঝে আমরা আত্মলীনতার সন্ধান পাই। কবি মনের সঙ্গে পাঠক মনের মাঝে মাঝে নিবিড় সংযোগ ঘটে। ইংরেজি কাব্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ঈশ্বরচন্দ্র যে একটি নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত করেছিলেন, মধুসূদনের কাব্যে সেটা সফল হয়নি। হেমচন্দ্র

সেটা বুঝেছিলেন কিন্তু উপলব্ধি করতে পারেন নি। নবীনচন্দ্রের কাব্যে সে-সম্ভাবনার অনেকখানি সাফল্যের পরিচয় আছে।

নবীনচন্দ্রের সমগ্র কাব্যে রূপ-বর্ণনার অংশ অত্যন্ত অল্প। গতানুগতিক প্রকৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নারীর রূপ বর্ণনা করার চেষ্টা তাঁর রচনায় নেই বললেই চলে। অধিকন্তু রূপ বর্ণনায় তিনি গতানুগতিকতার মোহ ছিন্ন করে স্থানে স্থানে সরসতার পরিচয় দিয়েছেন। 'অবকাশ রঞ্জিনী'তে 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী' কবিতায় একটি নিঃসঙ্গ নারীর চিত্র—

'দরিদ্র সম্ভবা আমি সামান্যা রূপসী,
ছিলাম প্রান্তরে ক্ষুদ্র কুসুমের প্রায়।'

কিংবা 'কে তুমি' কবিতায় নদীতীরে একাকিনী উপবিষ্ট একটি বিষাদময়ী নারীর রূপ,

'যেন নিদাঘের আকাশ হইতে
একটি নক্ষত্র সরোবর ঘাটে
পড়েছে খসিয়া,'

ইংরেজ কবি Wordsworth এর একটি কবিতার রূপ বর্ণনার ভাষার সঙ্গে এই অংশগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়,

'A violet by a mossy stone
Half-hidden from the eye!
—Fair as a star, when only one
Is shining in the sky.'

—শৈবাল মণ্ডিত প্রস্তর খণ্ডের পাশে সে যেন অর্ধলুক্কায়িত একটি ভায়োলেট কুসুম, যেন আকাশের কোলে একটি নিশুতি তারার সুষমা।—বৈশদ্যে (Details)র দিক থেকে ইংরেজ কবির উপমাগুলি অবশ্য নবীনচন্দ্রের উপমাগুলিকে ম্লান করে দিয়েছে। গোধূলির আকাশের প্রথম তারকাটির সুষমা মধুসূদনকেও প্রলুব্ধ করেছিল। বিভিন্ন উপমায় এই চিত্রটি বারবার তিনিও ব্যবহার করেছেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যেও নিরালায় প্রস্ফুটিত কুসুম এবং সন্ধ্যাকালে সঙ্গীবিহীন একটি তারকার চিত্র অন্যান্য উপমায়ও ব্যবহৃত হয়েছে। 'রঙ্গমতী' কাব্যে

'—একটি কুসুম,
মধ্যজলে,—মধ্যাকাশে একটি নক্ষত্র
মরি শোভিতেছে যেন !'

অন্যান্য রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রের বর্ণনায় কবি প্রাচীন চিত্রের ব্যবহার অতিক্রম করতে পারেন নি। "পিতৃহীন যুবক" কবিতায়,

আশ্রয় পাদপ যদি প্রভঞ্জন বলে
হয় ধরাতল শায়ী, ঝরে পত্রগণ ;
জ্বলি রবিকরে, ভিজি বরিষার জলে
আশ্রিত লতিকাপুঞ্জ হারায় জীবন।'

নানাপ্রকার সূক্ষ্ম বর্ণনা (details)-র সাহায্যে উপমাটি মনোরম করবার চেষ্টা করলেও, আশ্রয় পাদপের প্রতি লতিকার একান্ত নির্ভরের প্রাচীনত্ব ঢাকা পড়ে নি। হেমচন্দ্রের কাব্যের ন্যায় নবীনচন্দ্রের কাব্যগুলি প্রাকৃতিক উপমায় ভারাক্রান্ত নয়। তবে মাঝে মাঝে সুন্দর চিত্র আছে। 'রৈবতক' কাব্যে শৈলর কুন্তল শোভিত কোমল আননের প্রতি অর্জুনের সস্নেহ দৃষ্টিপাতকে কবি একটি চিত্রের সাহায্যে চিরন্তন করে তুলেছেন।

'সেই ক্ষুদ্র মুখখানি,
অর্জুন আদরে তুলি নিজ বাম করে,
অন্যকরে সরাইয়া কুঞ্চিত কুন্তল
দেখিলা সে ক্ষুদ্র মুখ ; যথা সমীরণ
সরাইয়া লতা দেখে কানন-কুসুম।'

ইহাতে শৈলর কুসুম কোমল সৌন্দর্য এবং কুসুম ও সমীরণের সস্নেহ সম্বন্ধের প্রতি ইঙ্গিত থাকায় উপমাটি বর্ণনা বৈশদ্যে (details) সার্থক।

অনুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনায় নবীনচন্দ্র স্থানে স্থানে চিরাচরিত রীতির সাহায্য গ্রহণ করেছেন। 'প্রত্যাখ্যান' কবিতায় একটি যুবক ও যুবতীর বিষাদময় বিদায় দৃশ্যের পটভূমিতে,

'শিশিরের চন্দ্রলোক, বিষাদের হাসি,
হাসিছে বিষাদ হাসি, তটিনীর নীরে ;

দুই পার্শ্বে ঝাউশ্রেণী, দাঁড়াইয়া তীরে,
গাইছে বিষাদ গীত, অতি ধীরে ধীরে ॥'

কিন্তু চিরাচরিত রীতির সাহায্য গ্রহণ করলেও সরসচিত্রের প্রয়োগে এই প্রকার সহানুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনায় স্থানে স্থানে অনুপম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, গতানুগতিকতার পরিচয় এইস্থানগুলিতে ক্ষীণ।—

'রজনীর কানে কানে দুঃখের বারতা
কহিয়াছি কতশত বলিব কেমনে,
যামিনী শুনিয়া দুঃখ, দেখি কাতরতা,
কাঁদিয়াছে ঝিল্লিরবে শুনেছি শ্রবণে।
আঁধার হৃদয়াকাশে তারার মতন,
ফুটিয়া শতেক আশা নিভেছে তখন।'

'অশোক বনে সীতা' শীর্ষক কবিতায় কবি অনুভূতিশীল প্রকৃতি চিত্রের যে একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন পূববর্তী বাঙলা কাব্যে তা দুর্লভ।

'কোথাও কোন উচ্চ তরুবর
অরণ্য হইতে তুলি উচ্চতর শির,
কারতেছে আকাশের সীমা নিরূপণ।'

এস্থানে অরণ্য নিবাসী তরুগণকে কেবলমাত্র মানবত্ব আরোপের দ্বারা সজীব করে তোলা হয়নি, তাদের অনুভূতি মানুষের সহিত সম্পর্কের মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে আকাশের সীমা নিরূপণের চেষ্টায় অরণ্যেব তরুকূল যেন সজীব হয়ে উঠেছে। এরূপ অভিনব উপায়ে প্রকৃতির মধ্যে অনুভূতি আরোপ নবীনচন্দ্রের কাব্য প্রতিভার সরসতারই পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'ও 'শেষশিক্ষা' কবিতায় অনুরূপ একটি অনুভূতিশীল প্রকৃতি-চিত্র আছে,

'সারি সারি
উঠেছে বিশাল শাল,—তলায় তাহারি
ঠেলাঠেলি ভিড় করে শিশু তরুদল
আকাশের অংশ পেতে!'

ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতিচিত্র নবীনচন্দ্রের কাব্যে দুর্লভ নয়, কিন্তু কবি সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে চিরাচরিত রীতিরই অনুসরণ করেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত অথবা হেমচন্দ্রের মতো প্রকৃতি চিত্র থেকে নীতি সংগ্রহের কোন উগ্র চেষ্টা নবীনচন্দ্রের কাব্যে স্থান পায় নি। তবে দুই এক জায়গায় নীতি সংগ্রহের ক্ষীণ চেষ্টা আছে। কিন্তু তার মধ্যে কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে। 'জুমিয়া জীবন' কবিতায়,

'ব্যাপিয়া নয়ন-পথ পর্ব্বত লহরী
উৎথিত আকাশে,—এই পাতালে পতিত,
এইরূপে উঠে পড়ে,
নরভাগ্য চিত্র করে,
দূরে নীল মেঘে নেত্র করে প্রতারিত!'

প্রকৃতি বর্ণনায় নবীনচন্দ্রের কাব্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান আছে। ঈশ্বরগুপ্তের মতো প্রকৃতির দিকে চোখ মেলে চাওয়ার চেষ্টা, চিরাচরিত বর্ণনার আশ্রয়ে প্রকৃতি চিত্র ফুটিয়ে তোলা, একটা বিশিষ্ট মেজাজ (mood) নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে, 'আপন মনের মাধুরী' স্পর্শকে সঞ্চারিত করে দেওয়া এবং মাঝে মাঝে সে চেষ্টার বিফলতা—সমস্তই নবীনচন্দ্রের কাব্যকে দোষে-গুণে বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য দান করেছে।

প্রকৃতির প্রতি গতানুগতিক দৃষ্টি বিবর্জিত চোখে তাকানোর চেষ্টা নবীনচন্দ্রের কাব্যের বহুস্থানকে গৌরবান্বিত করেছে। 'বুড়ামঙ্গল' কবিতায় বারাণসী ঘাটের চিত্রটি বাস্তবধর্মী,

'কিবা শোভা আলো তরঙ্গে নাচিয়া,
প্রতিবিম্বে শত সহস্র হইয়া;
যেন একখণ্ড আকাশ খসিয়া,
বারাণসী ঘাটে রয়েছে ভাসিয়া।'

একখণ্ড আকাশ বারাণসীর ঘাটে ভেসে থাকার বর্ণনায় প্রকৃতির দিকে চোখ মেলে দৃষ্টিপাত করার পরিচয় আছে। অন্যত্র 'চিত্র' কবিতায়,

'দেখিয়াছি ভাগীরথী ভাদ্রমাসে ভরা,
পূর্ণ জোয়ারের জল মন্থর যখন;'

ভরাগঙ্গার পূর্ণ জলোচ্ছাসের মন্থর গতি কবির প্রত্যক্ষ দৃষ্টির স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। 'রঙ্গমতী কাব্য'এ চন্দ্রকলার গীতে বারমাসিয়ার মতো একটি অংশের অবতারণা করা হয়েছে। অন্যান্য মাসের প্রাকৃতিক বর্ণনা গতানুগতিক। কিন্তু পৌষের বর্ণনা কবি-দৃষ্টির পরিচয়ে সমুজ্জ্বল,

'পৌষের প্রভাত কালে বসি খেঁজুরের ডালে
হুলু দেয় ভৃঙ্গরাজগণ,
আনন্দে আকাশে ডাকে লুঠে টিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে
শস্য ক্ষেতে সোনার যৌবন।'

খেঁজুরের ডাল, টিয়াপাখি ইত্যাদি উপাদান চিত্রটিকে বাস্তবতা (realism)র সৌন্দর্য দান করেছে। উপরন্তু প্রকাশভঙ্গির সুষ্ঠতায় পৌষের প্রভাত কালটি কাব্যে ধরা পড়েছে। 'বৈবতক' কাব্যে একটি বর্ষাদৃশ্য এমনি কতগুলি বাস্তব চিত্রের সাহায্যে সুন্দর হয়ে উঠেছে। গম্ভীর চিত্র-সংযোগ না থাকাতে মহাকাব্যেব গৌবব হয়ত ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিন্তু কবির বাস্তবচিত্রের প্রতি আকর্ষণ উদঘাটিত হয়েছে।—

....দুই চা.র দশ—
পড়িতে লাগিল ফোঁটা, ছুটিল গোপাল
হাম্বাবে উচ্চপুচ্ছে তরুর আশ্রয়ে।
আমরা রাখালগণ বালক বালিকা—
কেহ গিরি কোটরেতে, কেহ তরুতলে—
প্রশস্ত পল্লব ছত্রে—লইনু আশ্রয়।
কেহ বনকদলীর, কচুব পাতায়
নিবারিছে বৃষ্টিধারা,

নিজের চোখে দেখা প্রকৃতি চিত্রকে কাব্যের মধ্যে প্রকাশ করা এবং বাস্তব চিত্রের প্রতি এই আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কবির সংস্কারাচ্ছন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল এবং সে দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশের স্থানও বড়ো অল্প নয়। 'সায়ং চিন্তা' কবিতায়,

'রজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি সুন্দরী
ললাটে সিন্দুর বিন্দু পরিল তখন,
রবি অস্তমিত প্রায়, সুবর্ণে মণ্ডিত কায়
উজ্জলিয়া গগনের সুনীল প্রাঙ্গণ,
ভাসিতেছে স্থানে স্থানে রক্ত কাদম্বিনী।'

অথবা 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী' কবিতায়,

'প্রভাত গগনে
বিরাজিত সেই স্বর; নির্ঝরিণী জলে
কল্লোলিত; মর্মরিত শ্যাম পত্রদলে।
কুসুম সৌরভ সহ বহিত পবন,
গাইতেন বনদেবী প্রতিধ্বনি ছলে—
কুরঙ্গ ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া শ্রবণ।'

'মেঘনাদবধ কাব্যের' সীতা ও সরমার কথোপকথনের খানিকটা ছায়াপাত এই অংশটির মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। এখানে কবির দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবচিত্রের সাহায্যে প্রকাশিত হয় নি, প্রকৃতির দিকে চোখ মেলে তাকাবার চেষ্টাও ক্ষীণ। সংস্কারের মায়াকাজল কবির স্বাভাবিক দৃষ্টিকে প্রতারিত করেছে।

নবীনচন্দ্রের কাব্যের বহুস্থানে এই সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকাবার চেষ্টা প্রকৃতির মধ্যে মানবত্ব আরোপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। 'পিতৃহীন যুবক' কবিতায় সূর্যোদয়ের বর্ণনা,

'তোমার উদয় দেব! বসুধা কামিনী,
কি সুন্দর বেশে মরি! শোভিছে এখন;
সহস্র তরঙ্গকর প্রসারি তটিনী
তোমাকে প্রণয় ভরে করে আলিঙ্গন।'

'কীর্তিনাশা' কবিতায় নদীর গম্ভীর মন্থর গমনকে কবি মানবত্ব আরোপে সুন্দর করে তুলেছেন,

'আনন্দে যেমতি
বিজয়ী বীরেন্দ্র যায় মৃদুমন্দগতি
উপেক্ষি বিজিত শত্রু, চলেছে তেমতি
উপেক্ষিয়া ভগ্নতীর।'

'রৈবতক'কাব্যে

'সমেঘ পশ্চিমাকাশ রয়েছে চাহিয়া।
উড়িতেছে ঝড়বেগে মুক্তকেশরাশি,—'

এই মানবত্ব আরোপগুলিতে কবিত্বের পরিচয় আছে সন্দেহ নেই। কীর্তিনাশা সগর্ব পদক্ষেপে উপেক্ষমান জয়ী যোদ্ধার সঙ্গে তুলনায় কবিত্বময় গভীর সন্ধান আছে। কিন্তু চিত্রগুলির ব্যবহারে কবি সংস্কারমুক্ত হতে পারেন নি।

বাইরের কোনো দৃশ্য থেকে আপনার অন্তর্লোক অভিসার করার প্রয়াস হেমচন্দ্রে সম্পূর্ণ সফল হয়নি। নবীনচন্দ্রের কাব্যও মোটামুটি সে বিফল প্রয়াসের কাহিনী। অনেক সময় কবি নৈসর্গিক কোনো দৃশ্যের সঙ্গে আপনার মনের ভাব জুড়ে দিয়েছেন মাত্র, অন্তরে অন্তরে তাদের মিলন সাধিত হয় নি। 'সায়ংচিন্তা' কবিতায় কবি 'ডুবাতে দিবসশ্রম বিস্মৃতি সলিলে,' এক গিরিশিখরে উঠে প্রকৃতির শোভা দর্শন করলেন। বর্ণনাটি গতানুগতিক বর্ণনার শেষে একটি রাখাল শিশুকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত করে কবি তাকে উপলক্ষ্য করে নিজের চিন্তাস্রোত প্রাকৃতিক দৃশ্যটির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। নিজের শৈশবের স্মৃতি,

'আমিও ইহার মত ছিলাম সুন্দর
ছিলাম পরম সুখে সুপ্রসন্ন মনে—'

দেশের স্বাধীনতার চিন্তা,

'নাহি জানে নিজেদের অবস্থা কেমন
নহে ভারতের ভাগ্যে বিষন্ন অন্তর।'

ইত্যাদি আরও অনেক চিন্তার স্রোতের অবাধ গতি কাব্যটিতে স্থান পেয়েছে কিন্তু পরিপূর্ণ ভাবে সমন্বিত হয়নি।

নবীনচন্দ্র কিন্তু হেমচন্দ্র থেকে প্রকৃতি বর্ণনায় এক পদ অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর অনেক প্রকৃতি বর্ণনায় দৃশ্য সাজাবার মধ্যে যে নির্বাচন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, সেটি হেমচন্দ্রে অনুপস্থিত। কবির এই নির্বাচন প্রতিভাতে আত্মলীনতার আভাস আছে এবং

প্রকৃত নিসর্গ-কবিতার সূচনা আত্মলীনতাকেই অবলম্বন করেই প্রকাশিত হয়। 'পিতৃহীন যুবক' কবিতায় নিশুতি রাত্রির চিত্র,

'যামিনীর সুমধুর নূপুর নিক্কণ
ঝিল্লিরবে ভাসিতেছে দিগদিগন্তর
পাখার প্রহার শব্দ করিছে কখন
ভগ্ননিদ্র পক্ষীগণ বৃক্ষের উপর।'

এই বর্ণনায় সংস্কারবিহীন দৃষ্টিতে অল্প কটি চিত্রের সাহায্যে অন্ধকার রাত্রির রহস্যময়তার রূপ দেওয়া হয়েছে। দৃশ্য নির্বাচনে কবি-মনের স্পর্শ লেগেছে। অন্যত্র একটি মধ্যাহ্ন বর্ণনায়,

'কেবল বায়সগণ মুদিয়া-নয়ন
কাতরে ডাকিতেছিল তৃষ্ণাভগ্ন স্বরে;
গাভীগণ তরুতলে মুদিয়া নয়ন
রোমন্থ করিতেছিল ক্লান্ত কলেবরে।'

এখানে গোটাকয়েক বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যকে শুধু একত্র জুড়ে দেওয়া হয়নি দৃশ্য সমাবেশের মধ্যে কবির নির্বাচন রুচির পরিচয় আছে। নিজের চোখে প্রকৃতির দিকে না তাকালে প্রথম শ্রেণীর প্রকৃতি বর্ণনা করা সম্ভবপর নয় সত্য কিন্তু চোখ মেলে দেখে কবি প্রকৃতির যেটুকু বর্ণনা করবেন তাই যে প্রকৃতি-কাব্য হয়ে উঠবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কবি যখন সাদা চোখে প্রকৃতির দিকে তাকান তখন প্রকৃতি জড়বস্তুই থেকে যায়, কিন্তু দৃষ্টির বিশেষ একটি অবস্থায় যখন প্রকৃতির দিকে তাকান, তখন প্রকৃতি রসবস্তু হয়ে ওঠে। নবীনচন্দ্রের মধ্যে সে বিশেষ দৃষ্টি কিছু পরিমাণে ছিল। তাই তিনি চোখে দেখা প্রকৃতিচিত্রের পরস্পর বিচ্ছিন্ন খণ্ড অংশগুলিকে বিশেষ রসসৃষ্টির দ্বারা একটি অখণ্ডসুরের সমন্বয়ের মধ্যে আনতে পেরেছিলেন। এই সমন্বয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে।

বিহারীলাল: রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙলা কাব্যের নিসর্গপ্রীতির ধারায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান বিহারীলালের। যে গভীর আত্মলীন দৃষ্টি রবীন্দ্র-কাব্যকে মহিমান্বিত করে রেখেছে তার প্রথম আভাসটি বিহারীলালের কাব্যে অভিব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। বিহারী-

লালের আবির্ভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল।' ভোরের পাখির কণ্ঠ বেজে ওঠে পূর্বাশায় নব আলোকের ঠিক পূর্বে। বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের নানা বৈচিত্র্যময় প্রতিভার আলো বিচ্ছুরিত হবার পূর্বেও তেমনি বিহারীলাল আপন সুরে গান ধরেছিলেন। তাই বিহারীলাল ভোরের পাখি। তিনি বঙ্গসাহিত্যে বা বাঙলার কবিতা রাজ্যে যে কোনো যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন তা নয়, তিনি একটি আগতপ্রায় নবযুগের আভাস দিয়েছিলেন মাত্র। দিবসের শতকর্ম বিজড়িত কোলাহলের মধ্যেও যেমন রসজ্ঞ শ্রোতার চিত্তে প্রভাতের অস্পষ্ট কাকলি মৃদু ঝঙ্কার তুলতে থাকে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ রসজ্ঞ গুণগ্রাহীর কাব্যে বিহারীলালের কবিতার সুরের স্পর্শ স্পষ্টতই রয়ে গিয়েছে।

বিহারীলালেব কাব্যের সর্বপ্রধান নূতনত্ব তাহার গীতি কবিতাসুলভ (lyrical quality) আর্তিতে। অল্প পরিসরের মধ্যে মানুষের রসানুভূতিকে প্রকাশ করাই গীতিকবিতার ধর্ম। বৈষ্ণব কবিতাগুলি মানব হৃদয়ের বৈচিত্র্যময় প্রেমানুভূতির রসঘন প্রকাশ। কাজেই বৈষ্ণব কবিতাগুলি গীতিকবিতা। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার সুর এবং বিহারীলালের কবিতার সুরের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্যের অভিব্যক্তি আধুনিক গীতিকবিতার অন্য একটি বৈশিষ্ট্যে। আধুনিক গীতিকবিতা শুধু মানুষের অন্তরের অনুভূতিরই ভাষা নয়। এটি বিশেষ করে কবির ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ। বৈষ্ণব কবিতায় রাধাকৃষ্ণপ্রেমের রূপককাহিনী এবং অন্যান্য অনেক ধর্মীয় প্রথার গণ্ডি (Conventionality) থাকায় কবিব ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার পথে অনেক অন্তরায় ছিল। মাঝে মাঝে প্রতিভাশালী কবির রচনায় কবির অন্তরের সুদূর স্পর্শ লাভ করেছে বটে কিন্তু সে স্পর্শানুভূতি রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার মধ্য দিয়ে শোধিত আকারে এসেছে। কবি হৃদয়ের সঙ্গে পাঠকের সোজাসুজি কোনো সম্বন্ধ স্থাপিত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীতে, বিহারীলালের আবির্ভাবের পূর্বে

নিধুবাবু, রাম বসু, হরু ঠাকুর, শ্রীধর কথক প্রভৃতি কবিগণ যে গীতিকবিতার ধারায় দেশকে প্লাবিত করেছিলেন তাঁদের সুরুও অকৃত্রিম। কিন্তু সেখানেও কবির অন্তরের স্পর্শ সোজাসুজি পাঠকের কাছে পৌঁছয় না। কবিমনের সহিত পাঠকচিত্তের যে প্রত্যক্ষ অন্তরঙ্গতা, যে সোজাসুজি ভাবের আদান প্রদান তাই আধুনিক গীতিকবিতার মূল উপাদান। বিহারীলালের কাব্যে এই জিনিষটিই আভাসিত হয়ে উঠেছিল এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এরই চরমত্ব। গীতিকবিতাসুলভ আবেদন, কাব্যের মধ্যে কবির ব্যক্তিজীবনের স্পন্দন কবির ছোটো ছোটো আশা আকাঙ্ক্ষার গভীর স্পর্শানুভূতির পরিচয় বিহারী কাব্যেই সর্বপ্রথম স্পষ্ট আকারে লাভ করা যায়। তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের ক্ষেত্রেও এই ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ হয়েছে। 'বঙ্গসুন্দরী' কবিতা কবির অনন্ত বাসনা, কবিমনের অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। কবি কোলাহলময় নগর পরিত্যাগ করে সুদূর নির্জন নামহীন পল্লীতে চাষীদের সংসর্গে শান্তিময় জীবন যাপনের জন্য ব্যাকুল। প্রাকৃতিক আবেষ্টনীব মধ্যে, পশুপক্ষী ইত্যাদির সঙ্গে বাস করবার মধ্যে যে বৈচিত্র্যময় আনন্দ কবির অনুভূতিকেও স্পন্দিত করেছে। বর্ষার ঘোব নিশিতে মেঘে মেঘে আকাশ যখন অন্ধকাব হয়ে আসবে, বিদ্যুৎ ঝলসিত আকাশ গর্জন কববে, সে নিশীথ রাত্রিতে কবি নির্জন-কুটির-বাসের আনন্দও উপলব্ধি করেছেন। শুধু তাই নয়,

'কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে,
যথা হেন গর্জে একবারে
প্রলয়ের মেঘ-সজ্ঘ
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জিয়া বেলারে।'

সেই তরঙ্গ শব্দমুখরিত সমুদ্রবেলায়ও কবি মানস-ভ্রমণ করে এসেছেন। এই কবিতায় ভাবের প্রকাশে কবি আমাদের নিকট যতটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন, পূর্ববর্তী বাঙলা কাব্যে তার পরিচয় নেই। হেমচন্দ্র

এবং নবীনচন্দ্রেরও অবশ্য এরূপ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার বাসনা ছিল কিন্তু সে বাসনার প্রকাশ অতি ক্ষীণ। ধরণীর বৈচিত্র্য উপভোগ করবার এই যে বাসনা সেটা রবীন্দ্রনাথে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে। 'বসুন্ধরা' কবিতা সে বাসনারই সংগীত; 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়ও কবি মনের উচ্ছলতা নির্ঝরের রূপে আপনার প্রকাশ খুঁজেছে,

'আমি শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব।
হেসে খলখল, গেয়ে কলকল
তালে তালে দিব তালি।'

নবীনচন্দ্রের কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনায় আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গির কথা আলোচনা করা হয়েছে। সে আত্মলীনতা প্রকাশিত হয়েছে দৃশ্য বর্ণনায় কবির নির্বাচন-রুচির মধ্য দিয়ে। চোখে দেখা প্রকৃতিচিত্রের সমস্তটাকেই কবি লেখনীতে রূপ দিতে চেষ্টা করেন না, প্রকৃতি থেকে তাঁর সে সময়কার মেজাজের অনুরূপ কয়েকটি দৃশ্য নির্বাচিত করে নেন। বিহারীলালে এই নির্বাচনরুচির পরিচয় স্পষ্ট আকার ধারণ করেছে। 'সারদামঙ্গল' কাব্যে একটি দ্বিপ্রহর বর্ণনা,

'ঠিক বেলা দ্বিপ্রহর।
দিনকর খরতর,
নিঝুম নীরব সব—গিরি তরু লতা।
কপোতীসুদূর বনে
ঘুঘু—ঘু করুণ স্বনে
কাঁদিছে বলিয়া যেন শোকের বারতা।'

অন্যত্র 'শরৎকাল' কাব্যে মধ্যাহ্ন আকাশের রূপ,

'বিমল নীল নিথর শূন্য,
শূন্য,-শূন্য-শূন্য-অগম শূন্য,
দূর-অতিদূর দু পাখা ছড়িযে
শকুন ভাসিয়ে যায়।'

কেবলমাত্র শকুন ভেসে যাবার চিত্রে দ্বিপ্রহরের উদাস দিগন্ত-ব্যাপ্ত অনন্ত আকাশের মূর্তি যেন আমাদের চোখে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

হেমচন্দ্র প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের গভীর অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন,

'হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন—
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি।'

বিহারীলাল শুধু সে অন্তরঙ্গতার সংবাদ দিয়েই নিরস্ত হন নি। তিনি প্রকৃতির প্রেমিকারূপে সাজিয়ে তুলে তার সৌন্দর্যটুকু উপভোগ করবার প্রয়াসা,

'প্রণয় করেছি আমি
প্রকৃতি রমণী সনে
যাহার লাবণ্যচ্ছটা
মোহিত করেছে মনে।'

প্রকৃতি সুন্দরীকে তিনি মানবত্ব আরোপের সাহায্যে অনুভূতিশীল করে তুলেছেন। মানবত্ব আরোপের উপাদানগুলি প্রাচীন হলেও কবির অন্তরঙ্গতা ও ভাবাতিশয্যে সেগুলি সজীব রূপ ধারণ করেছে। মেঘমালায় প্রকৃতি সুন্দরীর কেশ, শ্বেতমেঘরূপ তাহার বসন অঞ্চল, চঞ্চল বাতাসে লীলাভরে উড়িতে থাকে, সমুজ্জ্বল তারকাগণ তাঁর হীরক ভূষণ; শুধু তাই নয়,

'হেলিয়ে স্তবক ভরে
মরি কত লীলা করে,
পয়োধর ভাব ভরে
টলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে।'

পাশ্চাত্য কবি Keats এর ন্যায় প্রকৃতি কবির নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। প্রকৃতির প্রতি কবির ভালবাসাও Keats এর মতই ইন্দ্রিয়ানুগ (passionate)।

কালিদাসের কাব্যের মহাদেবের হৃদয় হরণ করবার জন্য সজ্জিতা পার্বতীর গমনের বর্ণনার সঙ্গে এই অংশের রূপবর্ণনার সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। প্রকৃতিসুন্দরীর শুধু রূপই আছে তা নয়, তিনি সঙ্গীতময়ীও,

'পাখীর ললিত তান
প্রাণপ্রিয়া গায় গান,
উদাস করয়ে প্রাণ
সুধা বরষে শ্রবণে।'

প্রকৃতির সহিত এইরূপ নিবিড় অন্তরঙ্গতা বিহারীলালের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে দুর্লভ।

বাঙলা সাহিত্যে বিহারীলালের সর্বশ্রেষ্ঠ দান রোমান্টিকতা (Romanticism)। আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিকতা (Romanticism) বা মিষ্টিকতায় (Mysticism) আপনাকে প্রকাশ করে। মিষ্টিকতা (Mysticism) এবং রোমান্টিকতা (Romanticism) দুইই বিহারীলালে উপস্থিত। প্রকৃতির প্রতি বিহারীলালের রোমান্টিক (Romantic) দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈচিত্র্যের সন্ধান আছে। কবি প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে একটি রহস্যানুভূতির সন্ধান পেয়েছেন, সমগ্র বিশ্ব-সৌন্দর্যের অন্তরে অধিষ্ঠাত্রী যে সৌন্দর্য-লক্ষ্মী, সেই অজ্ঞাত রহস্যময়ী মূর্তি দূর-দূরান্তর থেকে আভাসে-ইঙ্গিতে কবিচিত্তকে আহ্বান করেছে। কবি তার মধুময় বাণী, তার রূপের আভা, তার একটু স্পর্শসুখ পেয়েই আনন্দে আত্মহারা, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানবার বা কাছে পাবার বাসনা নেই। সারদামঙ্গলের প্রথমেই,

'কে তুমি ত্রিদিব দেবী বিরাজ হৃদি-কমলে!
নধর নগনা লতা মগনা কমলদলে।'

এরূপ বর্ণনা চিররহস্যময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মীরই। অন্যত্র এই রহস্যময়তা আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।—

'ভোরে শুকতারা রাণী
কি যেন দেখায় আমি
বুঝিতে পারি না, শুধু আঁখি ভরি দেখি তায়।'

'সাধের আসনে'র ভিতরেও এই রহস্যময়ী প্রকৃতির তথা সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী-দেবীর আভাস দেখিতে পাওয়া যায়।—

'ধেয়াই কাহারে দেবী! নিজে আমি জানিনে,
কবিগুরু বাল্মিকীর ধ্যান-ধনে চিনিনে।

মধুর মাধুরী-বালা
কি উদার করে খেলা।—
অতি অপরূপ রূপ দেখাইতে পারিনে।'

'শরৎকাল' কাব্যে প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার আভাস পেয়েছেন কিন্তু সে সম্ভাবনার ইঙ্গিত তাঁহার মনে স্পষ্টরূপ লাভ করেনি। প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তাই কবি রহস্যময় (Romantic) আনন্দলাভ করেছেন।

'দূরে দূরে নীল জলে
দু একটি তারা জলে,
আমার মুখের পানে দীপ্ দীপ্ চায়,
ওদের মনের কথা বুঝা নাহি যায়।'

রোমান্টিক (Romantic) তথা আত্মলীন (Subjective) কবিদের ধর্মই এই যে তাঁরা বাইরের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে আপনার অন্তর্লোকে চলে যান। বাইরের প্রকৃতি সেই অন্তর্লোকে একটি স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টি করে। সে-জগতে অপূর্ণতা নেই, আছে পরিপূর্ণ তৃপ্তির অনুভূতি। আপনার অন্তর্লোকের এই জগতের শোভামুগ্ধ কবি যখন আবার বাইরের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দান করেন, তখন বাইরের প্রকৃতির অপূর্ণতা তাঁর চক্ষে প্রকট হয়ে ওঠে। পারিপার্শ্বিক এই জগৎ তখন তাহাকে আর তৃপ্ত করতে পারে না। এই অতৃপ্তিই রোমান্টিক-বিষাদ (Romantic Melancholy)। বিহারীলালের কাব্যে এই বিষাদের সুর ভুল করবার কারণ নেই। সারদামঙ্গল কাব্যে,

'কেন গো ধরণী রাণী
বিরস বদন খানি,
কেন গো বিষণ্ণ তুমি উদার আকাশ,
কেন প্রিয় তরুলতা
ডেকে নাহি কহ কথা,
কেনরে হৃদয় কেন শ্মশান উদাস!'

'শরৎকাল' কাব্যেও এই রোমান্টিক (Romantic) বিষাদের সুর আছে।

'চাহিতে আকাশ পানে
কি যেন বাজিছে প্রাণে—
কাঁদিয়া উঠেছে যেন তারা সমুদয়।'

'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যেও এই রোমানটিক বিষাদের সুরই পরিব্যাপ্ত,

'সেই সূর্য আলো করে রয়েছে ধরণী
সেই সৌদামিনী খেলে নীরদ মালায়,
কল কল কোরে বহে সেই সুরধুনী,
কিন্তু সেই সুখ এরা দেয় না আমায়।'

এই যে রোমানটিক বিষাদের সুর এর মধ্যে পাশ্চাত্য কবির শেলির অনুরণন রয়েছে। শেলির কাব্যে এই রোমানটিক বিষাদ চরমত্ব লাভ করেছিল। শেলীর সৌন্দর্য পিয়াসী চিত্ত আপনার অন্তরে একটি কল্পলোক সৃষ্টি করেছিল। সে আদর্শ কল্পলোকের সঙ্গে তুলনায় বাহ্যিক জগতের অপূর্ণতা শেলীর মনে গভীর বেদনাবোধ জাগিয়েছিল। শেলীর প্রায় সমগ্র কাব্যই সে বেদনার কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই বিষাদের পরিচয় তাঁর কাব্যে অপূর্বতা দিয়েছে। প্রকৃতি অথবা প্রেমাস্পদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রোমানটিক তৃপ্তি খুঁজে না পেয়ে মাঝে মাঝে এই জগৎ এবং জীবনকে অতিক্রম করে পূর্ববর্তী জীবনে তার সন্ধান করেছেন।

'তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনী দিন
যুগ যুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র ফুল ফল গন্ধ রেণু।'

অথবা

'আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে,
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।'

বিহারীলালের প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিতে এই বহুবর্ষের এবং বহু জীবনের অন্তরঙ্গতার কাহিনী নেই। কিন্তু 'ঘুমন্ত প্রিয়ার দিকে তাকিয়ে শরৎকালের একটি সুন্দর রজনীতে তাঁর মনে হয়েছে।—

সদাই দেখিরে ভাই
তবু যেন দেখি নাই,
যেন পূর্ব জন্মকথা জাগে মনে মনে।'

রোমানটিক দৃষ্টিভঙ্গির আনন্দময় রহস্যময়তা যখন কবি-মনের একটি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সংযুক্ত হয় তখনই রোমানটিক রাজ্য থেকে কবি মিস্টিক রাজ্যে প্রবেশ করেন। রোমানটিক দৃষ্টিতে প্রকৃতির যে ইঙ্গিতগুলির প্রকাশ ছিল অস্পষ্ট, আবছা—মিস্টিক দৃষ্টিতে সে ইঙ্গিতগুলিই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তরালে এক বিরাট সত্তার সন্ধান দেয়। রোমান্টিক দৃষ্টির অজ্ঞাত রহস্যময়তা থেকে কবি তখন অসীমের দিকে অভিসার করেন। বিহারীলালও রোমানটিক জগৎ থেকে প্রায়ই মিস্টিক জগতে অভিসার করেছেন। সমস্ত সৌন্দর্যের অন্তরে অধিষ্ঠিতা সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সুদূব রূপের আভাস দেখেই তিনি শুধু মুগ্ধ হননি, জগতের সমস্ত সৌন্দর্য প্রকাশের পশ্চাতে সেই সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর স্পর্শের সন্ধান পেয়েছেন।

'যেন তাঁরে হেরি হেরি
শূণ্যে শূণ্যে ঘেরি ঘেরি
রূপসী চাঁদের মালা ঘুরিয়া বেড়ায়;
চরণ কমল তলে
নীল নভ নীল জলে
কাঞ্চন কমল রাজি ফুটে শোভা পায়।'

অন্যত্র

'কবিতার জন্ম হয় তোমার কিরণে
ফুটে ওঠে বসন্তের ফল ফুল বনে।'

এই সৌন্দর্যলক্ষ্মী বা সারদা শুধু প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী নন। প্রেয়সী নারীর সৌন্দর্য এবং মাধুর্যে, শিশু-মুখে হাস্যোজ্জ্বল সরলতায়—সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির অন্তঃস্থলে এরই লীলাময় রূপের প্রকাশ। Wordsworth এর কাব্যের প্রকৃতির পশ্চাতে অসীম সত্তার ন্যায় ইনি কেবল কল্যাণময়ীই নন; ইনি সৌন্দর্যরূপে আমাদিগকে মুগ্ধ করেন, প্রেমরূপে আমাদিগকে পবিত্র করেন, মঙ্গলরূপে আমাদিগকে বিধৃত করেন এবং জ্ঞানরূপে আমাদের হৃদয়কে উদ্‌ভাসিত করেন। এই সারদা বা সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর পদপ্রান্ত থেকেই কবির সমস্ত গভীর রসানুভূতির উৎস।

নিসর্গ বর্ণনায় সরসতা (freshness) রোমানটিক কবিদের একটা বিশেষ লক্ষণ। গতানুগতিক বর্ণনার চিবাচরিত সংস্কার ছেড়ে তাহারা একটি নূতন দৃষ্টিতে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করতে চেষ্টা করেন। সে দৃষ্টির পশ্চাতে একটা মেজাজ (Mood) হয়তো চিত্রগুলি সব সময় ঠিক বাস্তব হয়ে উঠে না, রোমান্টিক কবিসুলভ একটা অস্পষ্ট কুহেলিকা হয়তো তাদের দেহে লগ্ন হয়ে থাকে, কিন্তু চিত্রগুলি সর্বদাই সরস, সংস্করাচ্ছন্ন দৃষ্টি তাদের প্রতারিত করতে পারে না। বিহারীলালের কাব্যেও এইরূপ সরস নিসর্গচিত্র আছে। 'শরৎকাল' কাব্যে,

'নৌকায় প্রদীপ জ্বলে
তাবকা ফুটেছে জলে
জলতলে ঝলমলে বিশাল মশাল।'

অথবা 'নিসর্গসন্দর্শন' কাব্যে,

'অসংখ্য অসংখ্য তারা চোখের উপর,
প্রান্তরে খদ্যোত যেন জলে দলে দলে;
স্থানে স্থানে দীপ্তি দেয় নক্ষত্র-নিকর
কতস্থানে কত মেঘ কত ভাবে চলে।'

এই বর্ণনাগুলির মধ্যে চিরাচরিত রীতির অনুসরণ নেই। বিশেষ করে দ্বিতীয় বর্ণনাটিতে রোমান্টিক কবিসুলভ একটি রহস্যময়তার আভাস আছে। 'শরৎকাল" কাব্যে।

'বাতাসে তরুর তলে খেলা করে ছায়া'

অথবা,

'স্বপনে সাঁঝের তারা মেলিছে নয়ান।'

ইত্যাদি বর্ণনাগুলিও কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক এবং সরস প্রকাশ ভঙ্গিতে সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের মতো ছায়াকে মঞ্জীর বাজাতে না পারলেও, বিহারীলালের তরুতলে ছায়ার খেলা সার্থক হয়ে উঠেছে। তারকার স্বপনে নয়ন মেলাতে রহস্যময়তা পরিবৃত হয়ে আছে। 'সারদামঙ্গল' কাব্যে হিমালয়ের বর্ণনাটি অনবদ্য।—

'অসীম নীরদ নয়,
ঐ গিরি হিমালয়।
উথুলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি,
ব্যেপে দিগ দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গণ জাগে নিরবধি।'

এই বর্ণনায় হিমালয়েব বিবাটত্ব এবং রহস্যময় স্থিতিব পরিচয় আছে। রবান্দ্রনাথের,

'হে গিরি যৌবনে তব যে দুর্দাম অগ্নিতাপ বেগে,
আপনারে উৎসারিয়া মারিতে চাহিয়াছিলে মেঘে'

ইত্যাদি বর্ণনার সঙ্গে এই অংশটির বর্ণনা বৈশদ্য (details)-এর প্রচুর সাদৃশ্য আছে। হিমালয়ের বিরাটত্ব বর্ণনা এইস্থানেই শেষ হয়ে যায় নি।

'ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে
বুকে খেলা করে ধেয়ে।'

যে ঝটিকার প্রচণ্ড বিক্রমে সমস্ত প্রকৃতি সন্ত্রস্ত, হিমালয়ের বক্ষে তার উদ্দাম পদচারনা স্নেহময় পিতার অঙ্কে চঞ্চলা কন্যার দুরন্তপনারই মতো। কালিদাসসুলভ ব্যঞ্জনার দ্বারা এই অংশটিতে হিমালয়ের বিবাট্‌রূপ অঙ্কিত হয়েছে। তারপর,

'ওই মেরু উপহাসি
অনন্ত বরফ রাশি
যুবন তপন করে ঝকঝক করে।'

কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যে হিমালয় বর্ণনার,

'রাশিভূত প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ'

ইত্যাদির সহিত এই বর্ণনার তুলনা চলতে পারে।

দৃষ্টিভঙ্গির এই নূতনত্ব এবং বর্ণনার এই সরসতা সত্ত্বেও বিহারীলালের কতগুলি দোষ প্রধান হয়ে উঠে তার কাব্য গৌরবকে স্থানে স্থানে প্রভূত পরিমানে খর্ব করে দিয়েছে। তার কাব্যে শ্রেষ্ঠ উপাদানের সহিত নিকৃষ্ট উপাদানগুলি এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে যে, অনেক সময় তাঁহার কবিপ্রতিভার প্রতি সন্দেহ পোষণ করতে হয়। অনেক আবর্জনা, অনেক অবান্তর উপাদান বাদ দিয়ে তবে তাঁহার কাব্য আস্বাদন করতে হয়, নতুবা কাব্যরসের অপচয় ঘটে। একটা বিশেষ মেজাজ (mood) নিয়ে বিহারীলাল মাঝে মাঝে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বহুস্থানে এই মেজাজের ক্ষীণতম পরিচয়ও অনুপস্থিত। 'সমুদ্রদর্শন' কবিতায়,

'আগুপাছু কোটি কোটি কি কল্লোল মালা!
প্রকাণ্ড পর্বত সব যেন ছুটে আসে;
উঃ কি প্রচণ্ড রব! কানে লাগে তালা
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে।'

এই বর্ণনায় কবির চোখ এবং কানের যে পরিচয় রয়েছে, সমুদ্রের পরিচয় সে তুলনায় ক্ষীণ। সমুদ্রের প্রতি কবি চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন সত্য কিন্তু বিশেষ মেজাজের অভাবে বর্ণিত দৃশ্যগুলি একটি অখণ্ড সংগীতে বেজে ওঠেনি। অনুরূপ বর্ণনা বিহারীলালের কাব্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে। স্থানে স্থানে এই মেজাজের অভাবকে কবি শব্দবিন্যাসের সাহায্যে ঢেকে দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। একটি বর্ষাবর্ণনার উদাহরণ,

'ধক ধক দিকে বিদ্যুতের ঝলা,
কক্কড় অশনির ভীষণ গর্জন,
মম্মড় ভেঙ্গে পড়ে লক্ষবৃক্ষ—রলা,
ছটাচ্ছট বৃষ্টি শিলা বাঁটুল-বর্ষণ।

এই বর্ণনায় ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির ব্যবহারে ভারতচন্দ্র সুলভ ব্যঞ্জনা নেই, আছে ঈশ্বরগুপ্ত সুলভ আতিশয্য। বর্ণনার সরসতার সঙ্গে এই আতিশয্য মিশে থাকাতে কাব্যগৌরব অনেক স্থলে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

গম্ভীর ভাব ধারা থেকে আকস্মিক পতনের উদাহরণ বিহারী-লালের কাব্যে অজস্র। হিমালয়েব বিরাটত্ব বর্ণনার সাহায্যে বিহারীলাল কি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই বর্ণনারই একস্থানে,

'মধ্যেমে ফোয়ারা ছোটে
যেন ধূমকেতু উঠে,
ফরফর তুপুড়ি ফোটে, ফেটে পড়ে ফুল।'

তুপড়ির সহিত ফোয়ারার যত সাদৃশ্যই থাক, ইহাব সহিত তুলনায় বর্ণনার গাম্ভীর্য নষ্ট হয়েছে। 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যে সমুদ্রের প্রতি করির উক্তি,

'আপনার মনে ওহে উদার সাগর
গডায়ে গডায়ে তুমি চলেছ সদাই।

ইংবেজী Rolling Sea এর অনুকবণে সাগবেব গড়ায়ে গড়ায়ে চলার এই বর্ণনা উদার সাগরকে হাস্যাস্পদ কবে তুলেছে। স্থানে স্থানে উপমা ব্যবহারেও কবি অকবিত্বেব পবাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। 'সমুদ্রদর্শন' কবিতায়

'তুলাব বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি
তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায়'

তুলার সহিত ফেনরাশিব সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সাদৃশ্যের প্রকাশভঙ্গি অনুরূপ হওয়া উচিত ছিল। তুলার বস্তা গুদাম থেকে স্থানচ্যুত হয়ে কবিতার স্কন্ধে ভর করলে কবিতার কাব্যরস বিসর্জন দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

দোষে গুণে মিলিয়ে বিহারালালের কাব্য বাঙলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। প্রাচীন সংস্কারকে প্রথম আঘাত করে ছিলেন ঈশ্বরগুপ্ত, কিন্তু নূতন কিছু গড়বার তাঁর ছিল না।

মধুসূদনের কাব্যে প্রকৃতি প্রেমের দিক থেকে নূতন কিছু তৈরি করার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রও স্পষ্টরূপে নূতনত্বের ইঙ্গিত দিতে পারেন নি। এই ইঙ্গিতের বাণী বহন করে বিহারীলাল বাঙলার কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সূক্ষ্ম বিচারে বাঙলা কাব্যে নূতনত্বের স্রষ্টা হিসাবে তাঁকে সম্মান না দিলেও, সৃষ্টির ইঙ্গিত যে তাঁর কাব্যে ছিল এ গৌরব তাঁর প্রাপ্য। সে ইঙ্গিতকে পরিপূর্ণ সফলতায় প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন ছিল।

উপসংহার

প্রকৃতিপ্রেমের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাপ্তি অসীম আকাশের মতোই। যতই এর শেষ খুঁজতে যাই ততই এর অসীমত্বের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটে। ভারতীয় সাহিত্যে প্রকৃতিপ্রেমের যে ধারাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকে বাঙলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের যে-ছায়াপাত ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এইএই দুয়েরই সমন্বয় বৈচিত্র্যমুখর হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র কাব্যের প্রকৃতি প্রেমের বিচিত্র রূপের পরিপূর্ণ সন্ধান দেওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। তাই এই বৈচিত্র্যগুলির ইঙ্গিত মাত্র করেই এ-নিবন্ধ সমাপ্ত হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রেমের পরিপূর্ণ পরিচয় স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়বস্তু।

রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব কাব্যের ধারাবাহিকতা, তাঁর রচনাগুলি বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্রবিহীন নয়। তাঁব কাব্য একটি সুসঙ্গত ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছে। প্রকৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতেও এই ধারাবাহিকতা এবং ক্রমবিকাশেরই একটি অখণ্ড ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে।

'সন্ধ্যাসংগীত'থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের প্রকৃত সূত্রপাত। এর পূর্বের শিশু রচনাগুলিকে কবি স্বয়ং আপনার কবি জীবনের ইতিহাস থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর কবিতা-গুলিতে একটা বিষাদের সুর পরিব্যাপ্ত। মৃত্যুর মধ্যে জীবনের পরিসমাপ্তি কবিকে ব্যথিত করেছে—জগৎ এবং জীবনকে তাই কবি পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করতে পারছেন না। কিন্তু ব্যাকুল হয়ে প্রকৃতির অন্তরস্থিত মাধুর্যময় অস্তিত্বটির অনুসন্ধান করেছেন।

'প্রভাতের হাসি রাশির মাঝারে আমি কেন থাকিতে না পাই!'

গাছ পাতা গিরিনদীর প্রতি কবি প্রণয়ের আকর্ষণ অনুভব করেছেন কিন্তু মৃত্যুভয় সে অনুভবের উপলব্ধিতে বাদ সেধেছে,

'শুধু মনে জাগে এই ভয়,
আবার হারাতে পাছে হয়।'

এই অতৃপ্তির বেদনা এবং নৈরাশ্যের কাহিনীতেই 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর পরিসমাপ্তি। 'প্রভাতসংগীতে' কবি মৃত্যুর একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন—তার বিষাদে ঢাকা হৃদয় যেন 'কেমনে গেলগো খুলি'। যে প্রকৃতিকে কবি উপভোগ করবার চেষ্টায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, তারই অন্তঃপুরের দিকে অভিসারের জন্য কবির ঔৎসুক্য জন্মেছে। প্রভাত উৎসবেব মধ্যে মেঘ ও বায়ু তাঁকে পথ দেখাচ্ছে। মেঘকে কবি আকাশ পাবাবারে নিয়ে যেতে বলছেন, বায়ুকে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে দেবাব জন্য কবির মিনতি, প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করবার সুখে তিনি জীবনকেও ছেড়ে যেতে প্রস্তুত,

'অনুমাত্র জীব আমি,—
কণামাত্র ঠাঁই ছেড়ে যেতে চাই
চরাচরময়।'

'সন্ধ্যাসংগীত'এ কবির নিকট মৃত্যু ছিল জীবন নাট্যের শেষ যবনিকা, 'প্রভাত সংগীত'এ কবি আবিষ্কাব করলেন মৃত্যু অনন্ত জীবন নাট্যের মধ্যবর্তী দৃশ্য-পরিবর্তন মাত্র। কবির মৃত্যুভয়গ্রস্ত চিত্ত তাই অনেকাংশে ভারহীন হয়ে গেল। কবির মনে আর গভীর কিছু প্রত্যাশা যেন নেই। প্রভাত সংগীতের পর 'ছবি ও গান' কাব্যে কবি কেবল চোখ দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য পান করে গিয়েছেন। কোনো দার্শনিক চিন্তা তার এ উপভোগেব পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। কবি প্রকৃতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন, সেখানে 'অমিয় মাধুরী মাখি' প্রকৃতির 'চেয়ে আছে দুটি আঁখি'। নিরুদ্বেগে বসে কবি তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য পান করে নিয়েছেন। কখনও অলস মধ্যাহ্নে,

'ঝিকি মিকি বেলা
গাছের ছায়া কাঁপে জলে,
সোনার কিরণ কবে খেলা!'

কখনও বা,

নীল আকাশেতে নারিকেল তরু
ধীরে ধীরে পাতা নড়ে,
প্রভাত আলোতে কুড়ে ঘর গুলি
জলে ঢেউগুলি উঠে পড়ে।'

প্রকৃতির ছোটো-খাটো দৃশ্যাদিও কবিকে রূপমুগ্ধ করে রেখেছে।

'ছবি ও গান' এর মধ্যে কবিকে আমরা প্রথম বহিঃপ্রকৃতির দিকে সচেতনভাবে দৃষ্টিপাত করতে দেখি। প্রথম দৃষ্টির রূপ মুগ্ধতা কবির চক্ষে সমস্তই আনন্দময় করে তুলেছিল। 'কড়ি ও কোমল'-কাব্যে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে কবি মানবজীবনের প্রতিও সচেতন দৃষ্টিপাত করলেন। শুধু প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দুঃখবোধকে অস্বীকার করলেও চলতে পারে কিন্তু মানবজীবনের প্রতি তাকিয়ে 'সন্ধ্যা-সংগীত'-এর মৃত্যু এবং মানবজীবনেব সীমাবদ্ধতার দুঃখ আবার কবিকে পেয়ে বসল। 'কড়ি ও কোমল'-কাব্যে এই দুটি ধারা পাশাপাশি চলেছে—একটি প্রকৃতির পরিপূর্ণ জাবন রহস্য উপভোগ কববার জন্য কবির ব্যাকুলতা, অন্যটি এই উপভোগের অস্থায়িত্ব এবং সীমাবদ্ধতার দুঃখ। তাই একদিকে যেমন কবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গেয়েছেন,

'আমার যৌবন স্বপ্নে যেন ছেয়ে গেছে
বিশ্বের আকাশ।
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসাব
পরশেব মতো।'

তেমনই আবার এই উপভোগের ক্ষণস্থায়িত্ব কবির ভাষায় এনে দিয়েছে বিষাদের সুব,

'এ মোহ কদিন থাকে, এমায়া মিলায়।'
কিছুতে পারেনা আর বাঁধিয়া রাখিতে।'

অন্যত্র প্রকৃতির মাধুর্য উপভোগ করতে গিয়ে কবি শুধু বেদনার উপহার নিয়ে ফিরে এসেছেন।

'নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া!
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।'

'সন্ধ্যাসংগীত'এর বিষাদ এবং 'প্রভাতসংগীত'এর আনন্দের অনুভূতি, এই দুয়ের সংমিশ্রণে 'কড়ি ও কোমল'এর পরিসমাপ্তি।

'কড়ি ও কোমলে'র পর 'মানসী'।

সৃষ্টির ক্ষণস্থায়িত্ব প্রকৃতির প্রতি কবির মনে অনাস্থা এনে দিয়েছিল, 'মানসী' কাব্যে তাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে কবির বিক্ষোভ ফেনায়িত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির কঠিন নিয়মকে তাই তিনি তিরস্কার করেছেন। 'আমরা কাঁদিয়া মরি, এ কেমন রীতি' অথবা 'পাশাপাশি এক ঠাঁই, দয়া আছে দয়া নাই।'—ইত্যাদি উক্তি প্রকৃতির বিরুদ্ধে কবির অভিযোগের তীব্র প্রকাশভঙ্গি। 'মানসী'র দুএকটি কবিতায় কবি প্রকৃতির মাতৃত্বও লক্ষ্য করেছেন এবং এই মাতৃত্বময়ী প্রকৃতি সজীব হয়ে উঠেছে 'সোনার তরী' কাব্যে।

'সোনার তরী'তে কবি প্রকৃতির কঠিন নিয়মের পরিবর্তে প্রকৃতি-জননীর ব্যথাটুকু লক্ষ্য করেছেন, সে তো নিষ্ঠুরা নয়, সে অক্ষমা, দরিদ্রা। মানবের অনন্ত ক্ষুধা অগাধ বাসনা পরিতৃপ্ত করতে না পেরে সে নিজেই ব্যথিতা। 'মানসী'র 'অহল্যার প্রতি' এবং 'সোনার তরী'র 'যেতে নাহি দিব', 'বসুন্ধরা' ইত্যাদি কবিতাতে প্রকৃতির এই মাতৃভাব অঙ্কনের প্রয়াস পরিস্ফুট। 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'র মধ্যে কবি স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে আলাদা করে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন। সৃষ্টির অনন্ত রহস্যময় সংগীত তাই তাঁর কানে বেসুরো বেজেছিল। 'সোনার তরী' কাব্যে যেন কবির এইভুল ভেঙে গেল। আজ স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, সীমাবদ্ধ প্রকৃতি এবং অসীম, কবির নিকট যেন একই সুরে বেজে উঠল। প্রকৃতি চিরচঞ্চল স্থিতির মধ্যে কবি এক বিরাট্ সত্তার নৃত্যচ্ছন্দ শুনতে পেলেন। প্রকৃতি তাই তাঁর কাছে নূতন অর্থ বহন করে নিয়ে এল। কবি যেন সৃষ্টিকে নূতন রূপে ভালোবাসলেন। 'সমুদ্রের প্রতি' 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতায়

এই উচ্ছ্বসিত দরদ এবং ভালবাসার আকাঙ্ক্ষার আনন্দময় সুর পরিব্যাপ্ত,

'প্রভাত রৌদ্রের মত অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের পরে
করি নৃত্য সারা বেলা করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুম কলি, করি আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি,
প্রত্যেক তরঙ্গ পরে সারাদিন দুলি
আনন্দ দোলায়।'

'সোনারতরী'র পর 'চিত্রা'-কাব্যে কবি নিরুদ্বেগে, নিশ্চিন্ত মনে প্রকৃতির সৌন্দর্য সুধা আকণ্ঠ পান করেছেন। সৃষ্টি সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন কবি হৃদয়ের পরিপূর্ণ উপলব্ধিকে সাহায্য করেছে,

'আজি মেঘ মুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো। সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায় ;

'চিত্রা'তে কবির প্রকৃতিকে অনুভবের মধ্যে একটু আধটু চিন্তাশীলতা যদিও বা থাকে 'চৈতালি' কাব্যে তাও বিলুপ্ত হয়েছে। প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র বস্তুগুলিও কবির সৌন্দর্যপিপাসু দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি।—

'বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতহীন। অর্ধমগ্ন তরীপরে
মাছরাঙ্গা বসি, তীরে গরু চরে
শস্যহীন মাঠে।'

'চৈতালি'র পর 'কাহিনী', 'কল্পনা', 'কথা', 'ক্ষণিকা' এবং 'কণিকা'। এই কটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সৃষ্টি এবং মানবজীবনের

প্রতি কবির অখণ্ড ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রকাশিত—প্রকৃতির প্রতি বিশেষ কোনো নূতন দৃষ্টি এই কাব্য গ্রন্থগুলিকে অভিষিক্ত করে নি।

রবীন্দ্রনাথের মনে চিরকালই একটি দার্শনিক বাস করেছেন- এই দার্শনিকটি কবির জীবনে কোনো উপলব্ধিকে একঘেয়ে হয়ে উঠতে দেয়নি। 'সোনার তরী'তে স্রষ্টার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ আবিষ্কার করার পর কবি এতদিন কেবল প্রকৃতির নিছক সৌন্দর্যই উপভোগ করে এসেছেন। কবির দার্শনিক মন হঠাৎ যেন আপত্তি তুলল। প্রকৃতির মাধুর্য যদি এতখানি জায়গা জুড়ে বসে তবে স্রষ্টা যে চাপা পড়ে যান। সুতরাং প্রকৃতির সহিত স্রষ্টাকেও উপলব্ধি করতে হবে। তাই 'নৈবেদ্য' কাব্যে কবির উক্তি,

'জ্যোৎস্নাসুপ্ত নিশীথের নিস্তব্ধ প্রহরে
আনন্দে বিষাদে গাঁথা ছায়ালোক পরে
বস তুমি মাঝখানে!'

'নৈবেদ্য'র পর 'খেয়া' কাব্যে কবি এই বিশ্বপ্রকৃতিব নীড় ছেড়ে যেন মুক্ত আকাশে উধাও হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। এই মুক্ত আকাশ বিচরণের ফলে 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' এবং 'গীতালি' কাব্যে কবি ঐশিকতা (divinity)র সন্ধানে মগ্ন। প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ এখানে গৌণ, মানবের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ, দুঃখ প্রকৃতিতে আরোপ করাব চেষ্টা নেই। প্রকৃতির বৈচিত্র্য সেই লীলাময়েরই লীলামাত্র। প্রকৃতি কখনও ইঙ্গিতে লীলাময়কে ইঙ্গিতে দেখিয়েছে, কখনও আঘাত দিয়ে প্রবুদ্ধ করেছে, কখনও বা কবির উপাস্যকে পূজার ডালি সাজিয়ে দিয়েছে। লীলাময়ের প্রেম বিনা প্রকৃতির সমস্ত মাধুর্য কবির নিকট অর্থহীন মনে হয়েছে,

'যদি প্রেম দিলেনা প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে
এমন গানে গানে।'
কেন তারার মালা গাঁথা
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিণ হাওয়া গোপন কথা

জানায় কানে কানে ;
যদি প্রেম দিলেনা প্রাণে।'

ইন্দ্রিয়গত দৃষ্টি উপসংহত হয়ে কবির অতান্দ্রিয় দৃষ্টি চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। শ্রাবণ রজনী বর্ষণমুখর মাধুর্য দিয়ে এখন আর কবিতে মুগ্ধ করে না, শ্রাবণ দিনের সমস্ত আনন্দ এখন কবির হৃদয় দুয়ারে জীবননাথের পদধ্বনিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে।

'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরবে নাথ
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।'

'খেয়া' হইতে কবি রূপজগতের নিকট থেকে বিদায় নিয়েছেন। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' এবং 'গীতালি'তে রূপজগতের চিহ্ন অত্যন্ত ক্ষীণ, সেটি যেন শুধু ঐশী অনুভূতির পটভূমি। এরপর 'বলাকা' কাব্যে কবি আবার একটু একটু করে রূপ জগতে ফিরে এসেছেন, কিন্তু অরূপের দেশে এতকাল বাস করার ফলে রূপ জগত আর তাঁকে ঠিক পূর্বের মত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের প্রত্যক্ষ অনুভূতি দিয়ে মুগ্ধ করছে না। সমস্ত প্রকৃতি তথা সমস্ত সৃষ্টির মূলে কবি একটা গতিশীলতার সন্ধান পেয়েছেন। বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বমানব প্রচণ্ড গতির আবেগে আত্মীয়তা অনুভব করেছে।

বহুদিন অরূপের রাজ্যে বাস করে কবি যখন 'পূরবী'তে আবার পৃথিবীর মাটিতে নেমে এলেন তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে এই রূপজগতে বাস করবার দিন তাঁহার সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। প্রকৃতিকে তিনি একদিন ভালোবেসেছিলেন কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে বহুদিন প্রবাসের ফলে কবির অনুভবের ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল হয়ে এসেছে। প্রকৃতির অসংখ্য স্নেহস্মৃতি এই বিদায়ক্ষণে কবির মনে বেদনা জাগিয়ে তুলেছে,

'ইসারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে,
কখনও আমার নবমুকুলের বেশে,

কভু নব মেঘভারে
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে।'

প্রকৃতিকে নূতন করে উপলব্ধি করবার জন্য কবির অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁরে ব্যথাতুর করে তুলেছে। প্রকৃতির সমস্ত উপলব্ধির স্মৃতি কবিকে আবার গত জীবনের লীলাক্ষেত্রে আহ্বান করেছে কিন্তু আর যে সময় নেই,—

'দেখ নাকি হায় বেলা চলে যায়
সারা হয়ে এলো দিন,
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিনীর বীণ।
এতদিন আমি ছিনু হেথা পরবাসা
হারায়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি
আজি সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়
সারা হয়ে এলো দিন।'

এই বিষাদময় অনুভব এবং আকাঙ্ক্ষার কারুণ্যই রবীন্দ্রকাব্যের নিসর্গপ্রীতির ধারায় একপ্রকার পরিসমাপ্তির রেখা টেনে দিয়েছে। এর পর রবীন্দ্র কাব্যের প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় দেখা যায় বা বর্ষাশেষে শরৎ আকাশের বিচ্ছিন্ন বর্ষণের মতই—বর্ষার ধারাবাহিক বর্ষণের সহিত এর আপাত অনিবার্য কোনো যোগসূত্র নেই। কিন্তু অনুভূতির গভীরতায়, পূর্ণতর অনুভবের আকাঙ্ক্ষায় কবির শেষ জীবনের কাব্যগুলি মন্ত্রের মতো প্রকাশিত হয়েছে, সমস্ত জীবনের প্রকৃতি প্রেমের সৌগন্ধও তার মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে।

ঋতুবর্ণনায় রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্র্য বর্ণনাবহুল কালিদাসের সহিত তুলনীয়। তবে কালিদাসের অধিকাংশ ঋতুবর্ণনা বর্ণবহুল (decorative) কেবলমাত্র বর্ষাবর্ণনায় গভীর অনুভূতির স্পর্শ লেগেছে। রবীন্দ্র

নাথের বর্ণনা সর্বত্রই অনুভূতিপ্রধান। গ্রীষ্মের রুদ্ররূপ, বর্ষার স্নিগ্ধ সজল মূর্তি, শরতের মমতাময়ী শ্যামলিমা, হেমন্তের অবগুণ্ঠিত সৌন্দর্য, শীতের জরাজীর্ণ সুষমা, বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপ সমস্তই রবীন্দ্রকাব্যে কবিত্বের অনবদ্য স্পর্শ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত শান্ত রসেরই কবি। তাই ঋতুবর্ণনায় প্রকৃতির রুদ্র রূপের পরিচয় তাঁহার কাব্যে বেশি নেই। 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় প্রথমাংশে বর্ষার ভৈরব রূপ অঙ্কনের চেষ্টা লক্ষ্যণীয়,

'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে,
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।'

কিন্তু পরবর্তী কলিতে কবির আহ্বান,

'কোথা তোরা অয়ি, তরুণী পথিক ললনা,
জনপদ বধূ কিঙ্কিনী কল-কলনা।
মালতী মালিনী কোথা প্রিয় পরিচারিকা
কোথা তোরা অভিসারিকা।'

তরল শব্দ ঝংকারে বর্ষার ভৈরব রূপের স্মৃতি পাঠকের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যায়—বর্ষার নৃত্য-উচ্ছল চঞ্চল রূপটিই মনকে অধিকার করে বসে। সে নৃত্য-চঞ্চলতাও ক্রমে গভীর অনুভূতিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। বৈশাখের রুদ্ররূপের পরিচয় দিয়েও কবি বেশিক্ষণ তাকে উপভোগ করতে পারেন নি। শান্তরস-প্রধান কবিকে তাই রুদ্র বৈশাখের যজ্ঞানলকে শান্তিজলে নির্বাপিত করে দেবার জন্য আহ্বান করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শান্তরসের সাধক বলেই বোধহয় তাঁর কাব্যে বর্ষাঋতুরই প্রাধান্য—আয়তন এবং ভাব গভীরতা উভয় দিক থেকেই। সাময়িক উৎফুল্লতা এবং উদ্দামতা শান্তরসের পরিপন্থী, তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বর্ষাঋতুকেই বেশি করে আশ্রয় করেছে। বর্ষার করুণ সুর হয় তাঁর মনে একটা অতীত স্মৃতি, না হয় একটা বিরহব্যথা জাগিয়ে তুলেছে।

'মেঘের খেলা দেখ কত খেলা পড়ে মনে
কত দিনের কত খেলা কত ঘরের কোণে।'

অথবা,

'মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে।'

বর্ষার নীরব অলস-ক্ষণগুলিতে একটা অজানা বেদনা হৃদয়কে বারবার মথিত করে তোলে প্রাণের অকথিক বাণীটি যেন অভিসারে বের হয়ে যেতে চায়,

'এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।'

হৃদয়ের দ্বারে পরাণসখার অভিসার রজনীও বর্ষণমুখর, এমনি করেই রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমগ্র কাব্য জীবনের উপর বর্ষা প্রভাব বিস্তার করেছে।

'আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা, বন্ধু হে আমার।'

অথবা

'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরবে নাথ
সবার দৃষ্টি এড়ায়ে এলে।'

রবীন্দ্রনাথের বসন্তের কাব্যগুলিও অনবদ্য। "পূরবী" কাব্যে রূপজগতে প্রত্যাবর্তনের যে কথা বলা হয়েছে, সেও বসন্ত ঋতুকে অবলম্বন করেই। "বসন্ত"কে কবি নবযৌবনের ঋতুরূপে অঙ্কিত করেছেন। "বসন্ত"কে নিয়ে কবির বহু নাটক, গীতিনাট্য আছে। বর্ষাকে নিয়েও আছে। উভয় ক্ষেত্রেই ঋতু দুটির অন্তর্নিহিত রূপ এবং কবির কাব্য ধারায় তাদের প্রভাবের কথা আছে।

রবীন্দ্রকাব্যে শরৎ-ঋতুর একটি নূতন রূপ প্রকাশিত। তার কারণ বোধহয় শরৎ রৌদ্রের অবসাদময় আমেজটিতে শান্তরসেরই পরিপোষক। শরতের প্রভাত বেলা তাই কবির মনকে এক অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল করে তোলে;

'আজি শরৎ তপনে প্রভাত কিরণে
কি জানি পরাণ কাহারে চায়।'

শরৎঋতুকে কবি উদাসী সন্ন্যাসীর রূপ দিয়েছেন। পৃথিবীর সৌন্দর্যের ঋণশোধে যেন এই ঋতু তপস্যায় রত। শারদোৎসব এবং পরিবর্তিত রূপ "ঋণ-শোধ" নাটকে কবি একথাটিই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। প্রকৃতি প্রতি ভালবাসার গভীরতায় রবীন্দ্রনাথ হয়তো জগতের সমস্ত কবি থেকেই শ্রেষ্ঠ। তার ভালবাসার গভীরতা পূর্ববর্তী বিহারীলালের চেয়ে অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাশ্চাত্য কবি Keats-এর মতো প্রকৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে,

'আমার যৌবন স্বপ্নে ছেয়ে গেছে
বিশ্বের আকাশ,
ফুলগুলি গায় এসে পড়ে
রূপসীর পরশের মতো '

পাশ্চাত্য কবি Shellyর প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গতাও অত্যন্ত গভীর। Ode to West Wind কবিতায় কবির ঝড়ের নিকট আবেদন, অরণ্যের মতো আমাকেও তোমার বীণা (lyre) করে নাও। গীতিকবিতাসুলভ আর্তিতে এই আবেদনটি মধুর হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির হাতের বাদনযন্ত্র হয়ে কবি প্রকৃতির সহিত একাত্মতা অনুভব করবার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এরূপ আবেদন প্রচুর।

কিন্তু একটি কথা এস্থানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়, অন্যান্য কবি প্রকৃতির সহিত যতই অন্তরঙ্গতা করে থাকুন না কেন, নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা কখনও ভুলে যান নি। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলুপ্তিও আছে। তিনি একদিন প্রকৃতির সহিত মিশেছিলেন, তাঁরই বুকে তৃণ উঠেছে, ফুলদল ঝড়ে পড়েছে,

'আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।'

শুধু তাই নয় প্রকৃতির সঙ্গে এই জীবনের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিরহ তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। তাই পুনরায় তাঁকেকোলে ফিরে নেবার জন্য তাঁহার করুণ মিনতি গীতিমুখর হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহাকে মিশিয়ে নিলে,

'আমাব আনন্দলয়ে
হবে নাকি শ্যামতর অরণ্য তোমার,
প্রভাত আলোক মাঝে হবে না সঞ্চার
নবীন কিরণ কম্প। মোব মুগ্ধ ভাবে
আকাশ ধরণীতল আঁকা হয়ে যাবে
হৃদয়ের রঙে, যা দেখে কবিয় মনে
জাগিবে কবিতা, প্রেমিকের দুনয়নে
লাগিবে ভাবের ঘোব, বিহঙ্গের মুখে
সহসা আসিবে গান।'

নিজের আনন্দানুভূতি দিয়ে প্রকৃতিকে এমন করে রাঙিয়ে তোলার কল্পনা আর কোনো কবি করেছেন বলে জানা নেই। কবি এস্থানে শুধু প্রকৃতির সহিত একাত্মীয় নন, একটি অপৃথক সত্তা। প্রাচ্য পাশ্চাত্য অন্যান্য কবিদের সঙ্গে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসায় তাই তাঁহার পরিমাপের (degree) অনেক প্রভেদ।

Shellyর ন্যায় প্রকৃতিকে প্রেমের প্রতীক করেই শুধু রবীন্দ্রনাথ তাকে উপভোগ করেন নি, Wordsworthএর মতো প্রকৃতির মঙ্গলময় মূর্তিও তাঁর বহু কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয় প্রকৃতি প্রেয়সীকে কবি একটি কবিতায় আধ্যাত্মিক সূচিতায় গৌরবময়ী করেও সাজিয়ে তুলেছেন,

'দেবী, তব সীথিমূলে লেখা
নব অরুণ-সিঁদুর রেখা,

তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খ বলয়তরুণ ইন্দুলেখা।
একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি প্রভাতে দিতেছ দেখা।...
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মল বায় শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে।'

Wordsworth এর মতো শিক্ষার্থীর মন নিয়েও তিনি প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গতা করেছেন। সেটা কাব্যের চেয়ে তাঁর গদ্যসাহিত্যকেই বেশি সমৃদ্ধ করেছে। সুচিতা এবং সম্ভ্রমপূর্ণ হৃদয়াবেগে পাশ্চাত্ত্য কবি Wordsworthএর সঙ্গেই শুধু তাঁর তুলনা চলে।

পাশ্চাত্য এবং ভারতেব নিসর্গপ্রীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাগুলি রবীন্দ্র প্রতিভার অনন্ত সমুদ্রে এসে আপনাদের বিলীন করে দিয়েছে। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাগুলির অনুসরণ করে রবীন্দ্র কাব্যের মোহনায় এসে অনন্ত জলধির পানে শুধু একবার মুগ্ধ দৃষ্টিপাত করে যাত্রা শেষ হল। রহস্য সন্ধানের চেষ্টায় সীমাহীন সাগরের বুকে পাড়ি দেবার জন্য নূতন উদ্যমের প্রয়োজন।

গ্রন্থকারের 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য।

নির্দেশিকা

(স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অনাথনাথ দাস কৃত)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	২১	ভতৃহরি	ভর্তৃহরি
১০	৪	দশার্গ দেশ	দশার্ণ দেশ
২৭	২২	marit	merit
২৭	১৩	severrl	several
২৭	১৪	cultris	centuries
২৭	১৭	ha	has
৩০	৮	mothe	mother
৩৬	১২	অত্যাবশক	অত্যাবশ্যক
৩৬	১৫	প্রকৃতিকে প্রকৃতিকে	প্রকৃতিকে
৪২	১০	succesion	succession
৪৫	১৮	ধরণর	ধরণের
৪৭	১৫	similitis	similis
৪৭	২২	পুং স্কেকিল	পুং স্কোকিল
৫০	৫	রাধাণীর	রাজধানীর
৫৮	২৯	রূকাত্মক	রূপকাত্মক
৫৯	২৭	রূপাত্মক	রূপকাত্মক
৬৩	৬	উজ্জয়িনী	উজ্জয়িণী
৬৩	১০	এলয়িত	এলায়িত
৬৪	১০	সম্ব্ৃদ্ধ	সমৃদ্ধ
৬৪	১৬	রঘুবংপে	রঘুবংশে
৬৮	১৫	রূপকাত্মকার	রূপকাত্মতার
৬৮	১৭	রূপকাত্মকাকেও	রূপকাত্মতাকেও
৭০	৪	বিক্রোমর্ব্বশী	বিক্রমোর্বশী
৭০	১৭	উদাহরণেয়	উদাহরণের
৭০	২২	প্রারম্ভে	প্রারম্ভে
৭১	৮	নিদাগ শুষ্ক	নিদাঘ শুষ্ক
৭১	১৮	আবৃত্তি	আবৃত্তি
৭২	১৪	খজুলম্বিত	ঋজুলম্বিত
৭৩	১৮	মিলনাকাক্ষার	মিলনাকাঙ্ক্ষার
৭৩	২৭	‘ঋতুসংহার	‘ঋতুসংহার’ এর
৭৫	১০	বৈপরীত্ব	বৈপরীত্য
৭৮	৬	ভতৃহরি	ভর্তৃহরি
৮২	৪	পংঙতি	পংক্তি
৮২	৫	দু্সাধ্য	দুঃসাধ্য
৯৯	১৫	পশ্চাত পটে	পশ্চাদ্ পটে
১০৮	৯	প্রাণবাণ্	প্রাণবান্

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৮	৪	ইন্দ্রয়র	ইন্দ্রিয়ের
১২১	৯	হইলেও	হলেও
১২৫	১	মাধুষ্য	মাধুর্য
১২৫	২১	গোবিন্দ দানের	গোবিন্দ দাসের
১২৮	১১	থাকিলেও	থাকলেও
১৩৭	২২	তাঁহার	তাঁর
১৩০	২৫	করিয়াছেন	করেছেন
১৩৪	১	পাঠকে	পাঠক
১৩৭	১৫	আনন্দনুভূতি	আনন্দানুভূতি
১৩৮	৩	অনুরণ	অনুরণন
১৪১	৭	হোসেনেব	হোসেনের
১৪৩	৩	সাদৃশ	সাদৃশ্য
১৪৫	২	রূপকাত্বক	রূপকাত্মক
১৫১	১৯	চিবচরিত	চিরাচরিত
১৫৬	২৪	পার্বতীয়	পার্বতীর
১৫৮	২৫	ক্রোধনলকে	ক্রোধানলকে
১৭৪	২৪	উপখ্যানে	উপাখ্যানে
১৮৭	১৭	সত্বেও	সত্ত্বেও
১৯২	২১	হইতে	থেকে
১৯২	২৯	তাঁহার	তাঁর
১৯৯	১৪	তিলোত্তমাসম্ভবা	তিলোত্তমাসম্ভব
২০০	১৬	নামাকরণে	নামকরণে
২২৫	১২	শেলী	শেলি
২৩৭	১০, ১৪	নৈবদ্য	নৈবেদ্য
২৩৮	১১	হইতে	থেকে
২৪৩	১৪	করিয়	করিব
২৪৩	২৮	সীঁথি	সিঁথি
২৪৪	৭	সুচিতা	শুচিতা